বেণের মেয়ে

প্রথম নারায়ণ মাসিক পত্রে প্রকাশিত

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২০১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩২৬।
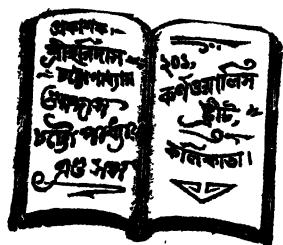
PRINTED BY K. C. CHAKRAVAR
GIRISH PRINTING WORKS,
51/2/6, SUKEA STREET CALCUTTA

গাঁঠ, পাকা তল্লাবাঁশে বহুকাল তেল খাওয়াইয়া লাঠি লাল তুলিয়াছে। লাঠিয়ালও খুব জোয়ান, সাড়ে ছ'হাতের উপর বুকে মাথায় বাবরিকাটা বড় বড় চুল। তাহাদের লাঠি মাথার উপর আরও দেড় হাত।

হঠাৎ রাত্রি তিন প্রহরের পর চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কা'ল দুপরে রাজগুরুর ভোজ। তারাপুকুরে এখন মাছ ধরা হইবে। তারাপুকুরের চারিদিকে প্রকাণ্ড পাড়, সেখানে যত বন-জঙ্গল ছিল, সব সাফ করিয়াছে। পাছে মাছ চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাই তারাপুকুরময় কঞ্চিশুদ্ধ হাজার হাজার বাঁশ ফেলা ছিল। আজ সমস্ত বাঁশ উঠাইয়া পাড়ের ওপারে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী নদী হইতে দুখানি দু'শ-মণী নৌকা আনিয়া তারাপুকুরে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী নদী হইতে তারাপুকুর অন্ততঃ বিশ রশি তফাৎ। মোট মোটা গরাণের কাঠ ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া, নৌকা দুখানিকে কাছি দিয়া টানিয়া পুকুরে ফেলা হইয়াছে। ভোর হইতে না হইতেই তারাপুকুরের মাছ-ধরার সরঞ্জাম সব প্রস্তুত। পুকুরটি যতখানি চওড়া, ততখানি লম্বা। একখানি জাল, জালের সূতাগুলি বহুকাল ধরিয়া গাবানতে এমন শক্ত হইয়াছে যে, মাছের সাধ্য কি উহা ছিঁড়িয়া পালায়। জালের তলার দিকে ইট ও পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে গোছা গোছা সোলার ফাত্না ভাসিতেছে। দুই পাড়ের ধারে দুই নৌকায় জেলেরা জালের দড়ি ধরিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে ভাঙ্গা মন্দিরের ধারে হঠাৎ রূপা রাজা দেখা দিলেন। চারিদিক্ হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—কেহ বলিল, মহারাজের জয়, কেহ বলিল, মহারাজাধিরাজের জয়, কেহ বলিল, রাজার জয়, কেহ বলিল, রূপারাজার জয়। রূপা মুহূর্ত্তের মধ্যে 'জাল টান' হুকুম দিয়াই অন্তর্ধান

তখন নৌকা চলিল, সোলার ফাত্না চলিল, জালের দড়ি পাড়ের উপর অগণ্য মানুষ চলিতে লাগিল। বড় বড় মাছে ঘাই তে লাগিল; এক একটা মাছ দশ পনর হাত লাফাইয়া উঠিয়া আবার জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। একটা একটা ঘাইয়ে জল তোলপাড় হইতে লাগিল। ঘাইয়ে ঢেউগুলি গোল হইয়া ক্রমে বড় হইতে হইতে ডাঙ্গায় আসিয়া লাগিতে লাগিল। একটা ঢেউএর পর আর একটা ঢেউ, একটা ঘোলের পর আর একটা ঘোল, কত শত যে বৃত্ত, বৃত্তার্দ্ধ, বৃত্তখণ্ড জলের উপর দেখা গেল, তাহা জ্যামিতির রেখাগণিতওয়ালারাই বুঝিতে পারেন। ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি পৌছিল। তখন সূর্য্যদেবের রাঙ্গা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোণার রঙ করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, রূপার মাছ বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্‌চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রূপার রঙের উপর সূর্য্যের সোনালি রঙ পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামেশিতে এক অপূর্ব্ব শোভা। জাল হাল্‌কা হইল, আবার জাল টানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝক্‌-ঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন এক-পেশে হয়ে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম পাড়ে

কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল, সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের দপ্‌দপানি, আর একদিকে তেমনই লোকের কলরব। একজন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"রাজার হুকুম—মুণ্‌কের নীচে মাছ ধরিবে না।" তখন বাছিয়া বাছিয়া একমণের নীচে যত মাছ ছিল, সব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তথাপি বহুসঙ্খ্যক মাছ জালে বাধিয়া রহিল। এক একটা মাছ ডাঙ্গায় তুলিতে অনেক বড় বড় জোয়ান হিমসিম খাইয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় শ'দুই মাছ ক্রমে তারাপুকুরের ভাঙ্গা মন্দিরের ধারে জড় হইল এবং সেখান হইতে গরুর গাড়ীতে রাজবাড়ীতে চালান হইল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে যে সব লোক মাছ ধরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে এক একটি ছোটখাট মাছ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে পূর্ণিমার দিন সকালবেলায় মাছধরা-পর্ব্ব শেষ হইল।

[২]

রাজার গুরু মাছের আঁতড়ি খাইতে ভালবাসেন, পোঁটা ও তেল খাইতে ভালবাসেন। সুতরাং এত যে গাড়ী গাড়ী মাছ রাজবাড়ীতে গেল, সে মাছের যত দরকার থাক্ আর না থাক্, মাছের তেল, আঁতড়ি আর পোঁটার বেশী দরকার। বড় বড় পটুপটি ফুটাইয়া গাদা করা হইতে লাগিল। তাহার পর এই সব জিনিস রাঁধে কে? সাতগাঁর চারিদিকে ৪।৫ ক্রোশ ধরিয়া রূপা রাজার খুব প্রাদুর্ভাব। যে গ্রামে যিনি যে তরকারী রাঁধিতে ভাল পারেন, তাঁহাকে আনাইয়া সেই তরকারী রাঁধিবার ভার দেওয়া হইল। এক জন মাছের তেল দিয়া নানাপ্রকার বড়া ভাজিতে লাগিলেন, এক জন মাছের তেল দিয়া ছেঁচড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন, চচ্চড়ি নানা রকমের হইল। এ সব খাস রাজগুরুর জন্য। বাকি লোকের জন্য যে প্রয়োজন, তাহার বর্ণনা দরকার নাই।

পাত সাজান হইলে, সন্ন্যাসীর দল বসিয়া গেল, অতিথি অভ্যাগত সব বসিয়া গেল; বসিলেন না কেবল রাজগুরু লুই-সিদ্ধা। সকলে বসিয়া গেলে, রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সব পরীক্ষা করিয়া গুরুদেবকে ভোজনের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গুরু খোলার একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত দেখিয়া গেলেন, বলিলেন, "সব উত্তম হইয়াছে, তোমরা আহার করিতে ব'স।" তিনি নিজেও আপনার পাতে বসিয়া গেলেন। আহারের এই বিপুল আয়োজনের জন্য সিদ্ধাচার্য্য রাজাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ধর্ম্মে তোমার মতি হউক।"

বৈকালে গাজন বাহির হইবে। তারাপুকুর হইতে সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত খুব একটা চাটাল রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। সমস্ত রাস্তা গোবর-গঙ্গাজলে ধুইয়া দেওয়া হইল। রাস্তার দুধারে কেবল ফুলের মালা বাঁশের থাম হইতে ঝুলিতেছে; রাস্তার উপর দিয়া ফুলের মালা বাঁশে ঝুলান। রাস্তার মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ। তোরণের উপর হইতে দিক্‌মালা চারিদিকে ছড়াইয়া ফর্‌ফর্‌-শব্দে উড়িতে লাগিল। দিক্‌মালাগুলি প্রায়ই সোলার পাতে তৈয়ারী, মাঝে মাঝে অভ্রের পাত লাগান। অভ্রের উপর যখন পড়ন্ত সূর্য্যের আলো পড়িল, তখন সে আলো নানা রঙ্‌ ধরিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। দিক্‌মালার মাঝে মাঝে কিঙ্কিণীমালা, দিক্‌মালা যতটা লম্বা, সে মালাও ততখানি লম্বা। বাতাসে ছোট ছোট ঘুঙ্গুরগুলি দুলিতেছে, আর ঝুন্‌-ঝুন্‌ ঝুন্‌-ঝুন্‌ শব্দ হইতেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় ধ্বজার উপর নানা-রকমের, নানা-রঙের, নানা-আকারের পতাকা পত-পত শব্দে উড়িতেছে; কোনটি তেকোণা, মুখে ঝালর দেওয়া, সমস্তটাই রেশমের তৈয়ারী; কোনটি চৌকণা, সাম্‌নে ও নীচে ঝালর—কাপাসের জমির উপর রেশমের কাজ-করা; কোনটি ছালের

কাপড়ের ; কোনটি চামড়ার—বিচিত্র বেশে, বিচিত্র আকারে উড়িতেছে। কোথাও বা এক প্রকাণ্ড ধ্বজার চারিদিকে কেবল ছাতা, নীচেরটি সব চেয়ে বড়, যত উপরে উঠিতেছে, ছাতা ক্রমে ছোট হইয়া গিয়া মটকার উপর একটি মোচার আগার মত হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতেও ফুলের মালা ঢুলিতেছে। রাস্তার দুধারে বাঁশের থাম। প্রত্যেক থামের গোড়ায় পূর্ণকলস, তাহার উপর আম্রশাখা, তাহার উপর একটি টাট্‌কা ডাব। কলসীতে সিন্দূর, চন্দন ও হলুদের দাগ। পূর্ণ-কলসের পিছনে এক একটি কলাগাছ।

[৩]

সরস্বতীর উপর সাঁকো নাই, পুল নাই, খেয়ার নৌকাও নাই। মহাজনী নৌকার ছৈয়ের উপর দিয়া উপর দিয়া পারাপার হয়। কিন্তু লোক-পারাপার এক জিনিস, গাজন-পার আর এক রকম জিনিস। সরস্বতীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত নৌকাগুলি এমন ভাবে সাজান, যেন একটি একটি 'নৌ-সেতু' হইয়াছে। ছৈয়ের উপর দিয়া মানুষ চলিয়া যাইতেছে, পাটাতনের উপর দিয়া হাতী, ঘোড়া, রথ চলিতেছে। আবার আর এক সারি নৌকা, আবার ছৈ, আবার পাটাতন। নৌকার মাস্তুলগুলি নানারঙের কাপড় দিয়া মোড়া। মাস্তুলের আগা হইতেও দিক্‌মালা ও কিঙ্কিণীমালা। আর সব নৌকাই বেশ সাজান-গোজান। হাতীগুলির যেমন শিঙার করে, নৌকার সেই রকম শিঙার করা হইয়াছে ; কোথাও লাল, কাল, সাদা, হলুদের বড় বড় ডোরা, কোথাও হাতী-ঘোড়া আঁকা, কোথাও বা বড় বড় অক্ষরে মহাজনের নাম লেখা,—কোথাও বা লেখা—"ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।"

সাতগাঁএর ভিতর বড় রাস্তার দুধারেই দুতালা তিতালা কোঠা,

কোনটি ইটের কোঠা, কোনটি মাটকোঠা। প্রত্যেক বাড়ীতেই এক একটি 'বাতায়ন'—একটা গোল বারান্দা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বারান্দায় অনেক জানালা, ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। সাতগাঁএর ধনী বণিক্‌গণ বাড়ীর সম্মুখধার প্রাণপণে সাজাইয়াছে। বাড়ীর ভিতর যেখানে যে ছবি ছিল, বাহিরের দেওয়ালে লাগান হইয়াছে। ছবিগুলি লাগানর জন্য পঞ্চায়েত বসিয়াছিল, পঞ্চায়েত যে ছবিখানি যেখানে যে ভাবে রাখিতে বলিয়াছিলেন, সেখানি সেইখানে সেইভাবেই ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সাতগাঁএর বড় রাস্তার বাহার ছবির বাহার ত নয়, বাতায়নে যুবতীদের মুখের বাহার। এক একটি বাতায়ন যেন এক একটী পুকুর, যেন শত শত পদ্ম ফুটিয়া ঘেঁসাঘেঁসি মেশামেশি করিয়া আছে। সে দিন বড় রাস্তার উপর দোকানপাট সব বন্ধ। বণিকেরা নূতন কাপড় পরিয়া, নূতন বেশভূষা করিয়া, আপন আপন দোকানের পাশে জটলা করিতেছেন; সমস্ত সহর তোলপাড়। কোন কোন বণিক্ দীপমালা সাজাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বড় রাস্তার ধারে বৌদ্ধ-বিহারগুলির আজ অপূর্ব্ব শ্রী। বিহারের যেখানে যা ভাল জিনিসটি ছিল, সব বাহিরে আনা হইয়াছে। বিহার-তোরণের সামনে পিতলের বড় বড় দীপগাছা রাখা হইয়াছে। এক একটি গাছায় ১০০।১৫০ করিয়া প্রদীপ জ্বালান যাইতে পারে। রাস্তার উপরের দেওয়ালে শত শত নিশান টাঙ্গান হইয়াছে। নিশানের মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ-দেবদেবীর প্রতিমা ঘোরাল রঙে আঁকা আছে। এখন আর শুদ্ধ বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘতে চলে না; এখন নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি বৌদ্ধবিহারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে গণেশ একটি প্রধান দেবতা। উপাসকের ইচ্ছা অনুসারে গণেশের হাত বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। তিনি নীচের দিকে শেষ দুটি

হাতে একটি জামবাটি-ভরা লাড়ু লইয়া বসিয়া আছেন, আর লম্বা শুঁড় দিয়া লাড়ুগুলি টুপ্-টুপ্ করিয়া খাইতেছেন। গণেশের কাছেই মহাকাল—বেঁটে-খেটে, গাঁটা-গোটা, মুখখানি মস্ত, হাঁ-টা খুব ডাগর, কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া আছেন। এক পাশে মঞ্জুশ্রী ধীর গম্ভীর, দুটি হাত—এক হাতে কিরীচ আর এক হাতে পুথি। নিকটেই লোকেশ্বর—"সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট", "কেয়ূরবান্", "কনককুণ্ডলবান্", "কিরীটী", "হিরণ্ময়বপুঃ"—দুই হাতে দুই পদ্ম লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হিন্দুর মন্দিরও বেশ সাজান-গোজান হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ নাই। চারিদিকে উৎসব, জোর করিয়াও তাতে মাতামাতি করিতে হইবে, ইচ্ছা থাক আর নাই থাক—নইলে ভাল দেখায় না। হিন্দুর বাড়ীরও দশা তাই—বাহিরচটক ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু ছেলেপুলে ছাড়া আর কেহ দরজায় নাই।

[৪]

সাতগাঁ পার হইয়াও ধরমপুর পর্য্যন্ত তারাপুকুরের মতই সাজান-গুজান। তবে ধরমপুরের আলোর কারখানাটা খুব বেশী। সন্ন্যাসীদের সেখানে দু'এক রাত থাকিতে হইবে কি না, তাই এই আলোর ব্যবস্থা। সেখানেও তারাপুকুরের মত কোথাও তালপাতার বড় বড় ঘর, কোথাও তালপাতার মেরাপ, কোথাও তাঁবু, কোথাও শামিয়ানা, কোথাও কাঠগড়া; সব জায়গায়ই আলো; আলো ও বিচিত্র মশালের বন্দোবস্তই বেশী। বড় বড় শামিয়ানার নীচে বাঁশের তেকোণার উপর সরা; তাহাতে সরিষার তেল; তেলের মধ্যে সরিষার পুঁটলী; পুঁটলীর গেরর উপরে যে কাপড় আছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর সেইটা জ্বলিতেছে। কোথাও মাটীর বা কাঠের বড় বড় দীপগাছা,

তাহাতে বড় বড় মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছে। অনেক জায়গায় তেল সাশ্রয় করিবার জন্য প্রদীপের নীচে জল রাখার একটা পাত্র আছে। কোথাও আড়ার বাঁশে দড়ী বাঁধিয়া তাহাতে চার পাঁচ মুখোপ্রদীপ একটি মাটীর ডাঁটায় চারিদিকে ঝুলিতেছে। প্রদীপের নীচে জল রাখার ডাবা।

ধরমপুরের সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি ছোট-খাট বিহার ছিল। বিহারটি দোতালা, চকমিলান; একতালায় ও দোতলায় চারিদিকে বারান্দা; বারান্দার ওপাসে সারি সারি ছোট ছোট ঘর। বারান্দার দিক্ ছাড়া আর কোন দিকে জানালা বা দরজা নাই। এক একটি ঘর এক একটি ভিক্ষুর শুইবার স্থান। রাত্রি ভিন্ন এ ঘরে কেহ বড় একটা থাকে না। রাত্রেও শোয়ার জন্য হয় একটা মাদুর, না হয় একটা চেটা, না হয় একখানা পুরাণ গালিচা। খাট-চৌকী একেবারে নাই, বালিসের সম্পর্কও বড় একটা নাই। উঠানে একটি মন্দির ও তাহার সম্মুখে একটি নাটমন্দির। মন্দিরে একটি ছোট চৈত্য থাকে; কিন্তু ধরমপুরের বিহারে শাক্যমুনির একখানি প্রতিমা ছিল। মন্দির-দরজার দুপাশে গণেশ আর মহাকাল; ভিতরে কি আছে, সে কথা আর বলিব না। নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। লুই-সিদ্ধা ও তাঁহার বড় বড় চেলারা এইখানে বসিয়া দুপরে ও সন্ধ্যায় তর্ক বিতর্ক করিবেন। বিশেষতঃ গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন—"আমার 'অভিসময়বিভঙ্গ' লেখা হইতেছে, তাহা লইয়া আমরা কতকগুলি অন্তরঙ্গের সঙ্গে সর্ব্বদা বাদানুবাদ করিব। সেখানে যেন অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক যায় না; উপাসকদিগের যাইবার বাধা নাই।"

[৫]

৩টার সময় রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজান একটা হাতী, সর্ব্বাঙ্গে শিঙার করা, বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংথাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক্ দড়ী দিয়া ঘেরা, খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল; সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটি ছোকরা—তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র; মাথাটি মুড়ান; বোধ হয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়; গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রঙটি যতদূর ধব্‌ধবে হইতে পারে; চোখ দুটি পটল-চেরা; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল; গাল দুটি বেশ গোলগাল; দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে; কপালখানি ছোট, কম চওড়া; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুল্‌পি হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মাথাটা খেউরি করায় কেবল একটু কাল ছায়া, কাল দাগ মাত্র আছে। ভুরু দুটী জোড়া নহে, ঠিক কামের কামানের মত নহে, যেন দুই দিকে দুইটা ধনুক উড়িতেছ। ছেলেটির পরা কৌপীন, অন্তর্বাস আর বহির্বাস। এমন

ছেলেও ভিক্ষু হয়? ইনি গুরুর সঙ্গে একত্রে হাতীতে উঠিলেন; লোক অবাক্ হইয়া তাঁহার চেহারা দেখিতে লাগিল। তিনি গুরুর সঙ্গে এক হাওদায় বসিলেন। হাতীর মাহুত কিন্তু আর এক রকমের। তার মাথায় সাঁচ্চার জরীর তাজ, গায়ের আঙরাখায় সোনালীর কাজ-করা, গলায় মুক্তার মালা; হাতীর যেমন সাজ, মাহুতের সাজও সেইরূপ জাঁকাল। ইঙ্গিতে হাতী উঠিল এবং গুরু ও শিষ্যকে বহন করিয়া দাঁড়াইল।

এইবার গাজন। প্রথম একদল বাজন্দার,—ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগারা লইয়া যাইতে লাগিল। এ দল লড়াইয়া বাজন্দার; জাতে মুচি—খুব চোটে বাজাইতে লাগিল। তাহার পিছনে একদল পদাতি সৈন্য—ছয় জন করিয়া সারি;—মালকোচা মারা, মাথায় বাবরীকাটা ঝাঁকড়া চুল, তাহার উপর একটা বাঁধা-পাগড়ী, হাতে বাঁশের লাঠি। তাহার পিছনে আবার একদল মুচি বাজন্দার। পিছনে ঘোড়সোয়ার— চারি জন করিয়া এক এক সারিতে; ঘোড়ার উপর দেশী জিন—অর্থাৎ কম্বলে পটি দিয়া ঘোড়ার পেটে বাঁধা। সোয়ারদের গায়ে আঙরাখা, মাথায় মাথা-ঢাকা পাগড়ী ও হাতে লম্বা লম্বা বল্লম; ফলাগুলা খুব সানান, চক্‌চক্ করিতেছে, তাহার উপর আবার সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে গাছের মাথায় তাহার ছায়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার পিছনে আবার বাজন্দার, তাহার পিছনে রথ, এক এক সারথি ও এক এক রথি; নীচে গুপ্ত শস্ত্রাগার; কোনটা এক ঘোড়ায় টানিতেছে, কোনটা দুই ঘোড়ায় টানিতেছে। এই সকল রথের পিছনে রাজা স্বয়ং—একএ হাতীতে যাইতেছেন; তাহার পর তাঁহারই সব পাত্রমিত্র ও পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে মহিষীরা আছেন, রাজকন্যারাও আছেন। ইঁহাদের পর কয়েকখান গোরুর-গাড়িতে সঙ—বানর, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, মার সেনা,

মার কন্যা। তাহারও পরে কতকগুলি 'চৌপাল্লায়' নাটক। বিশেষ বেশন্তর নাটক; এই নাটক দেখিলে এখনও তিব্বতীয়গণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনকার বাঙ্গালীদের ত কথাই নাই। এ তাহাদের দেশেরই নাটক, তাহাদের দেশেই লেখা, তাহাদের দেশের লোকই সাজে। তাহার পর গুরুদেবের হাতী; তাহারও পিছনে গুরুদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহতত্ত্বের গান গাইতে গাইতে যাইতেছেন। তাহার পিছনে নেড়া-নেড়ীর দল—সবাই প্রকৃতি, পুরুষ এক গুরু। আর কেহই নাই। সবাই তাঁহার সেবা করিতেছেন। কেহ তাম্বূল যোগাইতেছেন, কেহ অঙ্গে চন্দন লাগাইতেছেন, কেহ ব্যজন করিতেছেন, কেহ অপাঙ্গবীক্ষণ করিতেছেন, কেহ বা অন্য উপায়ে গুরুর সেবা করিতেছেন। এইরূপে নানা সম্প্রদায়ের গুরু চলিয়া গেলে দেবদেবী আসিলেন; সব এক এক খোলা ঘোড়ার রথে। আসিলেন গণেশ, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, নানা রকমের সঙ। তাহারও পিছনে হই-হাই, লোকজন, রঙ্গরস, তামাসা-ফষ্টি।

[৬]

গাজন প্রায় এক মাইল লম্বা। গাজন চলিল। রূপা-রাজার এমনি দবদবা, সবাই যে যাহার কাজ, তাহাই করিতেছে, কেহই কোনরূপ গোলমাল করিতে পারিতেছে না। গাজন সরস্বতীর ধারে আসিল। দেখা গেল, মাস্তলে মাস্তলে লোক একদৃষ্টে গাজন দেখিতেছে; মাস্তলের মাথার কাছে মাচা বাঁধিয়াছে—শুদ্ধ গাজন দেখার জন্য—ছইএর উপর মাস্তলের দড়ি ধরিয়া, নদীর পাড়ে গাছের উপর উঠিয়া, অগণ্য লোক গাজন দেখিবার জন্য কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে। গাজন নৌকায় পৌছিলে গাজনের ভরে নৌকা টলিতে লাগিল। প্রথম

প্রথম সকলে একটু ভয় পাইল, পরে বুঝিল, নৌকা টলিলেও ডুবিবার ভয় নাই। যাহা হউক, একটু ভয়ে ভয়ে রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যে ছোট নদীটি পার হইয়া আবার ডাঙ্গায় পৌছিলে সকলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এবার সাতগাঁএর পথে গাজন। গাঁয়ের পথে ঢুকিবামাত্রই উপর হইতে খই পড়িতে লাগিল, ফল পড়িতে লাগিল, অনেক মাঙ্গল্য দ্রব্য পড়িতে লাগিল। বিশেষ যখন রাজার বা কোন বড় গুরুর হাতী কোন বড় বাড়ীর কাছে গেল, ফুল ও খই পড়ার ধূম দেখে কে? আবার যখন মূল সন্ন্যাসীর হাতী আসে, তখন গুরুদেবের শিষ্যটিকে একটু বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সকলেরই রোখ সেই শিষ্যটির উপর। হাতী, রাম দত্ত, স্বরূপ দে, শ্যাম লাহা, যদু কুণ্ডু, মধু ঘোষ, রাম মিত্রের বাড়ীর সামনে আসিল; পুরবাসিনীরা—বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন—আহা, এমন দুধের ছেলেকেও কি সন্ন্যাসে দেয়? অনেক যুবতী তাহাকে দেখিয়া আপন আপন পতির সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া পতিনিন্দা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ফুল ফেলার বিরাম নাই। শিষ্য বেচারা দুইবার উঠিয়া আঁজলা আঁজলা ফুল ফেলিয়া দিয়া হাওদা সাফ করিয়া ফেলিলেন। না করিলে গুরুও চাপা পড়িয়া মারা যান, আর আপনিও মারা যান। কিন্তু আবার রাশীকৃত ফুল জমিল ও তাঁহাদের হাতী বিহারী দত্তের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল—আবার পুষ্পবৃষ্টি। গুরু হাঁপাইয়া উঠিলেন। শিষ্যও হাঁপাইয়া উঠিলেন। কথাটা রূপা রাজার কানে উঠিল। তিনি গুরুর হাওদার উপর একটা খুব শক্ত চাঁদোয়া দিতে বলিলেন। ফুলগুলা আর সব হাওদার ভিতর পড়িতে পাইল না। সকল লোকই কিছু না কিছু দিয়া গাজনের পূজা করিল; নূতন সন্ন্যাসীর পূজা করিল। বিহারী দত্তের কন্যা বিশেষ পূজা করিলেন।

তিনি হাতীতে মই লাগাইয়া গুরুর গলায় মালা দিয়া গেলেন আর শিষ্যের গলায়ও মালা দিয়া গেলেন, গুরু ও শিষ্য উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। সেইখানে হাওদায় চারিটি খুঁটী লাগাইয়া উপরে একটা চাঁদোয়া দিতে দেরী হওয়ায় কন্যাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া গুরুর সেবা করিতে পারিলেন। গুরুও তাঁহাকে 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিষ্য যদি ও কথা কহিলেন না, কিন্তু মন-প্রাণ খুলিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন।

বিহারী দত্তের মেয়েটি পরমা সুন্দরী—একেবারে নিখুঁত সুন্দরী। যেমন মুখশ্রী, তেমনই রঙ; যেমন গঠন, তেমনই দেহ-সৌষ্ঠব। কিন্তু তাঁহার মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই শঙ্কিত হইলেন; আর উভয়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"এ মেয়ের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।" যাহা হউক, সেবা ও পূজা সাঙ্গ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। গুরু একবার শিষ্যের মুখের দিকে চাহিলেন। গাজন চলিতে লাগিল। গাজন যখন ব্রহ্মপুরীর ভিতর দিয়া যায়, তখন ব্রাহ্মণীরা যথেষ্ট আদর করিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা গাজন দেখাও দোষ মনে করিয়া বাড়ীর ভিতর রহিলেন। ক্রমে গাজন রাত্রি নয়টার পর ধরমপুর সজ্যারামে পৌঁছিল। যাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, সকলকে সেইখানে পঁহুছিয়া দিয়া রূপা রাজা সেই রাত্রেই ঘোড়ায় চড়িয়া তারাপুকুর প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[১]

ভোর হইলে সকলে উঠিয়া দেখিল যে, যেখানে তাহারা রাত্রি কাটাইয়াছে, তাহার দক্ষিণে একখণ্ড চৌকস চৌরস জমী পড়িয়া আছে। জমীখানি প্রায় একশত বিঘা হইবে। তাহাতে কোথাও একটি ছোট বা বড় গাছ নাই। সমস্তটা ঘাসের জমী। বোধ হইল, যেখানে ঘাস ছিল না, সেখানেও সম্প্রতি ঘাস জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জমীখানির চারিদিকে কোদালি দিয়া দাগকাটা ও তাহার চারি কোণে চারিটা খোঁটাখুঁটি পুতিয়া তাহতে ধ্বজা ও পতাকা দেওয়া। দেখিয়া বোধ হয়, অনেক দিন ধরিয়া এই জমীখানি শোধন করা হইয়াছে, এবং শীঘ্রই এখানে সম্যক-সম্ভোজন হইবে। উদ্যোগও তাহারই কতক হইয়াছে ও কতক হইতেছে।

এ শোধন করা জমীখানা, তাহারা যেখানে রাত্রি কাটাইয়াছে তাহার দক্ষিণে, পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। উহার দক্ষিণ-সীমা হইতে কিছু দূরে একটা খাত। খাতের ওপারে মাটীর পাঁচীল। খাতের মাটী তুলিয়া খুব চটালো করিয়া পাঁচীল দেওয়া হইয়াছে। তাহার উত্তর দিকটা বেশ ঢালু হইয়া খাতের মাথায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আর সেই পাঁচীলের ঠিক মাঝখানে একটা দোর—পাঁচতলা-সই উঁচু, কপাট দুখানাই প্রায় চারতলা। কপাটের দুই পাশে চারিতালা ঘর ও কপাটের উপর আর একতালা। কপাট দুখানি খুব মোটা কাঁটালের তক্তায় তৈয়ারী। আরও মোটা তক্তার বাতা বসান এবং উহার সমস্ত গায় মোটা মোটা

পিতলের গুলাবসান। উহা নূতন তৈয়ারী হইয়াছে, এখনও চক্‌চক্ করিতেছে। কপাটের পাশে ও মাথায় যে সব ঘর আছে, তাহাতে রক্ষিপুরুষেরা থাকিবে; সেইখান হইতে তাহারা শত্রুপক্ষের গতিবিধি দেখিবে ও কপাট বন্ধ করিয়া দিবে। শত্রুসেনা নিকটে আসিলে বুক-সমান পারাপেট-দেওয়া বারান্দায় দাড়াইয়া তীর ছুড়িবে, তাহারও বন্দোবস্ত আছে। আজ, কিন্তু, সেখানে রক্ষিপুরুষও নাই, তীর, ধনু, ঢাল তলোয়ারও নাই। আছে কেবল বাজন্দার ও বাজনা—ঢাক, ঢোল, কাঁসী, দামামা, দগড়া, সানাই, শিঙ্গা, ঝাঁজ—বিশেষ কাহল।

কপাটের দুইধারে দুইটা ভীষণ আংটা; তাহার ভিতর দিয়া দুই শিকল; শিকলে একখানা প্রকাণ্ড লোহার পাত টানিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। আংটার নীচে মাটীর উপর একটা ঘোরাইবার কল আছে। কল ঘোরাইলে লোহার পাত উঠিয়া পড়ে, আর ছাড়িয়া দিলে পাত পড়িয়া যায়। এখন লোহার পাত খাড়া করাই আছে।

[২]

যত ফরসা হইতে লাগিল, তাহারা আরও দেখিতে পাইল যে, খোদন-করা জমীতে কপাটের দুই পাশ হইতে কিছু দূর গিয়া দুইটা রেখা টানিয়া তাহার ওপারে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কতকগুলি প্রজ্ঞা-মূর্ত্তি ও অনেকগুলি উপায়-মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধদের প্রথম ছিল—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্ন। কিন্তু মহাযানে যখন দর্শন-শাস্ত্রের বড়ই আলোচনা, তখন তাহারা বুদ্ধকে বোধির উপায় বলিয়া মনে করেন এবং ধর্ম্মকে প্রজ্ঞা বলিয়া মানিয়া লন, সংঘ বোধিসত্ত্ব হন। কোন কোন মতে ত্রিরত্ন ছিল বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ; আবার কোন কোন মতে ছিল ধর্ম্ম, বুদ্ধ, সংঘ। মহাযানীরা শেষ মতের লোক; সুতরাং

তাহারা প্রজ্ঞাকেই প্রথমরত্ন বলিয়া মনে করিত এবং এখানে পূবের দিকে প্রজ্ঞা-মূর্ত্তিই রাখিয়াছে। কোন কোন প্রজ্ঞা-মূর্ত্তি দাঁড়ামূর্ত্তি ;—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দুই হাত দুই পা, সর্ব্ব-অলঙ্কার-ভূষিত। সেইগুলিই দক্ষিণদিক্ হইতে আসিতে সকলের আগে পাওয়া যাইত। তাহার পর বসামূর্ত্তি ; তাহার পর তারামূর্ত্তি ; তাহার পর পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তি ;—লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। তাহার পর, বজ্রতারা, বজ্রবারাহী—শূওরের মত মুখ ; তাহার পর বজ্রযোগিনী ; তাহার পর বজ্রধাত্বীশ্বরী। সব মূর্ত্তিই তামায় তৈয়ারী, আর সোনার খুব পাত্‌লা পাতে মোড়া। ইহাতে কখনও মরিচা পড়ে না, সর্ব্বদাই চক্‌চক্ করে।

পশ্চিমের সারিতে প্রজ্ঞাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—উপায়মূর্ত্তি, অথবা বুদ্ধমূর্ত্তি। কোন জায়গায় বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন ; কোন জায়গায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন ; কোন জায়গায় এক হাত মাটীতে দিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে এক একটি প্রজ্ঞার সম্মুখে এক একটি উপায়মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি সব সাতগাঁ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিহার হইতে আনাইয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্যক্-সম্ভোজনে তাঁহারা যে শুদ্ধ সাক্ষিমাত্র তাহা নহে, তাঁহারাও এই সম্ভোজনে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে ভিক্ষা লইবার জন্য চাদর বিছান। যে বিহারে যে ভাল চাদরখানি ছিল, আনিয়া মূর্ত্তির সম্মুখে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রজ্ঞা-মূর্ত্তিগুলির পিছনের সারিতে অনেক দেবীমূর্ত্তি,—ক্রোধমূর্ত্তি, শান্তমূর্ত্তি, করুণামূর্ত্তি ইত্যাদি এক এক দেবীরই কত মূর্ত্তি আছে। আর উপায়-মূর্ত্তিগুলির পিছনের সারিতে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, বিশেষ লোকেশ্বরমূর্ত্তি। কোন মূর্ত্তির দুই হাত, কোনটির চারি হাত, কোনটির দশ হাত, কোনটির ছত্রিশ হাত, কোনটির আবার একশ হাত ; সাধকের বাসনা-অনুসারে

দেবতার হাত, পা ও মাথা যত ইচ্ছা হইতে পারিত। মঞ্জুশ্রী-মূর্ত্তির একহাতে তলোয়ার ও আর এক হাতে পুঁথি—বীরমূর্ত্তি অথচ শান্ত এবং হাস্যবদন। তাহার পর গগনগঞ্জ, আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ ইত্যাদি নানা বোধিসত্ত্ব। তাহার পর বজ্রসত্ত্ব চণ্ডমহারোষণ ইত্যাদি অর্দ্ধ-দেব, অর্দ্ধ-অসুর ও অর্দ্ধ-বুদ্ধমূর্ত্তি। সব সোনার পাতমোড়া। সকল দেব-দেবীরই মাথায় এক এক প্রকাণ্ড ছাতা, লম্বা সোনায় মোড়া ডাণ্ডার উপর্ উল্‌টান সানকের মত বড় বড় ছাতা;—কোনটা রেশমের, কোনটা পশমের; সব ছাতা হইতেই ঝালর ঝুলিতেছে; ঝালরে মুক্তা দুলিতেছে। প্রত্যেক সারিতেই চাদর বিছান। সকলেই রূপারাজার ভিক্ষা লইতে আসিয়াছেন।

[৩]

এই সকল মূর্ত্তির পিছনে পশ্চিম ও পূবে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা চাদর বিছাইয়া বসিয়া আছেন। পশ্চিমে ভিক্ষুই বেশী, ভিক্ষুণী কম। পূবে ভিক্ষু কম, ভিক্ষুণী বেশী। নাঢ় পণ্ডিত নিজেই পূবের দিকে আছেন, তাঁহার ভিক্ষুণী নাঢ়ীও তাঁহার সঙ্গে আছেন। আর তাঁহাদের দল নাঢ়ানাঢ়ীরাও অনেক আছে।

এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। শোধন-করা জমীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে প্রচুর খাবার জিনিস রাশি রাশি রহিয়াছে। হুকুম হইলেই তৎক্ষণাৎ বিতরণ করিবার জন্য অনেক লোকজনও উপস্থিত আছে।

[৪]

একটু বেলা হইলে রাজাধিরাজের আগমন হইল। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞা ও উপায়মূর্ত্তির সারির

উত্তর মুড়ায় ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। একখানি গরদের কাপড় পরা, একখানি গরদের উড়ানী গায়—তিনি নামিয়াই সমস্ত বুদ্ধ ও ধর্ম্মমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সারির মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিছনে সিদ্ধাচার্য্য লুই ও তাঁহার চেলা। তাহার পিছনে পুরোহিত সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র। তাহার পিছনে সাতগাঁয়ের বড় বড় রঈস, বড় বড় বণিক্ ও বড় বড় লোক।

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধ-মূর্ত্তির মধ্য দিয়া যখন তাঁহারা ওমুড়ায় গিয়া পঁহুছিলেন, তখন দেখা গেল, সেখানে একটা প্রকাণ্ড সামীয়ানার নীচে এক প্রকাণ্ড গলিচা পাতা; সেই গালিচার উপর বসিয়া সকলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র সমস্বরে তারাদেবীর স্রগ্ধরা-স্তোত্র-গান করিলেন। তাহার পর আরও কয়টি স্তোত্রপাঠের পর প্রধান পুরোহিত সাধুগুপ্ত মহারাজাধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ প্রজ্ঞোপায়স্বরূপ, যুগনদ্ধমূর্ত্তি শ্রীহেরুকের নামে এই মহাবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া ইহা কলিযুগপাবন সাক্ষাৎ গৌতমবুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইদেবকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনার সে সংকল্প সাধু!" চারিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি হইল "সাধু সাধু।" চারিদিক্ হইতে বাজনা বাজিয়া উঠিল "সাধু সাধু!" বিহারদ্বার হইতে বাজনা বাজিয়া উঠিল "সাধু সাধু।" সাধুবাদ শেষ হইয়া গেলে পুরোহিত আবার বলিলেন, "আপনি সাধুসংকল্পসিদ্ধির জন্য, ইহার নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য, সর্ব্ব-বুদ্ধ-সর্ব্ব-দেব-দেবী-বোধিসত্ত্ব, সর্ব্ব-যক্ষ কিন্নর-মহোরগ, সর্ব্ব-ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়, সমস্ত উপাসক-উপাসিকা-বর্গের অনুমতি গ্রহণ করুন, যেন আপনার সাধু সংকল্প সুসিদ্ধ হয়।" রাজা সমস্ত বোধিসত্ত্ব-দেবদেবীগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি সংকল্প করিয়াছি,

শ্রীহেরুকের নামে যে মহাবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহা আমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ সিদ্ধাচার্য্য লুইদেবকে দান করিব ; আপনারা প্রসন্নমনে অনুমতি করুন, যেন আমার সংকল্প সুসিদ্ধ হয়।" তখন সকলে "করুন" বলিয়া অনুমতি দিলেন, আবার বাজনা বাজিয়া উঠিল।

গালিচা হইতে নামিয়া রাজা, সাধুগুপ্ত ও সিদ্ধাচার্য্য তিনজনে একটু দক্ষিণদিকে গিয়া তিনখানি গালিচার আসনে বসিলেন। রাজা পূর্ব্বমুখে, তাঁহার বামে সাধুগুপ্ত পূর্ব্বমুখে এবং সিদ্ধাচার্য্য উত্তরমুখে বসিলেন। পুরোহিত দানের উদ্যোগ করিতেছেন, এই অবসরে রাজা বিহারদ্বারস্থ লোকদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা লোহার পাতখানি আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে নামাইয়া মাটীতে লাগাইয়া দিল। সেখানি একটি তোলা ফটক। তখন দ্বারের ভিতর দিয়া মহাবিহারের অনেক অংশ দেখা যাইতে লাগিল। পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, "আপনি বামহস্তে ঐ লোহার পাতখানা ধরুন।" রাজা তাঁহাকে একটু দেরী করিতে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মেঘগম্ভীরস্বরে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, আপনি জগতের যে উপকারসাধন করিয়াছেন, স্বয়ং বুদ্ধ গৌতমও তাহা পারেন নাই। তাঁহার নির্ব্বাণ বহুজন্মব্যাপী বহু-আয়াসসাধ্য ধ্যান-ধারণা তপ-জপ ও কঠোরসাধনার ফল। কিন্তু আপনার নির্ব্বাণ অতি সহজ, আমার মত মহাপাপীও আপনার উপদেশে অনায়াসে নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইতে পারে। আপনার উপদেশে আমার পুনর্জ্জন্মলাভ হইয়াছে, আমি পবিত্র হইয়াছি, বিশুদ্ধ হইয়াছি ও ধন্য হইয়াছি। প্রজার মঙ্গলই রাজার সকলের আগে দেখা উচিত। তাই আমি আমার প্রজারা যাহাতে বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিত্র হইয়া নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইতে পারে, সেই উদ্দেশে এবং—আপনার উপদেশ যাহাতে চিরস্থায়ী হয়—সেই উদ্দেশে, এই মহাবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছি।

ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সেবার জন্য ৫০ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি এইগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার সেবকানুসেবক এই অকিঞ্চনকে কৃতার্থ করুন।" বলিয়াই রোদন করিতে করিতে গুরুদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার চখের জল নিজের উত্তরীয়ে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "উপাসক, আমি ভিক্ষু, আমার এত দান লইবার কি প্রয়োজন? তুমি ইহা সংঘকে দান কর।" রাজা বলিলেন, "প্রভু, দয়াময়, আমি সংঘের কিছু জানি না, আমি আপনাকেই জানি, আমি আপনাকেই দিতেছি, আপনি সংঘকে দান করুন আর যাই করুন, সে আপনার ইচ্ছা।" তখন গুরুদেব বলিলেন, "তবে সহজসংঘের মঙ্গল-কামনায় আমি তোমার দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম।" চারিদিক্ হইতে সাধুবাদ হইতে লাগিল।

[৫]

তখন রাজা বামহস্তে লোহার পাতখানা ধরিলেন। পুরোহিত ভাষায় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন;—"এই যে মহাবিহার, ইহাতে যাহা কিছু আছে—জল, স্থল, গাছপালা, ঘরবাড়ী, ইহার উপরে বা নীচে যাহা আছে, সে সমস্ত ও সেই সঙ্গে ইহার সংলগ্ন পঞ্চাশখানি গ্রাম, আমার ইষ্টদেব সিদ্ধাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইদেবকে দান করিলাম।" এই বলিয়া তিনি রাজার হাতে মন্ত্রপূত জল দিলেন, রাজাও সেই জল গুরুদেবের চরণে ফেলিয়া দিলেন। আবার সাধুবাদ, আবার বাদ্য-নির্ঘোষ।

দানকার্য্য যথাবিধি সমাপ্ত হইলে গুরুদেবের দক্ষিণা ও পুরোহিত দুজনের দক্ষিণা দিয়া রাজা তাঁহার এক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন, সে একটি থলিয়া সোনা লইয়া রাজার পিছু পিছু যাইতে লাগিল।

রাজা এক এক খণ্ড সোনা লইয়া প্রজ্ঞাদেবীদের চাদরে দিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞাদেবীদের পর উপায়-দেবগণকেও এক এক টুক্‌রা সোনা দিলেন, তাহার পর কর্ম্মচারীদিকে ইঙ্গিত করিলেন—"তোমরা দানের সামগ্রী সব বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব দেবদেবী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের দান কর।" নিমেষমধ্যে চারিদিকে লোক ছুটিল, সকলের চাদরই ভরিয়া গেল। তাহার পর যেখানে যেখানে যত সহজবৌদ্ধ ছিলেন, সকলকেই দান করিতে আরম্ভ করিলেন। দান চলিল—সমস্ত দিন চলিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিল। ভিক্ষুরা সেইখানে বসিয়াই আহার কবিল এবং স্তব পাঠ ও গান করিতে লাগিল; ছড়া কাটাইতে লাগিল এবং নানারূপ গোল করিতে লাগিল।

[৬]

রাজা দান আরম্ভ করিয়া দিয়াই গুরুদেবের নিকট গিয়া পঁহুছিলেন এবং গুরুদেবকে মহাবিহারে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের আগে গুরুদেব, পিছনে তাঁহার চেলা, তাহার পর দুজন পুরোহিত, তাহার পর রহীস ও বণিকেরা, তাহার পর বিহারের বড় মিস্ত্রী, মন্দিরের বড় মিস্ত্রী, বড় ভাস্কর। সকলের শেষে রাজা। কিছু দূর গিয়া গুরুদেব প্রধান মিস্ত্রীকে দেখিতে চাহিলেন, সে রাজার অনুমতি লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারের সীমা কতদূর?"

মিস্ত্রী বলিল, "উত্তরদিকে যেমন খাত দেখিয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমেও তেমনি খাত আছে। আর ঐ যে চারিদিকে ঘাসের চাবড়া দেওয়া পাঁচীল দেখিতেছেন, ঐ ইহার সীমা।"

"বিহারবাড়ী কই?"

সে বলিল, "বিহারবাড়ীর কথা আমার নয়, তাহার জন্য আর একজন মিস্ত্রী আছে।"

গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিবার সময় সেই মিস্ত্রীকে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। সে রাজার কাছে গেল, রাজা তাহার মাথায় শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন এবং একগাছ সোনার হার তাহার গলায় দিয়া দিলেন।

বিহারবাটীর মিস্ত্রীকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারে কতগুলি ঘর আছে?"

সে বলিল, "উপর নীচে চারি শত।"

"মাঝ উঠানে কি আছে?"

"হেরুক-মন্দির—তাহার সম্মুখে বুদ্ধ-মন্দির ও নাটমন্দির।"

"নাটমন্দিরে কত লোক বসিতে পারে?"

"চারিশতই বসিতে পারে।"

"মূর্ত্তি সব প্রস্তুত?"

"সে কথা ভাস্কর বলিবে।"

গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও ভাস্করকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। সেও ফেটা পাইল, হার পাইল।

ভাস্কর আসিয়া প্রণাম করিলে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীহেরুকের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছ?"

সে বলিল, "যুগনদ্ধ-মূর্ত্তি।"

"বুদ্ধ-মন্দিরে কি আছে?"

"অশোক রাজার একটি ছোট চৈত্য।"

"কোথায় মিলিল?"

"মহারাজের প্রতাপেই।"

"শাক্যসিংহের মূর্ত্তি কোথায় ?"

"নাটমন্দিরের বাহিরে।"

"উপরে আচ্ছাদন আছে ?"

"আছে।"

"তোমরা কোথাকার ভাস্কর ?"

"বারেন্দ্রভূমের।"

"বেশ বেশ ! সবই ভাল হইয়াছে ; এ সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ?"

"এখন আপনি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহারাজা ত দান করিয়া দিয়াছেন।"

"সাধু সাধু" বলিয়া গুরুদেব ভাস্করকে বিদায় করিয়া দিলেন ও বলিলেন, "বেলা কত ?"

সে বলিল, "দুপর গড়াইয়া গিয়াছে।"

"তবে বেশ হইয়াছে, আজ আমি সংযত হইয়া থাকিব, কালই প্রতিষ্ঠা করিব।"

বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মানুসারে দুপর গড়াইয়া গেলে, গুরুদেব আহারে বসেন না। আজ সে জন্য আহারে বসিবেন না, ফলের রস পান করিয়া থাকিবেন। গুরুদেব আর সকলকে বিদায় দিয়া সমস্ত বৈকালবেলাটা বিহার দেখিয়া বেড়াইলেন—দেখিলেন, সবই মনের মতন হইয়াছে। তিনি, নূতন বিহারে তাঁহার জন্য যে ঘর রাখা হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্রাম করিতে গেলেন। তখনও নগরবাসীদের দান বাহিরে চলিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[১]

গুরুদেব তাহার পরদিন হইতেই প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। মন্দিরটি ত্রিমালা। প্রথম দিন এক মালার প্রতিষ্ঠা হইল, দ্বিতীয় দিন আর এক মালার, তৃতীয় দিন আর এক মালার। ক্রমে হেরুকমন্দির, বুদ্ধমন্দির, নাটমন্দির পুষ্করিণী আরাম—সব প্রতিষ্ঠা করিয়া হেরুকমূর্ত্তি, চৈত্য, শাক্যসিংহমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইল; প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক দিন লাগিল। প্রতিষ্ঠার জন্য যথাশাস্ত্র আয়োজন হইত ও প্রতিদিন একটি একটি সঙ্ঘের ভোজন হইত। আজ সপ্তগ্রাম-বিহারের সঙ্ঘ, কাল বাসুদেবপুর-বিহারের সঙ্ঘ, পরশ্ব শিবপুর-বিহারের সঙ্ঘ, তাহার পরদিন সঙ্ঘনগর-বিহারের সঙ্ঘ। এক এক বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে, তাহাদের খাওয়াইলে, সঙ্ঘ ভোজন করান হয়। গুরুদেবের শেষ সঙ্কল্প—শিষ্যের অভিষেক ও তাঁহারই উপর ধর্ম্মপুর-মহাবিহারের ভার-অর্পণ।

এই গল্পের সব ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, চারি পাঁচ বছর পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলা আবশ্যক। ঐ সময়ে সাতগাঁএ বিহারী দত্ত সকলের চেয়ে বড় বেণে ছিলেন। বিহারী দত্ত বড় ঘরওয়ানা হইলেও তাঁহার পৈতৃক বিত্ত বেশী ছিল না। তিনি নিজেই অনেকবার বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র পার হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে নানারূপ রান্নার মসলা, পানের মসলা আমদানী করিয়া খুব বড়মানুষ হইয়াছিলেন।

এমন কি—জাবা, বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যত জাহাজ যাইত, সবই তাঁহার ছিল। সেখানকার সব মাল তাঁহার একচেটিয়া ছিল। বেণেদের ভিতর তখন চারিটি আশ্রম ছিল—ছত্তিক আশ্রম, দেশ-আশ্রম, সজ্ঘ-আশ্রম ও রাউত আশ্রম। যাহারা ভিক্ষুদের ধূপধূনা অগুরুচন্দন বেচিত, তাহাদিগকে সজ্ঘ-আশ্রম বলিত। যাহারা ছাউনিতে আতর, গোলাপ ও অন্যান্য সখের জিনিস বেচিত, তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাহারা দশগাঁএ গিয়া রান্নার মসলা ও পানের মসলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ-আশ্রম বলিত। আর যাহারা নগরে বসিয়া ছত্রিশ জাতিকে নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম ছত্তিক-আশ্রম। এই চারি আশ্রমের বেণেরাই বিহারী দত্তকে প্রধান বলিয়া মানিত। জাতি ও ব্যবসার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে, তাহারা বিহারী দত্তের কাছে যাইত ও তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইত। বিহারী যদিও নিজের জোরেই বড়মানুষ হইয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য একা-বাহাদুরের মত দাম্ভিক বা অহঙ্কারী ছিলেন না। ধরিলে, তিনি লোকের খুব উপকার করিতেন। সাতগাঁএর বেণেরা ও ব্যবসাদারেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

সাতগাঁএর বড় রাস্তার উপর বিহারী দত্তের খুব বড় বাড়ী ছিল এবং সাতগাঁএর দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে গোলীন গ্রামে তাঁহার এক প্রকাণ্ড গুদাম ছিল। সেখানে অনেক লোক কাজ করিত, মসলাপাতী সেইখানেই গুদামজাত থাকিত। গোলীনের ঘাটেই বিহারী দত্তের শত শত ডিঙ্গা বাঁধা থাকিত। দরকার হইলে বিহারী এখনও সমুদ্রে যাইতে রাজী ছিল। বিহারী দেখিতে অতি সুপুরুষ। নেপালে উদাস বলিয়া এক জাতি আছে। উদাসদিগের শরীর-সৌষ্ঠব সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাহাদের নাক বড়, পাতলা, ঠিক বাঁশীটির মত; চোখ ডাগর, উজ্জ্বল,

পটলচেরা। তাহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহাদের রঙ খুব উজ্জ্বল নয়, কাশ্মীরি বা আর্ম্মাণীদের মত দুধে-আলতার রঙ নয়, রঙ আর্ম্মাণীদের চেয়ে অনেক মাট, লালের আভা খুব কম, সাদারঙ যেন মাজা। বিহারীকে দেখিলেই উদাস বলিয়াই মনে হইত। বিহারী নিজে খুঁজিয়া একটি পরমা সুন্দরী বেণের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের সময় সে দেখিয়াছিল রূপ, আর দেখিয়াছিল বংশ। বিবাহ করিয়া অবধি স্ত্রীর সহিত তাহার কখনও ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য হয় নাই। সে আপনার স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিত। বেণেরা প্রায়ই বিদেশে গিয়া একটু এদিক্ ওদিক্ করে। বিহারী কখনও সে কাজ করে নাই। সে একেবারে "স্বদার-সন্তোষী" ছিল। বিহারীর ধর্ম্ম কি ছিল, তাহা ঠিক বুঝান যায় না। শুধু বিহারী কেন?—সে কালের বেণেদের যে কি ঠিক ধর্ম্ম ছিল, বলা যায় না। তাহারা ব্রাহ্মণ দিয়া দশকর্ম্মও করাইত, আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধূপ-ধূনাও দিত। তাহারা ব্রাহ্মণ আসিলে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইত; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসিলেও তাঁহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিত। দুই ধর্ম্মের লোককেই তাহারা যথেষ্ট দান করিত। বিহারীর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দিকেই টান বেশী ছিল। কেন না, সাতগাঁ-বিহারের মহাস্থবির শান্তশীলের আশীর্ব্বাদে তাহার একটি সন্তান হইয়াছিল। সেইটি তাহার একমাত্র সন্তান—সেটি একটি মেয়ে। মেয়েটিকে সে বড়ই ভালবাসিত। সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী ও মেয়ের কাছে বসিয়া সে সমুদ্রের বর্ণনা করিত। সমুদ্রের ওপারে যে সব দেশ আছে, তাহার বর্ণনা করিত,—দারুচিনির গাছ, লবঙ্গের গাছ কেমন, বুঝাইয়া দিত, ঐ সব দেশের লোকের কথা বলিত। কতবার কত বিপদে পড়িয়াছিল,—তাহার গল্প করিত, একবার তাহার ডিঙ্গা ডুবিয়া যায়—সে গল্প করিত,

একবার রাক্ষসেরা তাহাকে খাইতে আসিয়াছিল। কত বড় বড় গাছ দেখিয়াছে, কত বড় বড় ফুল দেখিয়াছে, কতবার কত লড়াই-ঝগড়া করিয়াছে, সে এই সব কথা বলিত। কেমন করিয়া দেশী সামান্য সামান্য জিনিস দিয়া বিদেশী মহামূল্য জিনিস কিনিয়া আনিয়াছে, তাহারও গল্প করিত। স্ত্রী কখন শুনিত, কখন শুনিত না; ঘরকন্নার কাজ দেখিতে চলিয়া যাইত। তাহাকে অতিথ-পথিক দেখিতে হইত, রাতভিখারীদের ভিক্ষা দিতে হইত, চাকর-চাকরাণীদের দেখিতে হইত, একটু অবসর পাইলে তবে সে স্বামীর গল্প শুনিতে পাইত। মেয়েটি কিন্তু খুব মন দিয়া বাবার গল্প শুনিত, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত, মাঝে মাঝে 'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে সমুদ্রে যাব' বলিয়া আব্দার করিত। বিহারী সে আব্দার রাখিতে পারিত না, মেয়েকে অন্য কথা পাড়িয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু মেয়ের যত বয়স হইতে লাগিল, সমুদ্র দেখিবার জন্য জেদও তাহার বেশী হইতে লাগিল। বিহারী ভাবিয়াছিল, তাহাকে ত আর সমুদ্রে যাইতে হইবে না, ব্যবসা এখন লোকজন দিয়াই যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে। সুতরাং মেয়ে হ'তে তা'র আর ভয় নাই। সে না গেলে ত আর মেয়ে সমুদ্রে যাইতে চাহিবে না। এ বিষয়ে সে একরূপ নিশ্চিন্তই ছিল।

[২]

৯৯৫ সালে সে দেখিল, ৩।৪ ক্ষেপে তাহার লোকসানই হইয়াছে, লাভ হয় নাই। কেন এরূপ হয় সে ভাবিয়া পায় না। যে ব্যবসায়ে শতকরা ২০০৲ মুনফা হয়, সে ব্যবসায়েও লোক্সান! এ কেমন কথা? সে সন্ধান লইতে লাগিল। সন্ধান পাওয়াও কঠিন। ব্যাপারটা হয়

সাগরের ওপারে। যাহারা যায়, তাহারা সব কথা ঠিক বলে না। কারিন্দার দোষে হয়? কি মাঝিদের দোষে হয়? কি, সে দেশের লোক চালাক-চতুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া হয়? কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষে স্থির করিল, সে একবার সেখানে নিজেই যাইবে; কিন্তু সে মেয়েকে এ কথা কিছুতেই জানিতে দিবে না। সে গোলীনের ঘাটে ডিঙ্গা, নৌকা সাজাইতে লাগিল, লোকজন ঠিক করিতে লাগিল, মাঝি মাল্লা নিযুক্ত করিতে লাগিল। সে এখন বড়মানুষ হইয়াছে, নিজে সমুদ্রপারে যাইবে, তাই খুব সাজ-সরঞ্জাম চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে সেখানে সে সাত-আট-বার গিয়াছে, কিসে সুবিধা হয়, কিসে অসুবিধা হয়, সে বেশ জানে। কোন্ লোকটা সমুদ্রে ভয় খায়, কোন্ লোকটার সাহস আছে, কোন্ লোকটার হাতটান আছে, কোন্ লোকটা সে দেশে গিয়া একটু বেচাল করে, সে দেশে কোন্ জিনিষ পছন্দ করে, কোন্ জিনিষ করে না, কোন্ জিনিষটি পাইলে তাহার বদলে বেশী জিনিষ দেয় —এ সকল সে বেশ বুঝে, এবং সেইরূপ বন্দোবস্তও করিতে লাগিল।

এ সব সে কেবল লুকাইত মেয়েকে, আর মেয়েকে লুকাইতে গেলে সকলের আগে স্ত্রীকে লুকাইতে হয়, সে স্ত্রীকেও লুকাইত। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এমন একটা ঘটনা লুকাইয়া রাখা অতি কঠিন; বিশেষ বেণেবৌ বহুকাল হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে যে, সে আর স্বামীকে সমুদ্রে যাইতে দিবে না। যে কাজে এত বিপদ্, এত প্রাণের আশঙ্কা, এত জন্তু-জানোয়ারের ভয়, ঝড়-ঝাপ্টার ভয়, সে কাজে আর সে স্বামীকে যাইতে দিবে না, স্থির করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পাছে স্বামী আবার যান, তাই সে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিত। সতর্ক থাকার ফলে, সে সব জানিতে পারিল, স্বামীকে চাপিয়া ধরিল, "তুমি কিছুতেই যাইতে পাইবে না।" মেয়েও ধরিয়া বলিল "বাবা, এবার আমিও

যাব।” বিহারী প্রমাদ গণিল। উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন ফিরিবার যো নাই। সেও খুব শক্তলোক। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, অনেক কান্নাকাটীর পর মেয়েকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিল, তখন স্ত্রীর পরাজয় হইল। তখন স্ত্রী বলিল, “ও মা, আমি মেয়ে ছেড়ে থাকিব কিরূপে? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে”—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিহারী অনেক বুঝাইল—“তুমি গেলে, আমার গৃহস্থালী কে দেখিবে? ঠাকুর-দেবতার পূজা কে দেখিবে? অতিথ-পথিকের সেবা কে করিবে? গৃহিণীর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া উচিত নয়।”

কিন্তু এবার বেণেবৌ নাছোড়বান্দা—“তুমি যাবে, মেয়ে যাবে, আমি কি নিয়ে ঘরে থাকিব?”

বিহারীর বক্তৃতায় কোন ফলই হইল না, অনুরোধ-উপরোধেও কোন ফল হইল না; শেষে স্থির হইল, তিন জনেই যাইবে। বড় বড় বেণেরা আসিয়া ধরিয়া বসিল—“পরিবার সঙ্গে বিদেশে যাওয়া! এ ত আমাদের দেশে কখনও নাই! গেলে ভারী নিন্দা হবে।” কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আচার্য্য মহাশয় আসিয়া দিন দেখিয়া দিলেন, সেই দিন—কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথি—বিহারী মেয়ে ও পরিবার সঙ্গে লইয়া ডিঙ্গা ভাসাইলেন।

[৩]

বিহারী দত্তের ডিঙ্গা ভাসিল। ডিঙ্গা একখানা নয়, দুইখানা নয়, এক এক সাজ্যায় সাতখানি করিয়া ডিঙ্গা—এমন সাত সাজ্যা ডিঙ্গা ভাসিল। প্রত্যেক সাজ্যায় এক একজন বুড়া পাটনি। আর মধুকর নামে যে ডিঙ্গায় বিহারী দত্ত ও তাঁহার পরিবার ছিল, তাহার পাটনি এই সকল সাজ্যার কর্ত্তা। প্রত্যেক সাজ্যার এক একখানি ডিঙ্গায়

১০০ জন করিয়া জোয়ান পুরুষ তীর, ধনুক, ঢাল, তরবাল লইয়া ডিঙ্গারক্ষা করিবার জন্য আছে। সব নৌকার খোলে মাল বোঝাই, এ সব বিক্রীর মাল—ভাল কাপড়, বারাণসী সাড়ী, ঢাকাই মসলিন, খেলনা, গাঁজা, সিদ্ধি, চন্দনকাঠ পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, ক্ষীরোদ, এণ্ডী।

প্রত্যেক সাজ্যার এক একখানা নৌকায় কেবল খাবার জিনিষ চাল, ডাল, আটা, লবণ, নারিকেল, চিড়া, ছাতু, তেল, ঘি, চিনি। শীতবস্ত্রের বড় দরকার ছিল না। বিছানা-মাদুর যা'র যেমন ইচ্ছা, তেমনই লইল। লোহার ও মাটীর উনুন অনেক লইল। কাঠ, কয়লা, চকমকি, সোলা, টাকাও অনেক লইল।

নৌকাগুলির আকার একরূপ নয়। কতকগুলি হালের দিকে খুব উঁচা, অপর দিকে তত উঁচা নয়। এগুলি প্রায় গোল। ইহাদের খোল ফাঁদাল ও গভীর—অনেক মাল ধরে—প্রায় আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা। ছইগুলি শরকাঠির উপর সরু সরু বাথারির ঘন ঘন বাতা দিয়া বাঁধা। চারিপাশেও ঐরূপ শরকাঠির উপর বাথারির বাঁধন। এক একখানি ছইয়ের নীচে অনেকগুলি কামরা। প্রত্যেক কামরায় লম্বায় ছ'টি করিয়া জানালা ও আড়ে একটি করিয়া দুয়ার। এই আকারের নৌকা যে সাজ্যায় ছিল, তাহারই একখানিতে বিহারী দত্ত সপরিবারে বাস করিতেন। সেই ছইয়ের উপর একটি প্রকাণ্ড মাচা, মাচার উপর একটি ঘর। বুড়া পাটনি রাতদিন সেই মাচার উপর হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিত। হালখানি দেখিতে মাছের লেজের মত, গভীর জল পর্য্যন্ত গিয়াছে। হালের মাথায় একটি লোহার শিক বাঁধা। মাঝির হাতে সেই শিক। প্রত্যেক নৌকার দুইধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড় বড় চোখ। মাঝখানে বড় বড় বেণের নাম লিখা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর এক সাজ্যার নৌকাগুলি লম্বা ছাঁদের। তাহাতেও ঐরূপ ছই, ঐরূপ অনেকগুলি কামরা, ঐরূপ চোখ ও বেণের নাম লেখা। এক এক নৌকায় ৩০।৪০ খানি করিয়া দাঁড়, প্রকাণ্ড মাস্তুল ও অনেক-গুলি করিয়া পাল।

নদীর ভিতর নৌকা চালান বিশেষ কঠিন, কেন না, মাঝে মাঝে চড়া আছে। মাঝিদের সে সব জানা-শুনা। তাহারা অনায়াসেই নদী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িল। সমুদ্রের কিনারায় ডিঙ্গা লাগাইয়া সমুদ্রের পূজা দিল। সে দিন তীরে আহারাদি করিয়া খাবার জল তুলিয়া লইল। প্রত্যেক নৌকায় অনেকগুলি করিয়া জালা ছিল। এখন সেইগুলি মিষ্টজলে পরিপূর্ণ করিয়া লইল। তখন সকলে বরুণদেবের সারিগান ধরিল, ক্রমে ডিঙ্গা সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছিল।

যতদূর নদীর জল যায়, জল ঘোলা; তাহার পর খানিক সবুজ জল; তাহার পরই 'কালাপাণি'—জল সিউ-কালীর মত কাল। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ খেলিতেছে। আর ঢেউএর উপর মুক্তার মত সাদা জলের কণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় ডানাওয়ালা মাছ লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে, দুইচারিটা ডিঙ্গার উপরেও পড়িতেছে। এইরূপে একটি মাছ পাইয়া বিহারী দত্তের মেয়ে ত আহ্লাদে আটখানা। তখন রসুইদারকে ডাকাইয়া মাছটি ভাজাইয়া লইল ও তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিল। মাঝে মাঝে সমুদ্রের উপর অনেক জলজন্তু ভাসিয়া উঠিত। এমনি ত সে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাকে বিব্রত করে; সমুদ্রের মাঝে যে সে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তাহার ঠিকানা নাই। ভোর হইতে না হইতেই সে ছইয়ের উপর গিয়া মাঝির কাছে বসে আর মাঝিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে; দুই এক দিনেই সে বুঝিল যে, সমুদ্রের কথা তাহার বাবার চেয়ে মাঝিই ভাল জানে।

[৪]

একদিন ভাত খাইবার সময় সে বাবাকে বলিল, "বাবা,—বাবা, আজ ভোরবেলায় মাঝির কাছে মাচার উপর বসিয়াছিলাম ; দেখি কি, সূর্য্য জলের ভিতর থেকে উঠছে! সূর্য্য উঠবার আগে আলোগুলা বাহির হইতে লাগিল—ঠিক যেন দড়ী। দেশে যে দেখি, সূর্য্যের হলুদ রঙ, দেখিতেও খুব ছোট ; কিন্তু এখানে দেখি যেন একটা প্রকাণ্ড রাঙা জালা। দড়ী দিয়ে কে যেন জালাটাকে উপরে টেনে তুলছে। সূর্য্য জল থেকে যখন বাহির হইল, তখন ক্রমে ক্রমে রাঙা রঙ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, আর আমাদেরই দেশের মত চক্‌চকে হলুদ রঙ হয়ে দাঁড়াল। আমার চোখও ঝল্‌সে যেতে লাগিল। আমি আর তাকাতে পারিলাম না।"

আবার একদিন মেয়েটি বলিল, "হাঁ বাবা, মাস্তুল ধ'রে যখন ছইএর উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, দেখি কি না, জলটা যেন গোল হয়ে গিয়াছে, আর তাহার ওদিকের জল যেন নামিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন একটা খুরা-দেওয়া বাটি উবুড় করিয়া রাখিয়াছে।"

আবার একদিন বলিল, "আজ সূর্য্যকে ডুবিতে দেখিয়াছি। রাঙ্গা জালাটির মত আস্তে, আস্তে, আস্তে জলের ভিতরে পড়িয়া গেল।"

দুই চারি দিন ত বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। ক্রমে যত টাট্‌কা তরিতরকারী ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, শুধু নারিকেল-ভাজা, ডাল আর ডালের বড়া সম্বল হইল, জলখাবারের মধ্যে কেবল হইল শুক্‌না চিঁড়া, শুক্‌না গুড় ; তখন ডাঙ্গা দেখিবার জন্য প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিল। মাঝিকে তখন মেয়েটি কেবল জিজ্ঞাসা করে—"ডাঙ্গা কতদূর?"—আর চারিদিকে চাহিয়া দেখে, গাছপালা দেখা যায় কি না।

পাঁচ সাত দিনের পর একদিন দূরে দেখা গেল, একটা কাল দাগ যেন জলের ভিতর থেকে উঠছে। মেয়ে অমনি জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি ?" মাঝি বলিল, "ওটা রাক্ষসের দ্বীপ। ওখানে যারা থাকে, তারা কাঁচা মানুষ খায়।" মেয়ে অমনি পাইয়া বসিল, "তাদের তুমি কেমন করিয়া দেখিলে ? দেখিলে যদি, তোমায় তাহারা খাইল না কেন ? তাহারা মানুষ রাঁধিয়া খায়, না কাঁচাই খায় ইত্যাদি ইত্যাদি।" মাঝি যাহা যাহা জানিত, সব বলিল। বলিল, "ওদেশে তাহারা প্রায়ই যায় না। ও জায়গাটা তাহারা বাঁয়ে ফেলিয়া সরাসর দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়। একবার গিয়াছিল ; ঝড়ে নৌকা বাঁধিবার জন্য গিয়াছিল। অনেক রাক্ষস আসিল। তাহারা একেবারে নেংটা থাকে, কেউ কেউ একটা পাতার কাপড় পরে। যেমন সালপাতায় কাঁটা দিয়া খাবার পাত্র হয়, সেই রকম পাতায় কাঁটা দিয়া কাপড় করে, তাই পরে। তাও সকলে নয়। তারা মাছ ধরিয়া খায়, শীকার করিয়া মাংস খায়, আর একলা-দোক্‌লা মানুষ পাইলেও খাইয়া ফেলে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল, সেই ভয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই। কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" মাঝি সে দিকে নৌকা চালাইল না। মেয়েরও রাক্ষসের দেশ দেখার বড় ইচ্ছা ছিল না। সেও নামিয়া আসিয়া বাবাকে রাক্ষসের দেশের গল্প শুনাইতে লাগিল।

[৫]

ক্রমে ডিঙ্গাগুলি গিয়া বালীদ্বীপে পঁহুছিল। সেই জায়গাটাকে বড় আড্ডা করিয়া বিহারী সমস্ত দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও সব জায়গাই এক একবার ঘুরিলেন। কর্ম্মচারীদের কাজ-কর্ম্ম তদারক করিলেন। হিসাব দেখিলেন। বাহাল-বরখাস্ত করিলেন।

দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসায়ের পথ ফলাও করিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ মাস থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবার ব্যবসায়ে অনেক লাভ হইল; কারণ, যে সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন, তত ভাল জিনিস, আর তত বেশী জিনিস আর কখনও পান নাই; সুতরাং তিনি খুব খুসী, তাঁহার সংস্কার, মেয়ের পয়েই তাঁহার লাভ বেশী হইয়াছে; সুতরাং মেয়ের উপর তাঁহার ভালবাসা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েও খুব খুসী; বিহারীর সঙ্গে যাহারই কারবার ছিল, সকলেই মেয়েকে খুব আদর করিয়াছে, নানা জিনিস দিয়াছে। রাজারা মেয়েকে কোলে করিয়া তাহাকে খাবার দিয়াছেন, গহনা দিয়াছেন। সে যাহা দেখিতে চাহিয়াছে, সব দেখাইয়াছেন। সব মন্দিরে সে গিয়াছে, সব জায়গায় পূজা দিয়াছে, সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে। তথাপি দেশে ফিরিবার নামে তাহার বড়ই আনন্দ। দেশের এমনি টান, আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরাণ খেলুড়ীদের সঙ্গে খেলা করিবে, গঙ্গায় স্নান করিবে, ঠাকুরদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিবে, তাহার ভারি আহ্লাদ!

ক্রমে ক্রমে উনপঞ্চাশ খানা ডিঙ্গা আসিয়া বালীদ্বীপে জুটিল। যার যা মেরামতের ছিল, মেরামত করা হইল। সব ডিঙ্গা আবার বাঙ্গালার দিকে চলিল। অনেক বাঙ্গালী বহু দিন ধরিয়া বিদেশে বিহারীর কাজ করিতেছিল, তাহারা অনেকে ছুটী লইয়া, অনেকে ইস্তফা দিয়া, অনেকে বৃত্তি বার্ষিক লইয়া, অনেকে আবার বরখাস্ত হইয়া দেশে ফিরিল। সবাই বিহারীর অতিথি, বিহারী অতিথিদের সৎকারে মুক্তহস্ত। বিহারীর স্ত্রী এই সব অতিথিদের সেবায় খুব মন দিয়াছেন। তাহাদের কাহারও কোন জিনিসের দরকার হইলে তৎক্ষণাৎ যোগাইতেছেন। আর বিহারীর মেয়ে সবারই সব, সর্ব্বদাই সবার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহাকেও

দাদা মহাশয়, কাহাকেও কাকা, কাহাকেও মামা, কাহাকেও ভাই বলিয়া, সকলেরই কাছে যাইতেছে, সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সকলেরই কোলে উঠিতেছে, সকলেরই আদর পাইতেছে। সেই বুড়া মাঝি কিন্তু তাহার প্রধান সঙ্গী, সে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই কাছে যাইতেছে। এক মেয়েতে ডিঙ্গাগুলিকে মাৎ করিয়া রাখিয়াছে।

সব ডিঙ্গা ভাসিল, কেহ বলিল জয় কালী, কেহ বলিল জয় সাতগাঁয়ের কালী। কেহ বলিল জয় গঙ্গামার জয়, কেহ বলিল জয় বরুণদেবের জয়, কেহ বলিল জয় সমুদ্রের জয়। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। যাবার সময় স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া পাল তুলিয়া আসিয়াছে। আসার সময়ও ঠিক সেই ভাব। বিহারীর আনন্দ ধরে না। সে এক একবার ছইএর উপর উঠিয়া ডিঙ্গা গণে দেখে, সব ডিঙ্গাই চোখের সামনে আছে। মনে মনে লাভালাভ কশে, আর দেখে যে, এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনই হয় নাই।

[৬]

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। একদিন সকালে উঠিয়া দেখিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কাল মিসমিসে একখানা মেঘ উঠিয়াছে। মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড় সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন, ওখানা ভাল নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশী নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।" বলিতে বলিতে ঝড় উঠিল, প্রথম বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, তাহার পর ঝাপটা, এক এক ঝাপটায় নৌকাগুলা যেন উল্টাইয়া পড়ে, কিন্তু বাঙ্গালার পাটনি মাঝি বড় শক্ত মাঝি। হাল

চাপিয়া ধরে আর নৌকা ঠিক থাকে। ঝাপ্‌টা আসার পূর্ব্বে মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটান ও নামান হইয়াছিল; সুতরাং পালশুদ্ধ নৌকা গুঁজড়াইয়া অতল জলে ডুবিবে, সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝড়-ঝাপ্‌টা, ঝড়ের ধাক্কা, গোঁগোয়ানি, এ সকলের চেয়ে আর এক ঘোর বিপদ্ আসিয়া পঁহুছিল, সে হইল সমুদ্রের ঢেউ। জোর বাতাসে ঢেউগুলি জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। সিকি মাইল, আধ মাইল, এমন কি, এক মাইল লম্বা এক একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতে লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ছইএর উপর দিয়া ঢেউ গিয়া নৌকার ওপারে পড়িতে লাগিল। ঢেউএর মাঝখানে নৌকা পড়িলে, চড়ন্দারেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সকলে ইষ্ট দেবতার নাম করে; ভাবে, আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত্ত পরে আবার ঢেউ সরিয়া গেলে, আবার তাহাদের মনটা একটু সুস্থ হয়। কিন্তু সে সুস্থভাব কতক্ষণ? আবার ঢেউ,—আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি, বস্তা বস্তা তুলা—পিঁজা তুলা সমুদ্রের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাতাসে জল প্রথম ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্য্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফুলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মত উঠিয়া পড়ে; তাহার পর সেই ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া ফেনা বাহির হয়। ফেনা গড়াইতে থাকে, গড়াইতে গড়াইতে দু-ক্রোশ, পাঁচ-ক্রোশ, দশ-ক্রোশ যাইয়া আবার জলে মিশিয়া যায়। থাকে কেবল দুধের মত শাদাটুকু। কবির বড় আমোদ, তিনি খুব বর্ণনায় সুবিধা পান; কিন্তু যাহারা সেই ফেনার মধ্যে পড়ে, তাহাদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে। চড়ন্দারেরা মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে—"তোরা আপনার দোষে আমাদের ডুবাইলি দেখিতেছি।" তাহারা মাঝিদের গালি পাড়ে। মাঝি-মাল্লারা প্রাণপণে নৌকা রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সেই ভয়ানক

ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? তাহারাও গালি পাড়ে; আর বলে—"আমরা কি করিব? তোমাদের বলিতেছি, চুপ করিয়া বসিয়া থাক, নড়িলে চড়িলে নৌকা রাখা ভার হইবে।" তাহারা বলে—"হাঁ রে বেটারা, আমরা কি গুড়ের নাগরী যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের কি প্রাণের ভয় নাই? তোদের কি? তোরা পরের প্রাণ লইয়া খেলা করিতেছিস্।" তাহারা বলে—"আমাদের বুঝি প্রাণ নয়? তোমাদেরও যেমন প্রাণ, আমাদেরও তেমনি। আমাদের প্রাণ থাকিলে ত তোমাদেরও প্রাণ থাকিবে।" একজন বলিল—"বেটারা জানিস্, এই সাজ্ঘায় বিহারী দত্ত আছে। সে যদি ডুবে, বাঙ্গালা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।" তাহারা বলিল—"হাঁ হাঁ, জানি; কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশী দরকারী। বিহারী মরিলে তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারদের দেখিবার অনেক লোক হইবে। আমাদের স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার কে আছে, বল দেখি?" আবার ঢেউ আসিল। সব ঝগড়া-বিবাদ, সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া গেল। আবার ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়িয়া গেল।

[৭]

এ দিকে বিহারীর নৌকায় ঢেউ দেখিয়া মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁতকপাটি লাগিয়াছে। বিহারীরা স্ত্রী-পুরুষে জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রের গোঁগোঁয়ানি সহিতে পারিতেছে না, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় বিহারীর স্ত্রীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল,

মাঝিরা একখানা কাঠের সেউতি আগাইয়া দিল। বেণেবৌ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না। একটু সুস্থ হন, আবার বমি, নৌকা যত দোলে, বমি ততই বেশী হয়। বোধ হয় যেন, পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে কাতরভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, আর বমি করে। কথা কহার সামর্থ্য নাই, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। বেণেবৌ অসাড় হইয়া পড়িল। মেয়ের ও স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া বিহারী স্থির থাকিতে পারিল না। বার বার বড় মাঝিকে ডাকিতে লাগিল। মাঝি আসে না। সে বলে, "এখন আমি হাল ছাড়িলে রক্ষা থাকিবে না।" তখন বিহারী পাগলের মত হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, "আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের এই অবস্থা, আমায় রক্ষা কর।" সে বলিল, "রক্ষাকর্ত্তা আমি নহি, সে ভগবান্! ভগবানের শরণ লও।" বিহারী বলিল, "আমি যে ভগবানকে ডাকিব, সে শক্তি নাই। সম্মুখে আমার সর্ব্বস্ব স্ত্রী ও কন্যা মারা যায়, আমার মনে সে জোর কোথায় যে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি? তুমি রক্ষা কর।" মাঝি বলিল, "তোমার স্ত্রীর যে ব্যারাম হইয়াছে, জলের ক্ষোভ হইলে অনেকেরই ওরূপ হয়। জল স্থির হইলে উহা আর থাকিবে না। তুমি একটু শান্ত হও। এতবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছ, তুমি উতলা হও কেন? তোমার মেয়ের প্রাণের কোন ভয় নাই। সে ঢেউ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, ঢেউ থামিলেই সুস্থ হইবে।" বিহারী বলিল, "আমার আর সয় না, তুমি ইহার একটা বিহিত কর, নহিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব; ঐ শুন, আবার বাতাস গোঁ গোঁ করিতেছে, আবার ঝাপ্টা আসিবে। আবার পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ আসিয়া নৌকা খানাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিবে।" মাঝি বলিল, "মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনার ৭।৮ লক্ষ

টাকা ক্ষতি হইবে, সহিতে পারিবেন ত বলুন।" বিহারী বলিল, "আমার যথাসর্ব্বস্ব যায়, সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।" "আচ্ছা, তবে আপনি ঘরে যান, আমি যাহা জানি, করিয়া ফেলি।" বলিয়া মাঝি আর একজন মাঝিকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। সে নৌকার খোলের ভিতর গেল আর সমস্ত মাঝি-মাল্লা ডাকিয়া ৫০টা গর্জ্জন তেলের পীপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড় যখন খুব জোরে আসিতেছে, তখন সেই পীপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অনেক কষ্টের সংগ্রহ করা তেলের পীপাগুলি এইরূপে নষ্ট করায় বিহারীর মনে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তেল যতদূর যাইতে লাগিল, সমুদ্র স্থির হইতে লাগিল; বাতাসের যে জোর, সেই জোরই রহিল, কিন্তু সমুদ্রে আর ঢেউ উঠে না। সমুদ্র দর্পণের মত স্থির হইল; নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। বেণেবৌ একটু সুস্থ হইল, তাহার বমি থামিয়া গেল। মেয়েও সুস্থ হইল; বেণেরও মনটা ঠাণ্ডা হইল, সে মাঝিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবে স্বীকার করিল। মাঝির উপর তাহার বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনও সমানে বহিতেছে। মাঝি দত্ত মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইল। বেলা তখন দুপর। বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিম মুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙ্গাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে। মাঝি বলিল—"ঝড়ে আমাদের বড়ই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় ৭।৮ দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহানায় গিয়ে পঁহুছিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[১]

মাঝী যাহাই বলিল, তাহাই হইল। সন্ধ্যার একটু আগে, চাকি ডুবডুব সময়ে বিহারীর সাঙ্গার ৭ ডিঙ্গা গঙ্গার মোহানায় আসিয়া পঁহুছিল ও একটা প্রকাণ্ড বালির চড়ায় নোঙ্গর করিল। চড়াটা অনেক উঁচা হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া জলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে; যেখানটা খুব উঁচা, সেইখান হইতে ওদিকে নিবিড় বন। সুন্দরী-গাছই বেশী; সোঁদাল, পাঁও প্রভৃতি গাছও আছে, দুই চারিটা বড় গাছও আছে। আর তলায় বেত-বন, গোলপাতার গাছ, আর নানা রকম লতাগুল্ম। নোঙ্গর করা হইলে অনেক মাঝী ও অনেক চড়ন্দার মহা আনন্দে নামিয়া অনেক দিনের পর বাঙ্গালার মাটী ছুঁইয়া গেল।

বিহারীর স্ত্রী ঝড় থামিলেই ঘুমাইয়া পড়িল। সে বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটা কিন্তু ঝড় থামিলেই আবার যে সেই হইয়া দাঁড়াইল, তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে আবার মাঝীর হাল-ঘরে গিয়া বসিল। "বাঙ্গালার মাটী" ছুঁইবার ইচ্ছা তাহারও হইয়াছিল, কিন্তু মাঝী তাহাকে যাইতে দিল না। কিন্তু সে কেবল দেখিতে লাগিল যে, বালির উপর কত রকমের ঝিনুক ও কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে;—ছোট, বড়, লাল, সাদা, ডোরা দেওয়া, দাগ দেওয়া। সে যে কত, তাহার ঠিকানা নাই। ঝিনুক কুড়াইবার সাধ তাহার বড়ই হইয়াছিল; কিন্তু মাঝী বলিল, "সন্ধ্যার সময় এখানে ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর থাকে।

তোমার যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না।" বলিতে বলিতেই কতক-গুলি লোক "শিয়াল শিয়াল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর দেখা গেল, একটা বাঘ ছুটিয়া পলাইতেছে। সুতরাং মেয়ের আর যাওয়া হইল না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, সে আপনার ঘরে গেল ও ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও সে ঝিনুক স্বপ্নে দেখিয়াছিল। ঝিনুকের উপর তাহার ভারি টান হইয়াছিল।

ভোর হইল। দু একজন মাঝী উঠিল, উঠিয়া নৌকার সিঁড়ি মাটীতে দিল, নৌকা হইতে নামিল। ডাঙ্গায় উঠিয়া তাহারা নিজের কাজে গেল। বিহারী তখনও ঘুমাইতেছিল। তাহার স্ত্রীও আগের দিনের কষ্টে একান্ত কাতর হইয়া ঘুমাইতেছিল। মেয়ে কিন্তু সিঁড়ি পড়ার শব্দ পাইয়া আস্তে আস্তে উঠিল, আস্তে আস্তে ঝাঁপ খুলিল, আস্তে আস্তে অন্য কামরা পার হইয়া সিঁড়ির কাছে গেল, সিঁড়ি বাহিয়া মাটীতে নামিল, নামিয়া ঝিনুক খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে নৌকা হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের একেবারে কিনারায় সে অনেক ঝিনুক দেখিতে পাইল। সাদা সাদা, ছোট ছোট, ঝিনুক কুড়াইবার জন্য সে একটি ঝাঁপী আনিয়াছিল। সেগুলি ঝাঁপীর মধ্যে রাখিল। তাহার পর রঙিন ঝিনুক কুড়াইতে আরম্ভ করিল। খুঁটিয়া খুঁটিয়া কোনটি ডোরা, কোনটি দাগওয়ালা, কোনটি দু-রঙ্গা, কোনটি তিন-রঙ্গা, কোনটি পাঁচ-রঙ্গা ঝিনুক কুড়াইয়া ঝাঁপী প্রায় আধ-পুরন্ত করিয়া ফেলিল। বুড়া লোকও সমুদ্রের ধারে বালির চড়ায় ঝিনুক কুড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না; বেণের মেয়ের ত ৯।১০ বছর বয়স, সে যে সে লোভ সামলাইতে পারিবে, এরূপ মনে করাও অন্যায়। যাহা হউক, সে একেবারে তন্ময় হইয়া ঝিনুক কুড়াইতে লাগিল। এই ঝিনুক দিয়া সে বাবার গায়ের ঘামাছি মারিয়া দিবে, এই ঝিনুক সে

তাহার ব্রাহ্মণ-সখীকে দিবে; এই সব ঝিনুক লাগাইয়া সে ঠাকুরের পীঁড়ি করিয়া দিবে, এইরূপ ভাবিতেছে, আর কুড়াইতেছে।

[২]

বিধাতা যে এই সময়ে তাহার ঘোর বিপদ্ আনিয়া দিবেন, সে তাহা মনেও করিতে পারে নাই। সে ঝিনুকই কুড়াইতেছে। এমন সময় দুর থেকে একটা কি গোলমাল শুনা গেল। সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। তাহার পরই "শিয়াল শিয়াল" শব্দ শুনা গেল, তখন তাহার আগের দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল, তবে ত বাঘ এসেছে! সে একবার চারিদিক চাহিল, যেমন পিছন ফিরিবে, অমনি দেখিল, প্রকাণ্ড বাঘ! দেখিয়াই ত সে আড়ষ্ট; পরক্ষণেই মূর্চ্ছা। দূরে অনেক লোক ছুটিয়া আসিতেছে; কিন্তু বালির উপর দিয়া ছোটা আর স্বপ্নে ছোটা একই রকম। যতই ছোট, আগাইয়া যাওয়া যায় না। যাহারা ডাঙ্গায় নামিয়াছিল, সকলেই মেয়েকে রক্ষা করার জন্য ছুটিতেছে—উত্তর, পশ্চিম মুখ হইতে ছুটিতেছে; কিন্তু কেহই নিকটে আসিয়া পঁহুছাইতে পারিতেছে না। "গেল গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। "বিহারী দত্তের মেয়েকে বুঝি বাঘে নিলে! আমাদের মায়াকে বুঝি বাঘে নিলে!" শব্দটা বেহারীর কানে গেল। সে উঠিয়া দেখিল, মায়া বিছানায় নাই। চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, এই পড়ে ত এই পড়ে করিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িল, সিঁড়ি কোথায়, তাহার খোঁজও লইল না। বিহারীর বৌ লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া স্বামীর পিছনে পিছনে ছুটিল। ছুটিয়া কি করিবে? বালিতে কি পা উঠান যায়? প্রাণপণে ছুটিতেছে অথচ যেখানকার, প্রায় সেইখানেই আছে। বাঘ ধীরে ধীরে মেয়ের কাছে গিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাবা গাড়িয়া

বসিয়া রহিল। আর রক্ষা নাই। লোকে কতই চেঁচামেচি করিতে লাগিল, বাঘের তাহাতে লক্ষ্যই নাই; সে একদৃষ্টে মেয়ের দিকে চাহিয়া আছে।

[৩]

চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দূরে একখানি পান্‌সা দেখা গেল, পান্‌সী তীরবেগে যেখানে বাঘ, সেই দিকে আসিতেছে। ডাঙ্গা হইতে দশ বার হাত তফাতে হঠাৎ থামিয়া গেল। আর এই পান্‌সী হইতে একটা প্রকাণ্ড তীর আসিয়া বাঘের সামনের দিকে এমন জোরে বিঁধিল যে, বাঘের বুকে বিঁধিয়া পীঠের দিকে তাহার ফলা বাহির হইয়া পড়িল। বাঘ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ফিরিল। দাঁড়াইবা মাত্র যে দিকে তীরের পাখা, সেই দিক্‌টা মাটীতে লাগিয়া যাওয়ায় বাঘ প্রথম পলাইতে পারিল না। পরে এমন জোরে লাফ দিল যে, শরের তীর বই ত নয়, তীরটা ভাঙ্গিয়া গেল, বাঘ হালুম হালুম করিয়া ছুটিল। বালি অতিক্রম করিতে তাহারও খুব কষ্ট হইয়াছিল এবং দেরীও হইয়াছিল। তথাপি লোকে তাহার কাছে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সে বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে তাহার আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। কতকগুলা বানর একটা গাছে ঝুলিতেছিল, বাঘ ঐ অবস্থায় গাছের তলায় আসিলে তাহারা গাছ হইতে লাফ দিয়া তাহার পীঠে পড়িল, আর কেহ বা তাহার লোম ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ বা ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল, কেহ বা সেই তীরের ফলাটা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বাঘ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িয়া গেল, অমনি সে মরিয়া গেল। তীরের আঘাতে একটা বানরও জখম হইল। বানরের এক বিষম রোগ আছে। সে নিজের রক্ত দেখিতে পারে না। সে দেখিল, তাহার গা দিয়া রক্ত

পড়িতেছে ; অমনি এক হাত দিয়া রক্ত মুছে হাতটা দেখে আর ছুটে—এইরূপে বনের ভিতর একটা মহা কাণ্ড হইয়া গেল।

বাঘ ও বানরের খেলা কিছু এ গল্পের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং মায়া ব'লে বিহারী দত্তের যে মেয়ে ছিল, আমরা চলুন, তাহারই কাছে যাই। সে ত এখনও নিঃসাড়, নিস্পন্দ। পান্‌সীখানা তীরে লাগিয়াছে, আর তাহার উপর থেকে একটি ১৮।১৯ বছরের ছোকরা লাফাইয়া তীরে পড়িয়াছে ; তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়াছে এবং দৌড়িয়া আসিয়া মেয়েটিকে কোলে করিয়া, তাহার যাহাতে জ্ঞান হয়, তাহাই করিতেছে ; নাকের গোড়ায় হাত দিয়া দেখিতেছে—নিশ্বাস পড়িতেছে কি না ; লোনাজল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইতেছে, তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। ক্রমে বিহারীর দল আসিয়া পঁহুছিল, কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পঁহুছিলেন। বিহারীর স্ত্রী ছেলেটির কোল থেকে মেয়েটিকে নিজের কোলে লইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। জাঁতী আনিয়া দাঁতকপাটী খোলা হইল। ঠাণ্ডাজলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে মেয়ের চক্ষু খুলিল। চক্ষু খুলিয়া সে মাকে দেখিল না, দেখিল সেই ছেলেটিকে, তাহার দিকে চাহিয়া সেও বলিল, "কেমন, আমায় চিনিতে পার, মায়া? সকলেই এতক্ষণ মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে ছেলের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। ছেলেটি কথা কহিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে ছেলেটি সাতগাঁয়ের প্রসিদ্ধ বেণে সাধু ধনীর একমাত্র পুত্র জীবন ধনী।

[৪]

সাতগাঁয়ের বেণেদের ভিতর ধনি-বংশ অতিপ্রাচীন, তাহারা সঙ্ঘ-আশ্রমের বণিক্। এই বেণেরা সঙ্ঘের নিকট গন্ধদ্রব্য ও পূজার উপকরণ বেচিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে। মধু তাহারাই বেচিত, মধুর

বিস্তর কাজ ছিল। সঙ্ঘের লোকে প্রায়ই কবিরাজী করিত। ঔষধপত্রে ত মধুর বড় দরকার! আরও অনেক কাজে মধু লাগিত। মোমবাতীও সঙ্ঘে লাগিত, মন্দিরে বাতী দেওয়া তখন একটা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে ছিল। ধুনা, গুগ্‌গুল, ধূপের কাঠ, নানা রকম তৈয়ারী ধূপ, চন্দনকাঠ, সাদা-চন্দন, রক্তচন্দন, হরিচন্দন, কর্পূর, গন্ধতৈল, অনেক রকম পানের ও রান্নার মসলা সঙ্ঘ-আশ্রমের বেণেরা বেচিত। এই আশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ধনিবংশ। সাধু ধনী, তাহার উপর, সুন্দর-বনে বছর বছর মহাল করিতে যাইতেন। কালুরায় ও দক্ষিণরায় তাঁহার পূজায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, বাঘে ও কুমীরে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। সুতরাং সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই সাধু ধনীর গতিবিধি ছিল। তিনি সুন্দরবন তন্ন তন্ন করিয়া ঘুঁটিয়া বেড়াইতেন, এবং বাঘের ছাল, বাঘের নখ, কুমীরের হাড়, চামড়া, সুন্দরী-কাঠ, গরাণ কাঠ, গোলপাতা, মেলান্দার মাদুর, একচাটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার মত তীরন্দাজ তখন আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার টিক অদ্ভুত ছিল, এক রকম অব্যর্থ। ছেলে অল্পবয়স হইলেও প্রায় বাপের মতই তীরন্দাজ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার তীরে কেমন করিয়া বিহারী দত্তের মেয়ে মায়ার জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সাধু ধনী ও তাহার ছেলে সুন্দরবনে মহাল করিতে গিয়াছিল। ঝড়ের সময় তাহারা এক নিরাপদ্ স্থানে ছিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা ঐ বালির চড়ার আর এক পার্শ্বে নঙ্গর করিয়াছিল। নিকটে আর কয়েকটি সাজ্যার ডিঙ্গা রহিয়াছে দেখিয়া সাধু ছেলেকে খবর লইবার জন্য পাঠাইয়াছিল। ছেলেও বালির উপর দিয়া শীঘ্র যাইতে পারিবে না বলিয়া পান্‌সী করিয়া আসিতেছিল। দূর হইতে বাঘে একটা মেয়েকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া, সেই দিকে পান্‌সী চালায় ও বাঘকে একটা তীর মারে।

মেয়ে একটু সুস্থ হইলে বিহারী জীবনের কাছে আসিয়া তাহার সঙ্গে নানা কথা কয় এবং জানিতে পারে যে, সাধু ধনী নিকটেই আছে। সে মেয়েকে নৌকায় লইয়া যায় এবং তাহার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। জীবনকেও আপনার নৌকায় বসাইয়া তাহাকে যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করে। "তোমার বাবা যে তোমার জীবন নাম রাখিয়াছিল, আজ তাহা সফল হইল। তুমিই আজ আমার মায়ার জীবন দিয়াছ। তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না।" বেণে-বৌও জীবনকে খুব করিয়া খাওয়াইলেন এবং অনেক করিয়া আদর করিলেন। মেয়েটাও জীবনকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইল। সে আর জীবনকে কি বলিবে, কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, আর চোখের চাহনিতে আপনার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। জীবনের জন্য তাহার প্রাণে যে একটা বিষম টান হইয়াছে, সে তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

[৫]

বিহারী নিকটে আছেন, লোকমুখে খবর পাইয়া সাধু ধনী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সব সংবাদ শুনিয়া সেও আহ্লাদে আট-খানা হইল। "আমার ছেলে বিহারীর মেয়ের জীবনরক্ষা করিয়াছে।" বিহারীর সঙ্গে তাহাদের ত খুব আত্মীয়তা ছিলই, তাহার উপর এই ঘটনায় সেই আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুই তিন দিন ধরিয়া চড়ায়ই খুব ধূমধামে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ হইল, তাহার পর দুই বণিকের সব সাজ্যা একত্র হইয়া সাতগাঁয়ের দিকে চলিল। দু'তিনখানা ছিপ আগেই গিয়া সাতগাঁয়ে সব ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল।

মহা ধূমধামে আমোদ-প্রমোদে বণিকেরা আসিয়া গোলার ঘাটে সাজ্বা বাঁধিল। এইবার যে যাহার গোলায় যাইবে। সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত। বিহারীর লোকজন, যাহারা বহু-কাল বিদেশে ছিল, তাহারা আগেই নামিয়া আপন আপন বাড়ী চলিয়া গেল। বিহারীও মালপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মায়ার কিন্তু মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, জীবন সঙ্গে গেলে ভাল হইত! মাও মেয়ের মন বুঝিলেন; জীবনকে বলিয়া দিলেন, "তোমার মার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আমার ওখানে আসিও। তোমার, তোমার বাবার ও তোমার মার নিমন্ত্রণ রহিল।" তখন মেয়ে একটু সুস্থ হইল, এবং হৃষ্টচিত্তে মা ও বাপের সঙ্গে সাতগাঁর বড় রাস্তার উপর তাহাদের যে বড় বাড়ী ছিল, সেইখানে চলিয়া গেল।

আর অধিক বলিতে হইবে না। ক্রমে যাওয়া-আসায় দুই পরিবারে বেশ সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল, এবং ছেলে ও মেয়ের বেশ প্রণয়-সঞ্চার হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সাধু ও বিহারী বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইলেন এবং মায়ার সহিত জীবনের বিবাহ হইয়া গেল। সাতগাঁ সহর শুদ্ধ লোক খুসী। দুইটা বড় বড় ঘর এক হইয়া গেল। দিনকতক কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[১]

ঐ ঘটনার ৪ বৎসর পরে যেদিন রূপা রাজার গাজন বাহির হয়, সেই দিন মায়া আসিয়া রাজার গুরু ও গুরুপুত্রের গলায় মালা দিয়া গেল, তখন তাহার মুখে বড়ই বিষাদের ছায়া। কারণ, সে সময় তাহার স্বামী জীবন ধনী অত্যন্ত পীড়িত। শ্বশুর পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ধনাবংশের বড় ঘরে একটি জীবনমাত্র ভরসা ; সেও অত্যন্ত পীড়িত। তাহারই জীবনের উপর আবার দত্ত-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাই তাহার মুখ ম্লান। সে মালা দিবার সময়ে মনে মনে প্রার্থনা করিল—"হে গুরুদেব, আপনি ত অন্তর্যামী, আমার মনের কথা বুঝিয়া, আমার স্বামী যাহাতে জীবন পান, আশীর্ব্বাদ করুন।" গুরুপুত্রের গলায় মালা দিবার সময় তাঁহারও কাছে সেই প্রার্থনা করিল। দুজনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে যেন হাতে হাতে ফল পাইলাম মনে করিয়া হাতী হইতে নামিল। তাহার পর সে সকল দেবতার কাছেই মানত করিত, "ঠাকুর, আমায় বিধবা করিও না, আমার স্বামীর জীবন দাও।" পূর্ণিমা-অমাবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়ী সিধাভোজ্য পাঠাইয়া এই কামনাই করিত। বুদ্ধ-মন্দিরে দীপ দিয়াও এই কামনাই করিত। ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিয়াও এই কামনাই করিত। স্বামীর সেবায় তাহার বিরতি ছিল না। যে চিকিৎসক যাহা বলিয়া দিতেন, সে অকাতরে পরিশ্রম করিয়া তাহাই করিত। যে দৈবজ্ঞ যেরূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দিতেন, সে কোনও বিষয়ের ত্রুটি না করিয়া তাহাই করিত।

বিহারীরও যত্নের ক্রটি ছিল না। দেশদেশান্তরের সন্ধ্য হইতে বড় বড় বৈদ্য আনাইতেন; দেশদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ-ভিষক্ আনাইতেন, নিজে প্রায়ই জামাতার গঙ্গাতীরস্থ গোলায় যাতায়াত করিতেন; সব কাজ নিজের চোখে তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জীবন ধনী দুই বৎসর কাল ভুগিয়া ভীষণ যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ করিল। বিহারীও জামাইয়ের শোকে কেমন যেন জড়ভরত হইয়া গেল। যাহার এত উদ্যম এবং অধ্যবসায়, সে যেন কেমন হইয়া গেল বেণে-বৌ ত সেই অবধিই শয্যা নিলেন। মেয়েটা স্বামীর পরলোকের জন্য যাহা করা আবশ্যক, সব করিয়া, স্বামীর জুতা, স্বামীর খড়ম, স্বামীর কাপড়চোপড় একটা সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া তাহারই পূজা করিত, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত—"ভগবান্, আমায় শীঘ্র করিয়া স্বামীর কাছে লইয়া যাও। একা সেখানে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। সেই বাবমারার দিন হইতে তিনি ত আমায় ছাড়া থাকেন নাই। এখন তাঁহার বড়ই কষ্ট, আমায় তাঁহার কাছে লইয়া যাও।" সে ঘরের বাহির প্রায়ই হইত না। কেবল ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য যাইত। ঠাকুরের কাছে তাহার একমাত্র প্রার্থনা—"আমায় তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও।" মহাবিহারেও সে পূজা দিতে গিয়াছে। সেখানে তাহার সেই প্রার্থনা; হেরুক মূর্ত্তির কাছেও তাহার সেই প্রার্থনা; বুদ্ধ মূর্ত্তির কাছেও তাহার সেই প্রার্থনা; বিষ্ণুমূর্ত্তির কাছেও তাহার সেই একই প্রার্থনা; শিবের মন্দিরেও তাহার সেই একই প্রার্থনা। সে আর বাড়ী বড় যাইত না, গোলাতেই থাকিত। গোলা গঙ্গার ধারে। সে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত আর সেই এক প্রার্থনা করিত। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাহার সেই প্রার্থনা; ভিক্ষু দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা; যোগী দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা; সিদ্ধপুরুষ দেখিলে

তাহার সেই প্রার্থনা ; সিদ্ধাচার্য্য দেখিলেও তাহার সেই প্রার্থনা—কেমন করিয়া আবার পরলোকে স্বামীর সহিত গিয়া মিলিব। সে ত এইরূপে কায়মনচিত্তে মৃত স্বামীর সেবায় নিযুক্ত, ওদিকে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

[২]

মায়া বিধবা হওয়ার পর হইতেই কয়েকজন ভিক্ষুণী সর্ব্বদাই তাহার বাড়ী আনাগোনা করিত। তাহাদের কেহ বুড়ী, কেহ আধাবয়সী, কেহ কেহ বা যুবতী ছিল। বুড়ী যিনি, তাঁহার গাল তুবড়াইয়া গিয়াছিল, চক্ষু কোটরগত, মাথাটি প্রায়ই নেড়া, যে দু চারগাছা চুল উঠিত, তাহাও শণের নুড়ীর মত কোঁক্‌ড়া আর পাকা। হাড়গুলি প্রায় গণা যায়. হাতগুলি নলি-নলি, পা সরু সরু, পেটটি কিন্তু গজেন্দ্রের মত নহে, যেন খোলে পড়িয়া আছে। চামড়া প্রায় কুঁচকাইয়া আসিয়াছে। বুড়ী টুক্‌নী হাতে করিয়াই আসিত—মুষ্টিভিক্ষা লইবার জন্য। সে কিন্তু যেখানে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হয় সেখানেই যাইত না, একেবারে যেখানে মায়া আপনার মনের দুঃখে একাকী বসিয়া থাকিত, সেইখানে গিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িত। সে হাড় কখানাতে কিন্তু ধপাস্ শব্দ না হইয়া ঠক্-ঠক্ শব্দই হইত। সে বসিয়াই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িত আর বলিত, "আহা মা, এত কাঁচা বয়সে তোর এ দশা হ'ল, দেখলে পাষাণও গলিয়া যায়। আহা, রক্ত-মাংসের শরীর ত বটে, কেমন ক'রে সারা জীবনটা এইভাবে হাহুতাশ ক'রে কাটবে ? তোর কথা মনে হ'লে, মা, আমি চোখের জল সামলাইতে পারি না।" বলিয়াই বুড়ী আঁচল দিয়া,—আহা, সে কাপড়ের কি আঁচলই আছে ছাই,—আপনার চোখ

দুটি মুছিয়া ফেলিত ; জানাইত, মায়ার দুঃখেই সে কাঁদিতেছে। মায়া কথা কহিত না। তার যে দুঃখ, তা ত আর কথার দুঃখ নয় যে, সে কথা কহিয়া প্রকাশ করিবে। বুড়ী বলিয়া যাইত, "এ অবস্থায় কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম। ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলে অনেকটা ভুলিয়া থাকা যায়, সারবার ত আর নয়, কেবল ভুলে থাকার জন্য। ধর্ম্মকর্ম্ম নানারকম আছে, যেমন—সংসারে থাকিয়াই দানধ্যান কর, পূজা-পার্ব্বণ কর, স্বামীর স্বর্গার্থে শ্রাদ্ধ-তর্পণ কর, ব্রাহ্মণ খাওয়াও, সম্যক্ সংভোজন দাও, সঙ্ঘ-ভোজন করাও, পুকুর খোঁড়াও, রাস্তা বাঁধাও, মন্দির তৈয়ার কর, কত কাজই আছে। তা মা, তোর ধন-দৌলত আছে, তোর তা করিলেই সাজে। কিন্তু আমি বলি মা, এ সবও ত সংসার, এ সবও ত মায়ার বন্ধন, এর চেয়ে সঙ্ঘে যাওয়া ভাল। ভিক্ষুরা কেমন নিশ্চিন্ত থাকিয়া ধর্ম্ম করে। সংসারের টান তাদের একেবারেই নাই। আপনার মনপ্রাণ ভগবানেই সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকে। ভিক্ষুণীরাও ত তাই করে। ভগবান স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, সংসার অসার, সংসারে থাকিয়া মৃত্যুর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, নির্ব্বাণলাভই শ্রেয়ঃ ও তাহাই প্রেয়। তা মা, আমার যদি কথা শোন, সঙ্ঘের আশ্রয় লও। আপনার যা কিছু আছে, সর্ব্বসাধারণকে দান করিয়া নিঃসম্বল, নির্ব্বিকার, নির্ম্মল চিত্তে সঙ্ঘের এক নিভৃত কক্ষে বাস কর; শান্তি পাবে; নির্ব্বাণ আর কিছুই নয়, কেবল শান্তি। দীপ যেমন নির্ব্বাণলাভ করিলে, পৃথিবীতেও থাকে না, অন্তরীক্ষেও থাকে না, কোন দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, কেবল তৈলক্ষয় হেতু শান্ত হইয়া যায়, মানুষও তেমনি নির্ব্বাণ পাইলে পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, কোন দিকেও যায় না, বিদিকেও যায় না, ক্লেশক্ষয় হয় বলিয়া কেবল শান্ত হইয়া থাকে। তা মা, যদি শান্তি চাস্, এ সংসারে আর

তোর কপালে সুখ নাই, এখন সেই শান্তিলাভের জন্য সঙ্ঘের আশ্রয় লও।”

অনেকক্ষণ এইরূপ ঘ্যানর-ঘ্যানর করিয়া বুড়ী উঠিয়া যাইত—মায়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। যাবার সময় বুড়ী বলিত, “দেখ্ মা, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমি ত আর পাঁচ দোরে যেতে পার্‌লাম না, আমার পেট্‌টার মত চারটি চাল আজ তুই দে মা।” মায়া তার টুক্‌নী ভরিয়া চাল দিত, সেও আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইত। বলিয়া যাইত, “সুগতে তোর ভক্তি হউক।”

[৩]

যিনি আধাবয়সী, তিনি আসিয়া বলিতেন, “তোর তো আর ধন-দৌলতের অভাব নাই, ধর্ম্মে মন দে। ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম,—সুগতের ধর্ম্ম; তাহার একটি একটি কথা একটি রাজার ধন। সাত রাজার ধন এক মাণিক—এমন কত মাণিকই যে সুগতের কথায় আছে, তার কি ঠিক আছে? লোকে বলে, সুগত সংসার ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মায়াই ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তুই উপাসিকা, এখনকার লোক কলির লোক, সব ক্ষীণজীবী, এখন কি আর কেউ ভিক্ষু হ'তে পারে, না, ভিক্ষুণী হ'তে পারে? পুরুষ বরং ভিক্ষু হ'তে পারে, তাদের মনের জোর আছে; আমরা অসার মেয়েমানুষ, আমাদের ভিক্ষুণী হওয়া বৃথা। উপাসিকা হ, আপনার ঘরে ব'সে সৎসঙ্গ কর্, কথা দে, কীর্ত্তন দে, তীর্থযাত্রা কর্, ভগবান্ যেখানে যেখানে পদধূলি দিয়া গিয়াছেন, সেই পবিত্র দেবালয়ে গড়াগড়ি দে, মন্দির দে, ধর্ম্মশালা দে, ঔষধশালা দে, আর সিদ্ধপুরুষের সেবা কর্, সিদ্ধাচার্য্যদের সেবা কর্। হয় ত

কোন সিদ্ধপুরুষ তোকে শক্তি করিয়া লইবেন। তুই দেবতা হইয়া যাইবি, ঐ দেখ্, আমড়াতলায় ঘোষেদের মেয়ে নিগি নাঢ়-পণ্ডিতের শক্তি হয়েছে, তাকে এখন সকলে নাঢ়ী বলে। যে নাঢ় পণ্ডিতের পূজা করে, সে নাঢ়ী পণ্ডিতেরও পূজা করে। নাঢ়ীর মন্দির হয়েছে, তার মন্দিরেও দীপ জ্বালে, ধূপ দেয়, তারা সংসারী হয়েও সংসারী নয়, ভিক্ষু হয়েও ভিক্ষু নয়, তারা একেবারে দেবতা হয়ে গিয়েছে।"

এইরূপে হাত নেড়ে নেড়ে মাগী কত কথাই বলিত। মায়া শুনিতও না, অন্যমনস্কে বসিয়া থাকিত। হয় ত শুনিতে শুনিতে অন্য কাজে চলিয়া যাইত। সে কিন্তু বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিত; আবার মায়া আসিলে বক্তৃতা জুড়িয়া দিত। সেও যাবার সময় টুক্‌নী ভরিয়া চাল লইয়া যাইত।

[৪]

এক একদিন সেই যুবতী ভিখারিণী আসিয়া মায়াকে কতমত বুঝাইত, সে খঞ্জনী বাজাইত, গান করিত, নাচিত, "গুরু ভিন্ন গতি নাই। বজ্রগুরু ভেদাভেদ দেখাইয়া দেন। গুরুর উপদেশ অমৃত-রস। যে হাবা, সে তাহা বুঝিতে পারে না, পান করিতে পারে না, সে তৃষ্ণায় মরে, সে তৃষ্ণায় মরে। শাস্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া মরুভূমে তৃষ্ণায় মরে। তুমি গুরু কাড়, গুরুর উপদেশ লও। সংসার সে উপদেশের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তুমি দেখিবে, সব শূন্য, সব করুণা, পাপ নাই, পুণ্য নাই, সব সমান। তখন সমাজের বন্ধন থাকে না। লোকে "ভব আর নির্ব্বাণ" "ভব আর নির্ব্বাণ" করিয়া আপনাকে বদ্ধ করে, কিন্তু গুরুর উপদেশে দেখিতে পাইবে, ভবও নাই, নির্ব্বাণও নাই।

সংসারে যাহা পাপ ও পুণ্য, গুরুর অমৃত উপদেশের পর তাহার কিছুই থাকে না। গুরুর উপদেশের পূর্ব্বে পঞ্চকামোপভোগ বড়ই দোষের। কিন্তু গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চকামোপভোগে দোষ ত নাই-ই, বরং উহা মহাসুখময় সহজধামে লইয়া যায়। গুরুর উপদেশে দেখিবে, সহজ সমস্ত ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছে। 'অহরহ সহজ ফরন্ত।' সহজতরু প্রকাণ্ড তরু; আকাশে আকাশে তাহার ডাল উঠিয়াছে, তাহার ফুল যখন হয়, তখন সব প্রভাস্বরময় হইয়া যায়। আবার যখন সে ফুল ফোটে, তখন ত্রিভুবন মহাসুখে মত্ত হয়। সে গাছের ফল অমৃতফল। সে ফলের নাম পর-উপকার। মায়া, করুণা কর, করুণা কর, পর-উপকার কর। গুরু কাড়, গুরুর কাছে উপদেশ লও, দেখিবে সব শূন্য, সব ফক্কা, আছে কেবল করুণা, আর পর-উপকার। ভগবান্ তোমায় ধর্ম্মে মতি দিন। তুমি সহজ পথের পথিক হও। তোমার সব যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে, তুমি মহাসুখে থাকিবে।" বলিয়াই সে গান ধরিল;—

"ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহে কো পতিআই।
লূই ভণই বট দুলকৃখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা॥
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেঁএ বখাণী॥"

ভাব পদার্থ ত হইতেই পারে না। কোথায় জানিলে, কেমন করিয়া জানিলে, ভাব বলিয়া পদার্থ আছে। ভাবকে পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখ, পিণ্ড নাই, অণু নাই, কিছুরই উপলব্ধি হয় না। অভাব ত নাই-ই। যে অসৎ, সে কেমন করিয়া থাকিবে। এ কথা সহজে কি লোকে

বিশ্বাস করিতে চায়? জ্ঞান আর আনন্দে সুন্দর যে আমাদের গুরু সিদ্ধাচার্য্য লুই, তিনি বলেন, এ সব জ্ঞান বড়ই দুর্লভ। যে সে ইহার ধারণাই করিতে পারে না। কায়, বাক্, চিত্ত কোথায়, কিছুই বুঝা যায় না। যাহার বর্ণনা নাই, চিহ্ন নাই, রূপ নাই, তাহা দিয়া কেমন করিয়া আমি আগম ও বেদ বুঝাইয়া দিব? যেমন জলের ভিতর যে চাঁদ থাকে, সে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু বুঝাইবার যো নাই, তেমনি এ সব কথাও বুঝাইবার যো নাই। করুণাময় গুরু আমাদের বুঝাইতে চান—সব ফাঁকা, সব ফাঁকা, সব ফক্কা। এই ত লোকে 'চিত্ত চিত্ত চিত্ত' করে, কিন্তু চিত্তটাই বা কি? তলাইয়া বুঝিতে গেলে চিত্তই নাই। সুতরাং গুরুর উপদেশ লও, ধ্যান কর, শুধু মহাসুখ—মহাসুখ আর মহাসুখ। শূন্যও মহাসুখ, বিজ্ঞানও মহাসুখ, সবই এক মহাসুখ। মহাসুখই করুণা, মহাসুখই সহজ, আর সকলেরই এক ফল পরউপকার। মায়া, গুরুর শরণ লও, তিনিই তোমায় সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন।"

সেও টুক্‌নী ভরিয়া চাল লইয়া চলিয়া গেল। মায়া মহাভাবনায় পড়িল। সবাই বলে, সঙ্ঘে যাও; সবাই বলে, গুরুর শরণ লও। এ কেন? এরা কি কোন মতলবে ফেরে, না আমায় নিঃস্বার্থ উপদেশ দেয়? সরলা শেষ কথাই ঠিক ধরিয়া লইল। নিঃস্বার্থ উপদেশই ইহারা দিতেছে।

[৫]

মায়া অনেক দিন ধরিয়া ভিখারিণীদের এই গায়ে প'ড়ে উপদেশ দেওয়া সহ্য করিল; কিন্তু ক্রমে তাহার বিরক্তি ধরিতে লাগিল। পরামর্শের মাত্রাও চড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম তিন জন ভিখারিণী

মাত্র আসিত। এখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অনুগ্রহও ঘন ঘন হইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ভিখারী মহাশয়েরাও যোগ দিতে লাগিলেন। মায়া ত কোথাও যাইত না; কেবল মন্দিরে পূজা দিতে, মানত করিতে যাইত; বৌদ্ধ-মন্দিরে গেলে ভিক্ষুরা, পুরোহিতেরা, ভক্তেরা সবাই পরামর্শ দিত। মায়া মহা বিপদে পড়িল; ক্রমে বিহারের কর্ত্তারাও আরম্ভ করিলেন। শেষ মহাবিহারের কর্ত্তা রাজার গুরুপুত্রও মায়াকে একদিন মহাবিহারে পাইয়া নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তখন মায়ার মনে একটা সন্দেহ হইল। কেন এত লোকে এই পরামর্শ দেয়? ইহার ভিতরে কিছু গূঢ় রহস্য আছে। মায়া যতই হউক, বালিকা ত। সমাজবোধ তাহার নাই বলিলেই হয়; কিন্তু সন্দেহ হওয়ার পর তাহার একটু ভয় হইল। "আমি বেণের মেয়ে, আমি ঘরে বসিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণের সেবা করিব। আমি কেন সঙ্ঘে যাইতে যাইব? সঙ্ঘে যে সকল মেয়ে মানুষ যায়, লোকে ত তাহাদের ভাল বলে না। তাহাদের স্বভাব ভাল থাকে কি না সন্দেহ। তাহারা অনেকটা মদ্দা মদ্দা হইয়া যায়। মেয়েদের মত লজ্জাসরম তাহাদের একেবারেই থাকে না। আমি কেন সঙ্ঘে যাইতে যাইব? তবে এত লোকে আমার গায়ে প'ড়ে এ পরামর্শ দেয় কেন?"

যখন সন্দেহটা ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে একদিন তাহার বাবাকে সব কথা ব'লয়া ফেলিল। শুনিয়াই বাবা মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। বিহারী যদিও জামাইএর শোকে কতকটা জবুথবু হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি এখনও একটা দেশব্যাপী ব্যবসা চালাইতেছেন; মেয়ের বিষয়-আশয় সব দেখিতেছেন; মেয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য উঠাইয়া কতকটা আপনার কাজের সামিল করিয়া লইয়াছেন, কতকটা ধনীদের দিয়া দিয়াছেন। মেয়ের স্থাবর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন। মেয়ের ধর্ম্মকর্ম্মে যাহাতে মন হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাহার পূজা-অর্চ্চায় যাহাতে মন যায়, তাহা করিতেছেন। দেবতা-ব্রাহ্মণে যাহাতে ভক্তি হয়. করিতেছেন। কিন্তু সব যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আগের যে আগ্রহ, যে তেজ, যে জোর, সে যেন নাই। তবে কিনা, এ সব চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই এখনও করিতেছেন। দাঁড় বন্ধ করিয়া দিলেও যেমন নৌকা খানিকটা আপনি চলে, তেমনি বিহারীর কাজও বিহারী নিজে দমবন্ধ হইয়া গেলেও যেন কতকটা আপনি চলিতেছে, কলে চলিতেছে। লোকে বিহারীকে ভয় করে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে। সুতরাং বিহারী যে সে বিহারী নাই, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। ভাবিতেছে, শোকে বিহারীর খানিকটা কষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সে যা ছিল, তাই আছে। সুতরাং তাহার কাজ-কর্ম্মের লাভভাবের বড় ক্ষতি আজও হয় নাই।

[৬]

মেয়ের কথা শুনিয়া বিহারীর চমক ভাঙ্গিল। সে মেয়েকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। কে আসে? কে কি বলে? ভিখারিণীরা কোন্ দলের? ভিখারীরা কোন্ দলের? বিহারের কোন্ অধ্যক্ষ কি বলিয়াছেন? গুরুপুত্রের সঙ্গে কয়বার দেখা হইয়াছিল? কোন্‌বারে তিনি কি বলিয়াছেন? সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিহারী গোলা হইতে সাতগাঁয়ে নিজের বাড়ী গেলেন। মেয়ের দরওয়ানদের বলিয়া গেলেন, যেন ভিখারী বা ভিখারিণী বাড়ীর ভিতর যাইতে না পারে। এই ব্যাপারে বিহারীর পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল। আসন্ন বিপদ্ দেখিলে অনেকেরই

উৎসাহ বাড়ে, মনে দৃঢ়তা জন্মে, শরীরে যেন মত্ত হস্তীর বল হয়। বিষাক্ত ঔষধ খাইলে শরীরে যেমন রক্ত সঞ্চালন বেশী হয়, কন্যার এই বিপদে বিহারীরও তাহাই হইল। তাঁহার সব উৎসাহ, সব উদ্যম, সব রোখ, সব ঝোঁক ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করিল না। বাড়ী ফিরিল। বেশীক্ষণ ভাবিল না, চিন্তিল না। আপনার মোকামে মোকামে বিশ্বাসী লোক দিয়া কি খবর লইতে লাগিল। কি খবর, আমরা জানি না, সে অতি গোপন কথা।

তবে আমরা জানি, বিহারী রাউত আশ্রমের বেণে। ছাউনিতে ছাউনিতে মসলা বেচা তাহার পৈতৃক ব্যবসা। বাঙ্গালায় তখন অনেক রাজা। সকলেরই দশ বিশটা ছাউনি। বিহারীর মোকামও সব ছাউনিতে। তার বড় গোলা সাতগাঁয়ের গঙ্গার ধারে। সেখানে সে পাহারা বাড়াইয়া দিল, গোলার পাঁচীল মেরামত করাইল। খাদে যাহাতে জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিল। পশ্চিম হইতে বড় বড় চৌহান, রাঠোর, পাঁওয়ার আনাইয়া সাতগাঁয়েও মোকামে মোকামে দরওয়ান রাখিল এবং তলায় তলায় খবর লইতে লাগিল, ব্যাপারখানা কি? তাহার বেশ ধারণা হইল, মায়াকে সঙ্ঘে লইয়া যাইবার জন্য বৌদ্ধদের ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে; কিন্তু বিহারীর ভয়ে তাহারা আপনাদের মতলব হাঁসিল করিতে পারিতেছে না। তাদের ভিতরেও আবার দলাদলি আছে। মহাযান, বজ্রযান ও সহজিয়া সকল দলেরই চেষ্টা, মায়া তাহাদের দলে আসে; সে জন্যও তাহাদের মতলব হাঁসিল করিতে দেরী হইতেছে। আর মায়া—সে আপনার স্বামী ছাড়া আর কাহারও কথা মনেই স্থান দেয় না। যা কিছু করে—স্বামীর স্বর্গার্থ—পরলোকে স্বামীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহারই জন্য। অন্য কথা সে ভাবে না।

[৭]

মায়া ভয় পাইল কেন? বিহারীই বা ভয় পাইল কেন? কতকগুলি ভিখারী আর ভিখারিণী মায়াকে ভিখারিণী করিয়া সঙ্ঘে লইয়া যাইতে চায়, না গেলেই হইল। তাতে আবার ভয় কি? আর এত উদ্যোগই বা কেন? বিহারী যেন লড়াইএর জন্য প্রস্তুত—এ সব কেন? ইহার কারণ কি? হিন্দুরা যখন কেহ সন্ন্যাসী হয় তখন লোকে মনে করে, সে মরিয়াছে, সে মরিলে তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা দখল করে। সে যদি ফিরিয়া আসে, তাহার সমাজে স্থান হয় না; সুতরাং সে বিষয়ও ফিরিয়া পায় না। কিন্তু বৌদ্ধদের তাহা হয় না। যে ভিখারী বা ভিখারিণী হয়, সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার-স্বত্বাদি লইয়া সঙ্ঘে যায়। সঙ্ঘ তাহার সমস্ত বিষয় সাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত করে। এইজন্য তাহারা হিন্দুর সন্ন্যাসকে সন্ন্যাস বলিয়াই মনে করে না। বলে, ওটা উত্তরাধিকারীদের বিষয় দিবার ফন্দী মাত্র। আমি যদি সন্ন্যাস লইলাম, সাধারণের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করিলাম। আমার সম্পত্তি গৃহস্থেরা লইবে কেন? সে ত সর্ব্বসাধারণে লইবে। তা এখন যদি মায়াকে সঙ্ঘে টানিতে পারে, মায়ার স্বামীর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্ঘে ত যাইবেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিহারীর উত্তরাধিকারও সঙ্ঘে যাইবে; সুতরাং ধনীদের আর দত্তদের দুটা বড় বড় বিষয়ই সঙ্ঘে যাইবে। তাই, সব দলের ভিখারী ভিখারিণীরাই লাগিয়াছে মায়াকে সঙ্ঘে লইবার জন্য। যার দলে মায়া যাইবে, তাদেরই জয়-জয়কার হইবে। বিহারী সে কথা বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহার এত ভয়, এত উদ্যোগ। বিশেষ সাতগাঁয়ে এখন বৌদ্ধ রাজা। রাজাও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিবেন না, রাজার সঙ্ঘে উহাকে লইবার জন্য তিনিও যে চেষ্টা

করিবেন না, সে কথা কে বলিতে পারে ? তাই বিহারীর যুদ্ধের উদ্যোগ। বিহারী ইচ্ছা করিয়া এত বড় দুটা সম্পত্তি ভিখারীদের দিতে রাজী নহেন ; সুতরাং তাঁহার এত ভয় এবং এত উদ্যোগ ; কিন্তু বিহারী প্রকাশ্যভাবে কোন উদ্যোগ করিতে পারেন না, পাছে তাঁহাকে রাজার কোপে পড়িতে হয়। ভিখারীরাও বিহারীকে ভয় করে, কারণ তখনকার ছোট ছোট রাজাদের চেয়ে বেণেরা যে কম ছিল, তাহা নহে। কারণ, বেণেদের কারবার সকল রাজার দেশেই ছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে এক রাজার দেশ হইতে অনায়াসে অন্য রাজার দেশে চলিয়া যাইতে পারিত এবং গেলে যে দেশ হইতে যাইত, তাহার বিশেষ ক্ষতি হইত। ইচ্ছা করিলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিত। তাহারা বড় কম ছিল না। তাই সাতগাঁয়ের রাজা বা ভিখারীর দল প্রকাশ্যে বিহারীর মেয়ের উপর জোর-জবরদস্তী করে নাই, বা করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহারা চেষ্টা করিতেছিল যে, যদি মায়াকে লওয়াইয়া সঙ্ঘে ঢুকাইতে পারে, তাদের মতলব হাঁসিল অতি সহজেই হইয়া যাইবে। তাই ভিখারিণীরা এত ঘন ঘন মায়ার কাছে যাইত। মায়া নিজে যদি যায়, তবে বিহারীর আর বলিবার কোনও কথা থাকে না ; অথচ বৌদ্ধেরা এত বড় দুটা বিষয় অধিকার করিতে পারে। তখনকার সঙ্ঘে ব্যবসা-বাণিজ্যও করিত। ভিক্ষুরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও ধন উপার্জ্জন করিয়া কতক নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, কতক বা সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য খরচ করিত ; সুতরাং তাহারা যে শুদ্ধ স্থাবর আর অস্থাবর বিষয়ই চাহিত, তাহা নহে, ব্যবসা-বাণিজ্যও হাত করিতে চেষ্টা করিত। বৌদ্ধেরা বুঝিয়াছিল, এটা তাহাদের মাহেন্দ্রক্ষণ। তাদের ভিতর ভিতর খুব উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[১]

ভুরসুট নগর দামোদরের একটা শাখার উপর। জায়গাটি একেবারে সমতল, ঠিক যেন দর্পণের মত। ঠিক মধ্যস্থলে একটি গড়। গড়ের ভিতর ৬০ বিঘা জমি। গড়ে গভীর জল। দামোদরের সঙ্গে সংযোগ থাকায় বর্ষার সময় এত জল পুরিয়া রাখা হইত যে, সব সময়েই খাইয়ে জল থাকিত। গড়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বাস নিষেধ। গড়ের মধ্যে লাঙ্গল চালান নিষেধ। অন্য জাতির লোকের হাঁড়ী চড়ান নিষেধ। কাজের জন্য বিদেশ থেকে অন্য জাতির লোক এলে, তাহাদের হয় ব্রাহ্মণবাড়ী প্রসাদ পাইতে হইবে, না হয়, গড়ের বাহিরে গিয়া রাঁধিয়া খাইতে হইবে। গড়ের ভিতর বাড়ী-ঘর-দোর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাগানগুলিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, এখানকার মেয়ে ও পুরুষ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্যই জন্মিয়াছিল। তাহাদের যেন অন্য কাজ নাই, অন্য চিন্তা নাই। বাড়ীগুলি সবই চালা। কেবল মন্দিরগুলিই পাকা, একেবারে চূণ, সুরকী, ইট ও পাথরে তৈয়ারী। সব বাড়ীতেই একটি না একটি মন্দির আছে। সকলের চেয়ে বড় মন্দিরটির নয়টি চূড়া—"নবরত্ন" বলে। মন্দিরটির সর্ব্বত্র ইট ও পাথরের উপর নক্সা কাটা। দরজার দুপাশে দুটি সাপ আঁকা—আঁকাবাঁকা হইয়া উঠিয়াছে, আর দরজার ঠিক মাঝখানে মাথার উপর দুইটি ফণা মিলিয়া আছে। এই সর্প মুখোমুখী করিয়া রাখার নাম কুলকুণ্ডলিনী। দরজার উপরে যে কার্ণিস আছে, তাহাতে দুইটা হাঙ্গর আঁকা। হাঙ্গর দুইটা

লেজ জড়াইয়া দুই দিকে মুখ করিয়া আছে। মন্দিরে রোজ পূজা হয়, দেবীর নাম ভবানী।

ঐ মন্দিরের সম্মুখে খানিক দূরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ। দেখিলে বোধ হয়, কোন সম্পন্ন লোকের বাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপটির উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক্ মাটীর দেওয়াল দিয়া ঘেরা—বড় বড় পাট; নয় দশ পাট উঠিয়া পাট শেষ হইয়া গিয়াছে। মাটীর দেওয়ালের উপর খুব যত্ন করিয়া খড়িটা করা। তুঁষ, পাটের কুচা, আর কাদা খুব মিহি করিয়া ছানিয়া তাই দু আঙ্গুল পুরু করিয়া দেওয়ালের উপর বসান, আর বেশ করিয়া পিটিয়া দেওয়া। খড়িটী করা দেওয়ালের উপর রোজ আগাগোড়া নিকান হয়—দেখিতে তক্-তক্ করে। চণ্ডীমণ্ডপটি দক্ষিণদিকেও দুই ধারে দুই হাত করিয়া দেওয়াল দেওয়া। মাঝে যেটুকু ফাঁক, সেটুকুতে দুইটা মোটা মোটা শালের খুঁটি, তাহার উপর বিচিত্র কাজ করা। কাঠের উপর নক্সা করিতে ভুরস্থটের লোক সিদ্ধহস্ত ছিল। খুঁটি দুটির উপর দুইখানি আড়া, আর দক্ষিণের দেওয়াল দুটির উপর দুই খানি আড়া, এই চারি আড়ার উপর চারিখানি প্রকাণ্ড চালা। আড়ার শাল কাঠেও কাজ করা। আড়ার উপর তীর, তার উপর আবার আড়া, তাহার উপর মাঝখানে একটা তীরের উপর মাথালির বাঁশ। চণ্ডী-মণ্ডপের সাম্‌নে, বারান্দার দক্ষিণদিকে সব শালের খুঁটি, পূব-পশ্চিম সব খোলা। বারান্দার পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকের শেষে দুটি মাটীর তাকিয়া করিয়া দেওয়া আছে। কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাতে হেলান দিয়া বসিতে পারেন। চালগুলি পরিষ্কার করিয়া শণের স্থতালি দিয়া ছিটান। রোয়াগুলি নানারূপ রংকরা। আর সলাগুলিও বেশ মাজা-ঘসা ও রংকরা।

ভোর হইল। একজন চাকর আসিল, সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপ বেশ করিয়া

নিকাইয়া দিল, তাহার পর ঝাড়ু দিল, তাহার পর কয়েকটি বালান্দা পরগণার মাদুর বিছাইল, মাদুরের উপর একখানি সতরঞ্চ বিছাইল, সতরঞ্চের উপর একখানি গালিচা বিছাইল, গালিচার মাঝখানে একখানি পিতলের কোণ-লাগান পিঁড়ি কাৎ করিয়া দিল, আর তাহার নীচে উৎকৃষ্ট রেশমের ছোট একখানি গদী পাতিল, সেইখানে কতকগুলি খুব মিহি মাজা ও পাকান তালপাতা, একটি দোয়াত ও কলম রাখিল ও সেখান হইতে চলিয়া গেল।

[২]

কিছুক্ষণ পরে ভবানীর মন্দির হইতে একজন সুপুরুষ বাহির হইলেন। তাঁহার দেহ বেশ দীর্ঘচ্ছন্দ। রঙটি দুধে আল্‌তার মত। মুখটি প্রসন্ন, তিলফুলের মত নাকটি, চোখ দুটি পটলচেরা, কপালে চন্দনের তিলক। অস্ফুট-স্বরে ভবানীর স্তব পাঠ করিতে করিতে মন্দির হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পায়ে কাষ্ঠপাদুকা ঠক্‌-ঠক্‌ শব্দ করিতেছে। বারান্দায় কাষ্ঠপাদুকা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গালিচার উপর দিয়া সেই ছোট রেশমের গদীটিতে বসিলেন এবং পিঁড়িখানিতে ঠেসান দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়াই যেন চারিদিক্‌ হইতে লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দা ভরিয়া গেল। সর্ব্বপ্রথমে আসিলেন এক গৌরকান্তি পাত্‌লা ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পৈতার খুব বাহার। সরু পৈতা, অনেক দণ্ডী, নিরন্তর পরিষ্কার করায় ধপ্‌-ধপ্‌ করিতেছে, আর রোজ জীবলী আটা দিয়া মাজায় চক্‌চক্‌ করিতেছে। ইনি আসিয়াই বারান্দা হইতে গালিচায় উঠিলেন, আর একেবারে গদীর কাছে গিয়া বসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই গদীর উপরিস্থিত ব্রাহ্মণটি বলিলেন, "কি শ্রীধর, আজ তুমি যে সকলের আগে ?" শ্রীধর বলিলেন, "পাণ্ডু কাকা, কয়দিন ধরিয়া আমাদের কণাদ-সূত্রের সঙ্গে প্রশস্ত-পাদের ভাষ্য মিলাইতেছিলাম। একটা আশ্চর্য্য দেখিলাম, তাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।" পাণ্ডু-কাকা বলিলেন, "কি বল দেখি, তুমি নহিলে এত খাটে কে কাকা ?" শ্রীধর বলিলেন, "৫২টি সূত্রের নামও ভাষ্যকার করেন নাই।"

পাণ্ডু। এ ত বড় চমৎকার! ভাষ্যকারেরা ত প্রায়ই সূত্র ধরিয়াই ভাষ্য করেন। প্রশস্তপাদ তাহা করেন নাই। তিনি যেন নিজের মতলবমত ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সূত্র তুলিয়াছেন। কখন্ যে কোন্ সূত্র তুলিবেন, বুঝা যায় না। তাই আমি ভাবিতাম যে, কেহ যদি মিলাইয়া দেখে, কোন্ কোন্ সূত্র তোলা আছে, তা হ'লে বড় ভাল হয়। তা তুমি বাবা মিলাইয়া দেখিয়াছ। বল দেখি কি রকম ?

শ্রীধর। আমি ভাষ্যে যত সূত্র পাইলাম, সূত্রপাঠে সেগুলি সব দাগ দিলাম; দেখিলাম, ৫২টি সূত্র তিনি একেবারেই ধরেন নাই!

পাণ্ডু। বল কি ? বাহান্নটা ?

শ্রীধর। আজ্ঞা হাঁ।

পাণ্ডু। তবে কি প্রশস্তপাদ কণাদ-সূত্রের টীকা করেন নাই ?

শ্রীধর। তা কেমন করিয়া বলিব ? যেগুলি ধরিয়াছেন, সবই ত সূত্রপাঠে আছে।

পাণ্ডু। আচ্ছা, তবে কি নানা রকমের কণাদ-সূত্র আছে না কি ? বৌদ্ধদের কাছে শুনিয়াছি, তাহাদের বৈশেষিক নাকি দশপদার্থী—

শ্রীধর। দশপদার্থী!! সেও ত নূতন কথা। এ সকল ব্যাপারে প্রবেশ করাই কঠিন।

পাণ্ডু। তা বাবা, দেখ ত, কে একটা লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে।

শ্রীধর। সত্যিও ত। এ ত আমাদের দেশের লোক নয়। কাপড়-চোপড় দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন রাজপুত।

[৩]

লোকটা ভবানী-মন্দিরের নিকটেই ঘোড়া হইতে নামিল, ভবানী-মন্দির প্রদক্ষিণ করিল, মন্দিরের সম্মুখের সিঁড়িতে ভবানীর উদ্দেশে নমস্কার করিল, তাহার পর সটান চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় উঠিল। সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার পথ ছাড়িয়া দিল। বারান্দার মেঝে হইতে মণ্ডপের মেঝে একটু উঁচা। রাজপুত সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল ও কোমরপাটা হইতে একখানি চিঠি লইয়া হাত বাড়াইয়া দিল। শ্রীধর চিঠিখানি তাহার হাত হইতে লইয়া পাণ্ডু কাকার হাতে দিলেন। পাণ্ডু কাকা চিঠিখানি হাতে লইয়া মন দিয়া মোহরটি পড়িলেন। বলিলেন, "বা! এ ত বিহারী দত্তের মোহর দেখিতেছি।" তাহার পর তিনি মোহর ভাঙ্গিলেন, জড়ান তালপত্র খুলিলেন ও আসল পত্র বাহির করিলেন—পড়িলেন; একবার পড়িলেন, দুইবার পড়িলেন, তিনবার পড়িলেন। তাহার পর পত্রখানি শ্রীধরের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়, দেখ, অদ্ভুত ব্যাপার!"

শ্রীধর পড়িতে লাগিলেন, আর পাণ্ডুদাস রাজপুতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, "তুমি কোন্ দেশের লোক?"

রাজপুত। হমি কনৌজয়া পাড়িহার রাজপুত হোঁ।

"এখানে কোথায় থাক?"

"ভুরস্থটমে বিহারী দত্ত বাণিয়াকা মোকাম মে।"

"ভুরস্থটে বিহারী দত্তের মোকামে থাক? তোমায় আমার কাছে কে পাঠাইয়াছে?"

"মোকামদার ত্রিভুবন।"

"এ চিঠি কে লিখেছে?"

"মোকামদারণে লিখা, লেকিন হুকুমসে লিখা।"

"এ ত মোকামদারের পত্র নহে, এ যে সাক্ষাৎ বিহারীর হাতের লেখা।"

"সো মৈঁ নহি জান্তা।"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীধর বলিলেন, "ব্যাপারখানা বুঝিয়াছেন কি? বিহারী দত্ত ব্রাহ্মণপন্থী হইতে চায়, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের উচিত তা'কে সাহায্য করা। সে গন্ধবেণেদের চাঁই, সে এদিকে এলে ঐ জাতটা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছেড়ে দেবে। আমাদের দল পুরু হবে।"

"হঠাৎ কেন এমন হলো বল দেখি?"

"তা বল্‌তে পারি না।"

"তবে কেমন করিয়া জানিলে, সে ব্রাহ্মণপন্থী হ'তে চায়?"

"দেখ্‌লেন না, সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে তা'দের স্থান কোথায়?"

"এ কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কেন?"

"বাগ্‌দী রাজা গোল বাধাইয়াছে, অথবা বৌদ্ধদের সঙ্গে তাহার ঝগড়া হইয়াছে।"

"বেশ ত, তা যদি হয়, তাকে এই দিকে আন।"

"কিন্তু হঠাৎ জবাব দেওয়া উচিত নয়; সব খবর না জেনে

যদি একটা জবাব দেওয়া হয়, পরে তাহার জন্য কার্য্য নষ্ট হইতে পারে।”

“তবে এক কাজ কর, তাহাকে বল যে, এত বড় একটা কাজে আমি হঠাৎ জবাব দিতে পারি না। তুমি সিদ্ধল গ্রামের ভবদেব উপাধ্যায়, বাঁড়ুড়ী গ্রামের বাচস্পতি মিশ্র, মুখুটী গ্রামের রামধন, আর কাঞ্জিবিল্বী ধনুর্দ্ধর, আর মহিন্তা মাধবাচার্য্য এই কয়জনকে একত্র কর, আমার এখান হইতেও দুই একজনকে লও। ইহারা সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা বলিয়া দিবে, তাহার উপর কথা কহিবার লোক থাকিবে না। ভবদেব হরিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। বাচস্পতি মিশ্র স্বনামধন্য ব্যক্তি, তিনি ভবদেবের প্রশস্তি লিখিয়াছেন। আর মহিন্তা মাধবাচার্য্য ‘রাঢ়দ্বয়ে দণ্ডধৃক্!’ তাহার পর সময় পাইয়া সব খবর লইয়া ‘ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে’।” এইরূপ স্থির হইলে পাণ্ডুদাস কায়স্থকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই মর্ম্মে বিহারীকে পত্র লিখিতে বলিলেন এবং পড়িহার রাজপুতকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। তখন অন্যান্য লোকের কথা শুনিতে লাগিলেন।

[৪]

কত লোকের কত প্রকার মামলাই হইতে লাগিল। একটা চোরের শাস্তি হইল। দেনার দায়ে একজনকে কয়েদ করা হইল। তাহার আত্মীয়েরা দেনা শোধ করিয়া দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া হইয়া গেল। বাগ্দানের পর বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া একজন বলিল, “ও মেয়ের জাতিগত দোষ আছে।” দোষ প্রমাণ না হওয়ায় তাহার বিবাহ স্থির করিয়া দেওয়া হইল। একজনকে অপালনকৃত গোবধের

প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হইল। ব্যবসায়ার্থ ম্লেচ্ছদেশগমনের জন্য বৈধ গঙ্গা-স্নানের ব্যবস্থা করা হইল। একজন ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধমঠে আশ্রয় লইয়া তিন রাত্রি বাস করার জন্য জাতিচ্যুত করা হইল। বৌদ্ধ পণ্ডিতের কাছে রূপাবতার ব্যাকরণ পড়ার জন্য একজন ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হইল; বলিয়া দেওয়া হইল, অনুকল্প গোদান বা কড়িদান করিলে হইবে না; তাহাকে প্রত্যহ এক এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যার দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যহ এক এক গ্রাস বাড়াইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণমাত্রায় পনর গ্রাস আহার করিলে সে নিষ্পাপ হইবে। গড়ভবানীপুরের একজন বেণে অগুরুচন্দন বলিয়া অন্য কাঠ বেচায় তাহার দশগুণ দণ্ড দেওয়া হইল। যাহার কাজ হইয়া যাইতেছে, সে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কত যে এল, আর কত যে গেল, তাহার ঠিকানা নাই। এমন সময়ে বসন্তপুরের রমাই আর তাহার ছেলে নবাই মহাকোলাহল করিতে করিতে পাণ্ডু-দাসের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই গালিচার গদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। ছেলে বসিল ডান পাশে ও বাপ বাম পাশে।

ছেলে নবাই অমনি বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌লে ত বাবা, পাণ্ডুকাকার কাছে অবিচার হওয়ার যো নাই। আমায় দিলেন ডাইনে বসিতে, আর তোমায় বামে। তবেই বুঝা গেল, উনি কাহাকে বড় বলেন।"

বাপ বলিলেন, "বটে,—তাই বুঝি, তুই ডাইনে গিয়ে আপনি বসিলি, আমি তোর কাছে না বসিয়া বামে বসিলাম। তাতে আবার ছোট বড় কি রে? যে বাপের চেয়ে বড় হ'তে চায়, তার মত ছোট আর কে আছে? শাস্ত্র বলে,-'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ'—তুই কিনা সেই বাপের চেয়ে বড় হতে চাস?"

"দেখ বাবা, তুমি যে আমার বাপ, তা ত আমি অস্বীকার করি না, তুমি যে পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্, তোমার যে আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণের আটগুণ আছে, তাহা আমার চেয়ে আর কে জানে ? তোমার প্রতি পিতৃভক্তির কোনও অভাব কোনও দিনও আমার দেখিয়াছ কি ? তবে কিনা, যেটা সত্য, সেটা বলিতেই হইবে। তোমার পিতা আবৃত্তিটা করেন নাই,—পাল্টী ঘরে বিবাহ করেন নাই। তোমার মা ছোট বামনের মেয়ে ছিলেন, আর আমার মা যাঁর কন্যা, তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলমেরু, লোকে কুলাচল বলে, তিনি একেবারে কুলমেরু। আমার মাতামহের নাম করিলে মুখ উজ্জ্বল। আর তোমার মাতামহ ? তাঁর নাম কে জানে ? যেও বা জানে, সেও বলিবে 'বামন তত ভাল নয়'।"

এইরূপে দুই জনে পাণ্ডুকাকার পার্শ্বে বসিয়াই ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডুকাকা বলিলেন, "বলি, ব্যাপারটা কি ? এত দিন না তত দিন—বাপব্যাটায় আজ জাতি লইয়া ঝগড়া কেন ?"

বাপ। কেন জান ? রাম শেঠের বাড়ীতে তার বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সভা হয়, সভায় আমরা দু'জনেই উপস্থিত ছিলাম। মালা-চন্দনের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা আমার গলায় মালা দিতে আসিল। হতভাগা ছেলে আপত্তি করিয়া বলিল, "আমি থাকিতে বাবার গলায় মালা দিলে আমার মাতামহের অপমান করা হয়।"

ছেলে। হয় না কাকা ? সে অপমান করা কি উঁহার উচিত ? তিনিও ত উঁহারই শ্বশুর। বয়স হয়েছে কি না, তাই শ্বশুরের অপমানটা দেখিতেই পান না।

পাণ্ডু কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ রাম শেঠ করিল কি ?"

বাপ বলিলেন, "সে আর কি করিবে, বাপ রেখে ছেলের গলায় মালা দিবে ?"

ছেলে বলিলেন, "সে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে আমার গলায় ছুঁইয়ে বাবার গলায় মালা দিলে। কিন্তু কাকা, এ রকমটা আর যাতে না হয়, আপনি করিয়া দিন, আমরা বিচারপ্রার্থী। আমার মাতামহের যদি এইরূপ অপমান হয়, আমি আর এ দেশে থাকিব না, মাতামহের দেশে গিয়া বাস করিব।"

পাণ্ডুদাস বলিলেন, "আমি ইহার কি বিচার করিব? ইহার বিচার তোমার মার হাতে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।"

ছেলে বলিল, "কাকা, আপনিও এই কথা বলিলেন? তাহা হইলে আমার দেশত্যাগই শ্রেয়ঃ, কেন না, শাস্ত্রে বলে, 'দেশত্যাগেন দুর্জ্জনঃ'?"

পাণ্ডুদাস এইবার পথ পাইলেন; বলিলেন, "দেখ নবাই, তোমার বাবাকে বড়ই শ্রদ্ধা করি, উঁহাকে দাদার মত দেখি, তাই এবার তোমায় মাপ করিলাম; নহিলে ভূরসুটের অধিপতি পাণ্ডুদাসকে মুখের উপর দুর্জ্জন বলিয়া গালি দিয়া পার পায়, এমন লোক এ দেশে নাই। যাইতে হয় তুমি যাও, তাহাতে ভূরসুটের কোনও ক্ষতি হইবে না।"

নবাই তখন বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বলিতেছি,—আমি কি আপনাকে বলিতেছি?"

পাণ্ডুদাস বলিলেন, "আমায় যদি না বলিতেছ, তবে তোমার বাপকে বলিতেছ, বড় পৌরুষই প্রকাশ করিতেছ!"

নবাই গজ-গজ করিতে করিতে উঠিল। এমন সময়ে কায়স্থ বিহারী দত্তের পত্রের জবাব লইয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডুদাস চিঠি পড়িলেন; শ্রীধরকে দেখিতে দিলেন। তিনি দেখিয়া একটু হাসিলেন। পাণ্ডুদাস স্বাক্ষর করিয়া দিলেন এবং পড়িহার রাজপুতকে ডাকাইলেন। সে পত্র লইয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[১]

ভুরস্থট গ্রামের নামে রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঁঞী হইয়াছিল। রাঢ়ীয় শ্রেণীর পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রে শুভ নামে এক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণরাঢ়ের রাজা ভূরিসৃষ্টিকা বা ভুরিশ্রেষ্ঠিক গ্রাম দান করেন। তাহা হইতেই ভুরিগ্রামী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বল্লাল হইতে ভুরিগ্রামীর প্রাধান্য লোপ হইয়াছে। বল্লালের পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণেরা বড়ই পণ্ডিত ও বড়ই দাম্ভিক ছিলেন। একজন ভুরস্থটের ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন "আমি একদিন ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আপন উরুদেশ গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া তাহার উপর আপন উত্তরীয় বিছাইয়া আমায় সেখানে বসিতে দিলেন।" যেমন ভুরস্থট হইতে ভুরিগ্রামীর উৎপত্তি, তেমনি সিদ্ধল বা সিধ্‌লা গ্রাম হইতে সিদ্ধলগ্রামীর উৎপত্তি। সিদ্ধলগ্রামীরা, যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বড়ই প্রবল। ঐ গ্রামের ভবদেব ভট্ট হরিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী। সিদ্ধল গাঁখানা সাতগাঁ রাজ্যের সীমার বাহিরে রাঢ় দেশের মধ্যে। দেশটি অতি পবিত্র। তবে রাঢ়দেশে বড় বড় মাঠ; ছোট ছোট গ্রাম। মাটী এঁটেলা, বর্ষায় চলা-ফেরা বন্ধ। গ্রীষ্মে রৌদ্র নিবারণের জন্য বড় বড় অশ্বত্থ গাছ ও বড় বড় বট গাছ মাঠের মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সাতগাঁয়ের সীমানা ছাড়াইলেই এই সমস্ত দেখা যাইত। সব গ্রামেই বড় বড় পুষ্করিণী আর বড় বড় বাগান, আম কাঁঠালের গাছ, মাঠের মাঝেও বড়

ছেলে ক সেকালের লোক পুষ্করিণী ও বাগান প্রতিষ্ঠা বড় পুণ্যকর্ম্ম বাবার ন করিত। তাহাদের মধ্যে আবার ভবদেব ভট্ট একটু আ। তিনি সিদ্ধল গ্রামের চারিদিকে ১০।১২ ক্রোশ ধরিয়া ত গ্রাম ছিল, সর্ব্বত্রই পুকুর ও বাগান দিয়াছিলেন। সিদ্ধল গ্রামের চারিদিকটাই একটা বড় বাগানের মত হইয়াছিল। রাঢ়দেশ বলিয়াই বোধ হইত না। তাহারই ঠিক মাঝখানে সিদ্ধল গ্রাম, কেবল ব্রাহ্মণের বাস। এই ব্রাহ্মণেরা সাবর্ণ গোত্র। এই গোত্রের ব্রাহ্মণেরা শত শত গ্রাম পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সিদ্ধলই সকলের চেয়ে বড় গ্রাম। এই গ্রামের যিনি গ্রামীন, তাঁহার উপরই গ্রাম শাসনের ভার। পাণ্ডুদাস যেমন ভুরসুটের অধিপতি বা গ্রামীন, এখানেও একজন সেইরূপ গ্রামীন ছিলেন। কিন্তু ভবদেব ভট্ট সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার যেমন পদমর্য্যাদা, যেমন অগাধ বিদ্যা, তেমনি তিনি সজ্জন, তেমনি তিনি দাতা, তেমনি তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। যে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নি অগ্নিশালায় সর্ব্বদাই জ্বলিত। তিনি তাহা নিভিতে দিতেন না। হয় নিজে, না হয় প্রতিনিধি দ্বারা প্রত্যহ সায়ং-প্রাতে হোম করাইতেন; অমাবস্যায় দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে পৌর্ণমাস যাগ করাইতেন। এ সকল কিন্তু শ্রৌত-যাগ নহে, এ সকল স্মার্ত্ত-যাগ। ইহাতে তিন অগ্নির দরকার হইত না। আর আর অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়ীতে ঢের হইত।

সম্প্রতি তিনি কলিঙ্গের রাজধানী তোষলি নগরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটে অনন্ত বাসুদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাহারই পাশে বিন্দুসরোবর নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুষ্করিণীর ঠিক মাঝখানে নারায়ণের বাসার্থ একটি দ্বীপের উপর একটি মন্দিরও করিয়াছেন। এই সকল

কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনেক দিন একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজা দেশটা দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার শাসন করাও তাঁহার আর এক কাজ ছিল। তিনি সেই সকল কাজ সারিয়া সম্প্রতি কিছুদিন বিশ্রাম করিবার জন্য সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতেছেন, আর কয়েকজন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সঙ্গে বসিয়া স্মৃতিপুস্তক ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতিরচনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নিজের যে রাজ্য বালবলভী বা বাগড়ী, তাহা প্রতিনিধি দ্বারা শাসন করাইতেছেন। ঐ রাজত্বটি গঙ্গা ও পদ্মার মাঝখানে, উহার আকার 'ব'কারের মত, উহার দক্ষিণদিক্‌টা প্রায়ই জঙ্গল—সুন্দরবন। উত্তরদিক্‌টায় কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মানুষের বসবাস হইয়াছে। হরিবর্ম্মদেব ঐ দেশ জয় করিয়া আপন প্রিয় সচিব ভবদেব ভট্টকে শাসন করিতে দিয়াছেন। এই ব্যাপার হইতে ভবদেবের উপাধি হইয়াছে "বাল-বলভী-ভুজঙ্গ" অথবা বাগড়ীর রাজা।

[২]

ভবদেব যখন সিদ্ধল গ্রামে থাকিতেন, তখন তিনি অন্দরেও থাকিতেন না, বাহিরেও থাকিতেন না। ইহার মাঝখানে একটা ঘেরা জায়গার ভিতরে, তাঁহার এক অগ্নিশালা ছিল, সেইখানে তিনি বসিতেন। সে এক প্রকাণ্ড ঘর। সেই ঘরের একপাশে একটু আল দিয়া আগুন রাখা হইত। ইহারই নাম স্মার্ত্ত-অগ্নি। তিনি এই অগ্নি নিভিতে দিতেন না। আলের বাহিরে প্রকাণ্ড গালিচা পাতিয়া ও চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া তিনি নিজে বসিতেন ও পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করিতেন। গালিচার বাহিরে থাকিত রাশীকৃত তালপাতা। তালগাছের মাজ-পাতা কাটিয়া ছয়মাস পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহার

নাম 'পাকান'। পরে এই পাতা দুধে সিদ্ধ করা হইত, শাঁখ দিয়া ডলা হইত, তাহার পর কাঠী বাদ দিয়া পাতাগুলিকে সমান করিয়া কাটা হইত, তাহার পর তালপাতার আড়-দীর্ঘ্ বুঝিয়া কোনটির ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র করা হইত; ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু পাকান দড়ী চালাইয়া দেওয়া হইত, সেই দড়ীতে তালপাতাগুলি বাঁধা হইত। যদি পাতাগুলি লম্বায় বেশী হইত, তবে দুই জায়গায় দুইটি ছিদ্র করা হইত, আরও বেশী লম্বা হইলে তিনটি ছিদ্র করা হইত। পুস্তকবিশেষে ঠিক মাঝখানে ছিদ্র না করিয়া একটু বামের দিকে ছিদ্র করা হইত। বৌদ্ধেরা প্রায়ই বামের দিকে ছিদ্র করিত। পুঁথি লেখা হইলে, পাঠের পুঁথির দড়ীতে একটি তালপাতের ময়ূর লাগাইয়া রাখা হইত। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হইলে, ময়ূরটি পাতায় দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হইত, নতুবা কোথায় থাকিল, ঠিকানা পাইবে কিরূপে? গালিচার নিকটে মাটীর দোয়াতে কালী, তাহাতে ন্যাক্ড়া দেওয়া। দোয়াতটি একটি কাঠের ফ্রেমে আঁটা। ফ্রেমটি হাতখানেক লম্বা। যতটুকুতে দোয়াত আছে, তাহার বাহিরে কলম রাখিবার জায়গা। কলম অনেকগুলি;—কোনটি কঞ্চির, কোনটি বাকারীর, কোনটি শরের, কোনটি অস্থির, কোনটি কলমীডগার। সবগুলিই বেশ করিয়া পাকান, আর সরু করিয়া কাটা। লিখিতে লিখিতে কলমের মোচ খারাপ হইয়া গেলে, তাহাকে ফের কাটিয়া লইবার জন্য, একখানি ইস্পাতের ছুরীও কলমদানীতে থাকে। দোয়াতদান ও কলমদানের পাশে বালীদান। তাহাতে খুব সরু মিহি বালী থাকিত। সেকালে এই বালীতেই ব্লটিঙের কাজ হইত। ভবদেব অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার সহকারী পণ্ডিতেরা লিখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপত্তি তুলিয়া বিচার করিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আজ ভবদেব সামান্য-বহ্নিস্থাপনের পদ্ধতি লিখিতেছেন—বালী ঢালিয়া, বালীটাকে চৌকোণা করিয়া, একুশ আঙ্গুল বার আঙ্গুল কুশ দিয়া রেখা টানিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; মাঝে মাঝে অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বালী লইয়া উৎকর প্রক্ষেপের ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময়ে অগ্নিশালার দরজায় যে দরোয়ান দাঁড়াইয়াছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত কার্য্যার্থী।" পাছে ভবদেব দরোয়ানের কথা শুনিতে না পান, তাই একজন সিদ্ধল ব্রাহ্মণ গালিচার উপরে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল,—"খুড়ামহাশয়, শুনিয়াছেন—সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত কার্য্যার্থী।"

ভবদেব। বিহারী দত্ত—নিজেই আসিয়াছে?

ব্রাহ্মণ। হাঁ।

ভবদেব। বোধ হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুবিধা করিয়া লইবে, তা'র জন্যই এসেছে। (খানিক ভাবিয়া) "নাঃ—তা হ'লে নিজে আসিবে কেন?—তুমি বলিতে পার, তাহার সহিত কয়জন লোক আসিয়াছে?"

"পাঁচটি ডুলিবেহারা, তিনটী চাকর।"

"এই আটটি মাত্র লোকের সঙ্গে বিহারী দত্ত এসেছে! ব্যাপার গুরুতর দেখিতেছি। আচ্ছা, তাঁহাকে বেণেদের অতিথিশালায় লইয়া যাও। তাঁহাকে বলিয়া দাও, অদ্য অপরাহ্নে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।"

ভবদেব ঠাকুর সেদিনকার মত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিতেরাও উঠিলেন। যে ব্রাহ্মণ বিহারীর সংবাদ আনিয়াছিল, সে বিহারীকে লইয়া, বেনেদের অতিথিশালায় লইয়া চলিল। বিহারীর ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে আতিথ্যস্বীকার বোধ হয় এই প্রথম। সে অতিথিশালায় গিয়া দেখিল—সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোন যায়গায়

একটু ধূলা বা ময়লা নাই। কতকাল যে এই অতিথিশালায় অতিথি আসে নাই (বেণেরা ত বড় একটা অতিথি হয় না), তাহার ঠিকানা নাই। তবু সব ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ করিতেছে। একখানি কাঁঠালের তক্তা-পোষের উপর সতরঞ্চ বিছাইয়া বিহারীকে বসাইয়া, পরে ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনি এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করুন, আমি ডুলিবেহারাদের দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিতে বলিতে ডুলি লইয়া তাহারা অতিথিশালার ভিতর আসিল। ডুলি একখানি পরিষ্কার দোচালায় রাখিতে বলিয়া ব্রাহ্মণ বেহারাদের বলিল, "তোমরা ঐ যে অশ্বত্থগাছের তলায় একখানি দোচালা —ঐখানে বিশ্রাম কর। আর এই মালায় তেল লইয়া যাও। ঐ অশ্বত্থগাছের পশ্চিমে দিঘী আছে তাহাতেই স্নান কর।" আর বিহারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"আপনি কি তোলাজলে স্নান ক'রবেন?—না গরমজলে স্নান করিবেন?—না পুকুরেই স্নান করিবেন?" বিহারী পুষ্করিণীতেই স্নান করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সেখানে এক-খানি জলচৌকি, তেল, গামছা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। বিহারীর চাকরেরা তাঁহাকে তেল মাখাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অন্দরে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ব্রাহ্মণ স্নানাহ্নিকের পর বিহারীর জল-যোগের জন্য ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ও রাঁধিবার জন্য চাল, ডাল, ময়দা, ঘি তরী-তরকারী ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বিহারী বলিল, "ও কি করেন মহাশয়! আমি ভবদেব ভট্টের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি, আমি তাঁহার বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইব! চাল-ডাল কেন?" "কি তা জান ভাই! সকল বেণেদের ত ব্রাহ্মণের উপর এমন ভক্তি নাই, তাই বেণেদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা আছে।" "যার নাই, তার নাই, আমার ত যথেষ্ট আছে। আমি প্রসাদই পাইব।" বিহারী স্নান আহ্নিক সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। বেলা ঠিক আড়াই প্রহরের সময়

একখানি গালিচার আসন আসিল, একখানি কলার পাত আসিল, একটি মাটীর ভাঁড় আসিল, সঙ্গে সঙ্গে একজন পাচক-ব্রাহ্মণ অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আসিল।

ভবদেব পইতার ঘর হইতেই হবিষ্য করিয়া আসিতেছেন, এবং প্রতিজ্ঞা—আজীবন হবিষ্য করিবেন। পাচক ব্রাহ্মণ একদলা ভাত সর্ব্বপ্রথমে কলার পাতে রাখিয়া বলিল—"ভবদেব ভট্টের প্রসাদ"; তাহার পর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত কলার পাতে সাজাইয়া দিল; কলার খোলার ঠোঙ্গায় করিয়া ডাল, ঝোল, অম্বল পায়স—সব দিল; বিহারীকে বলিল, "আপনি বসুন।" বিহারী আগ্রহ সহকারে প্রসাদ মুখে দিল, দেখিল, উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চালের ভাত, তাহাতে সেই দিনেরই তৈয়ারী ঘি মাখান, উৎকৃষ্ট সরু মুগের ডাল ভাতে দেওয়া। খাইতে খাইতে বিহারী বার বার বলিতে লাগিল,—"আমি সত্য সত্যই অমৃত ভোজন করিতেছি, এমন রান্না আর কখনও খাই নাই।"

[৪]

চারিদণ্ড বেলা থাকিতে ভবদেব ঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বার দিলেন। কার্য্যটি গুরুতর বিবেচনা হওয়ায়, আর কাহাকেও তিনি সঙ্গে আসিতে দিলেন না। বিহারীও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল ও চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিল। ব্রাহ্মণবাড়ীর রান্না যে অমৃত, সে কথা বিহারী বার বার বলিতে লাগিল। সে বলিল, "আজ ঠাকুরের বাড়ীতে অতিথি হইয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও রাখাকেই ব্রাহ্মণত্ব বলে। আপনার দেশটা সব দেখিলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোন-খানে কিছু ময়লা নাই। আপনাদের ভিতরটাও বোধ হয়, এমনই পরিষ্কার। আর ঐ ওদের—দেখুন দেখি? রূপা রাজা এমন একটি

মন্ত্রাবিচার করিয়া দিলে! পড়িলে সিন্দুর তোলা যায়। কিন্তু এই কয় দিনের মধ্যেই ভিখারীরা কি করিয়া তুলিয়াছে,—চারিদিকে ময়লা আর দুর্গন্ধ। কেবল তাহারা নিজের শরীরটিকে পরিষ্কার রাখে, আর শুইবার জায়গাটিও পরিষ্কার রাখে। বাকি কিছুই দেখে না, তাহাদের বিহারের ত্রিসীমানায় যাইতেও ঘৃণা হয়।”

ভবদেব ভাবিয়াছিলেন, বিহারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তাই বাড়ীতে তাহাকে ভাত না দিয়া, অতিথিশালাতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নহিলে যাহারা ব্রাহ্মণপন্থী, তাহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তাহারা পাত কুড়াইয়া লইয়া যাইত,—এইমাত্র।

খানিকক্ষণ এইরূপ শিষ্টাচারের পর ভবদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিহারী, তুমি যে স্বয়ং আসিয়া হাজির! ব্যাপারখানা কি, খুলিয়া বল দেখি।” “আজ্ঞা—ব্যাপার গুরুতর! আমি আমার জাতি-কুল মান-ধন সবই হারাইতে বসিয়াছি। আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তাই আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি”—বলিয়াই বিহারী একেবারে দণ্ডবৎ হইয়া বারান্দায় পড়িল। ভবদেব ঠাকুর বিহারীকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া ক্রমে আস্তে আস্তে বিহারীর মুখ হইতে সব ঘটনা শুনিলেন।

সিদ্ধল হইতে সাতগাঁ বেশী দূর নয়। ভবদেব প্রায়ই সেখানে যাইতেন, ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতেন। কিন্তু তিনি রূপা রাজার প্রাদুর্ভাবের পর হইতেই আর সে-মুখো হন না। বিহারী ও সাধু-ধনীর সঙ্গে ইহাঁর বেশ জানাশুনা ছিল। জীবনকেও তিনি জানিতেন, তবে তাহাকে খুব ছোট দেখিয়াছিলেন।

ভবদেব ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি এখন কি করিবে মনে করিতেছ?” “সেই পরামর্শের জন্যই ত আপনার কাছে আসিয়াছি।

আপনি যাহা পরামর্শ দেন, তাহাই করিব। তবে আমি এই জানি, আমরা পুরুষানুক্রমে সৎপথে থাকিয়া যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি, কতকগুলি লম্পট, ভণ্ড ভিখারীরা সেই সমস্ত লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, ইহা আমি প্রাণ থাকিতেও সহিতে পারিব না। আর আমার মেয়ের কথা”—বিহারী কাঁদিয়া ফেলিল। ভবদেব বিহারীকে আশ্বস্ত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আর কাহারও পরামর্শ লইয়াছিলে?” “আপনি ত এ দেশে ছিলেন না, তাই ভূরসুটের পাণ্ডী পাণ্ডুদাসের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছেন, এই তালপাতাখানি দেখুন, সব লেখা আছে।”

ভবদেব তালপাতাখানি একবার, দুইবার, তিনবার পড়িয়া দেখিলেন, পরে বলিলেন “তুমি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বল নাই?” “আজ্ঞা না। পত্রে সব কথা খুলিয়া বলিতে আমার ভরসা হয় নাই।” “তুমি বোধ হয় লিখিয়াছিলে, চতুর্ব্বর্ণে তোমাদের স্থান কোথায়?” “আজ্ঞা হাঁ।” “পাণ্ডু তোমাকে ঠিক পরামর্শই দিয়াছেন। তুমি এই সকল লোক একত্র কর। কোথায় করিবে, বল দেখি?” “আজ্ঞা, সে বিষয়ে ত আপনারই বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি হয়। আমি বেণে, আমার ত ও বিষয়ে কোন বোধসোধই নাই।” “দেখ, তোমার রাজার যেটুকু দেশ, তা আমরা ম্লেচ্ছের দেশ বলিয়া মনে করি। সেখানে আমরা ত যাইব না। আমার এখানে সকলে আসিয়া জুটিতে পারেন। কিন্তু আমি এখানে বেশী দিন থাকিতে পারিব না। আমাকে শীঘ্রই বাগড়ী যাইতে হইবে। আমার যদি মত লও, তাহা হইলে বাগড়ীতে দেবগ্রামে বাচস্পতি মিশ্রের টোলে সভা হইলেই ভাল হয়। পাণ্ডুর আসার পক্ষে একটু কঠিন হইবে বটে। কিন্তু তোমার ত ছিপ আছে। যাট্‌দাড়ী একখানি ছিপ দিয়া একরাত্রির মধ্যেই তাঁহাকে সাতগাঁএর রাজত্বটা পার করিয়া দাও।

সেইখানে বসিয়া আমরা তোমাকে ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং সুখসাধ্য পরামর্শ দিব। আমরাও কিছুদিন ভাবি।"

ভবদেব আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আচ্ছা,—তোমরা বলিতে পার, বিক্রমণিপুরের সেই রাজার ছেলেটা কোথায় গেল? আমার রাজারও সেই জন্য বড় চিন্তা, আমারও একটু চিন্তা আছে। রাজাকে মারিয়া ত দেশটা দখল করিয়াছি। কিন্তু রাজার ছেলেটা গেল কোথায়?"

"ঠাকুর, আমি ফাঁকা ফাঁকা শুনিয়াছি,—সেটা সঙ্ঘে গিয়াছে। কোন্ সঙ্ঘে—তা ত ঠিক বলিতে পারি না। লুই সিদ্ধার এক চেলা আছে। রূপা রাজা তাহাকে বড়ই মানে। সে দেখিতেও ঠিক রাজপুত্রের মত, খুব পণ্ডিত, খুব বুদ্ধিমান্।"

ভবদেব একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা' হবে,—তা' হবে।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা—বিহারী, বল দেখি, তোমার অবর্ত্তমানে তুমি তোমার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিতে চাও?"

"ঠাকুরের যে রায় হইবে, আমার রায়ও তাই। আপনারা যাহা বলিবেন, আমি নিঃসঙ্কোচে ও নিঃসন্দেহে তাহাই করিব। সধর্ম্মীরা একেই ত ভণ্ড ও লম্পট। তা'র উপর লুই সিদ্ধার যে দল হইয়াছে, তাহারা বেশ্যাবৃত্তিকেও হারাইয়া দিয়াছে। তাহারা যে বেণেদের এত বড় দু'টা সম্পত্তি খাইবে, এটা আমি একেবারেই সহিতে পারিব না! আপনারা বলেন ত আমি সমস্ত সম্পত্তি নারায়ণে সমর্পণ করিয়া দিয়া যাইব। আপনারা বলেন ত দুধের সাধ ঘোলে মিটাইব—দু'টি বেণের ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইব। তাহাদের হাতেই দু'টি সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া যাইব।"

ভবদেব। "না,—আমরাও তোমাকে ভণ্ড-লম্পটদের হাতে সম্পত্তি দিতে দিব না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[১]

মহাবিহারের সব প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম শেষ হইয়া গেল। লুইসিদ্ধা আপন শিষ্যের হাতে মহাবিহারের সব ভার দিয়া প্রায় সমস্ত কীর্ত্তনীয়ার দল লইয়া প্রস্থান করিলেন। অধিকাংশ খোল-করতাল আর খঞ্জনীওয়ালা তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সহজ-ধর্ম্ম ও মহাসুখবাদের মর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দল খুব বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার ডাক হইতে লাগিল। তিব্বত, পেগু আরাকানেও তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল। গুরুপুত্রের জন্য কেবল ২।৪ জন ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়া মহাবিহারে রহিয়া গেল। তাহারা রোজ রোজ গুরুপুত্রকে বৈকালে কীর্ত্তন শুনাইতে আসিত। তাঁহার অবসরমত তিনি শুনিতেন।

গুরু চলিয়া গেলে গুরুপুত্র কিছু ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি নিজেই কর্ত্তা, তাঁহার হুকুম সকলেই মানে। রাজা তাঁহার কাছে জোড়হস্ত। অথচ তাঁহার নিজের কোন বিষয়েই কোন জ্ঞান নাই। কি করিলে কি হয়, তিনি তাহা বুঝেনই না। অথচ তাঁহার পড়াশুনা আছে।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥

এ কথা তাঁহার বেশ জানা আছে। যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব, আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে তাঁহার নিজের কোনই হাত,

ছিল না। সুতরাং অবিবেকিতাটা যাহাতে না আসিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বেশ যত্ন আছে। তিনি বরং কোন কার্য্য না করেন সেও ভাল; কিন্তু হঠাৎ কোন কাজ করিয়া বিবেচনার ত্রুটি দেখাইবেন না। তাঁহার আরও মুস্কিল হইয়াছে, তাঁহাকে পরামর্শ দিবার লোক নাই। এক গুরু ছিলেন, তিনি দেশান্তরে। আর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের গুরু তিনি। তিনি তাহাদিগকে চালাইবেন, তাহারা তাঁহাকে চালাইতে পারে না। গুরুপুত্রটি খুব স্থির, খুব ধীর, নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, অনেক পোড় খাইয়া, অনেক দিন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া, তিনি বেশ আত্মসংযম করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিতে পারে এমন লোক অতি বিরল; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কথা মনে হইলে বড়ই কষ্ট হইত। কি ছিলাম কি হইলাম, ভাবিয়া তিনি অধীর হইতেন। অতি নির্জ্জনে,—অতি গোপনে কেহ কেহ তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেও দেখিয়াছে। তাঁহার গোপনে আরও এক ভাবনা,— সে সেই হাতীর উপরে মেয়েটির মুখখানি। যদিও বিষাদভরা, তথাপি তাহাতে এমন মোহ ছিল যে, গুরুপুত্র আজও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়, তাহার তলায় সে ছবিখানি গুরুপুত্র সর্ব্বদাই দেখিতে পান; কিন্তু নিজে সন্ন্যাসী, ও-সকল কথা তাঁহার ভাবিতেই নাই। তিনিও ভুলিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন কই? তার মুখখানি ভাবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক একবার ভাবেন, "ভাবিই না, ও তো আর কেহ দেখিতে পাইবে না, আপনার মনে আপনিই ভাবিব তাহাতে দোষ কি?" আবার ভাবেন, "ভাবিতে ভাবিতে যদি আকার-ইঙ্গিতে আর কেহ টের পায়, আমি কি ভাবিতেছি, তাহা হইলেই ত ফাঁক হইয়া পড়িবে।"

যাহা হউক, গুরুপুত্র খুব সংযমী। মনের ভাব, মনের কথা বেশ

গোপন রাখিয়া গেলেন। পরে শুনিলেন, মেয়েটি বিধবা হইয়াছে। আর সেই সময়ে তিনি বোধিসত্ত্ব-দীক্ষা সমাপন করিয়া বজ্রাচার্য্য-দীক্ষা লইয়াছেন। সহজ-ধর্ম্মে তাঁহার প্রবেশলাভ হইয়াছে, সেটা তাঁহার গুরুর কৃপায়। সহজ-ধর্ম্মের অনেক চর্য্যা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, সৌগত মতের নির্ব্বাণ—বুদ্ধত্বলাভ—সব বৃথা। নির্ব্বাণ যদি শূন্য হয়, সে ত পাথর হওয়া অপেক্ষাও খারাপ। সুখ-দুঃখ বোধ থাকিবে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু থাকিবে না, এমন কি, কোন বুদ্ধিও থাকিবে না। সে শূন্য কাহাকেও মজাইতে পারে না।

[২]

শূন্যের উপর যদি বিজ্ঞান মান, সে আবার কি? সে কেবল শূন্য বুঝাইয়া দিবার জন্য—ভয়ানক অন্ধকারকে আরও ভয়ানক করিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য। শূন্য বুঝিয়া কি হইবে? তাহাতে আমার কি? শুনিলাম সবই শূন্য, বুঝিলাম সবই শূন্য, হৃদয়ঙ্গম হইল সবই শূন্য। লাভ কি, আমি আছি শূন্য হইয়া, তুমি আছ শূন্য হইয়া—এ কথাও বলা যায় না; কারণ জগৎ অদ্বয়,—আমি তুমি দুই-ই নাই, তুমিও শূন্য, আমিও শূন্য, অথচ আমরা দুই নই। আমিই শূন্য, তুমিই শূন্য, দুই শূন্য। শূন্য থেকে শূন্য পৃথক্ করা যায় না। সুতরাং সব এক—কেবল বুঝি সব শূন্য,—এ অবস্থাটা বড়ই খারাপ;—বড়ই ভয়ের কারণ। তাই আধুনিক আচার্য্যেরা একটা নূতন কথা আনিয়াছেন,—সেটা মহাসুখবাদ।

গুরু চলিয়া গেলে গুরুপুত্রের চর্য্যা খুব কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, এত লোক আমায় দেখিয়া, আমার উপদেশ লইয়া শিখিবে, সুতরাং আমার খুব সাবধান হইতে হইবে। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠেন। তাঁহার ঘরটি বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাঁহার শয্যার কিছুই

আড়ম্বর নাই। উঠিয়া আবশুক কার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি গঙ্গাস্নানে যান। আগে আগে মহাবিহারের পূর্ব্বদিকের ফটক দিয়া সহজেই গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিতেন। এখন কিন্তু উত্তর ফটক দিয়া বাহির হন, আর ধর্ম্মপুরের পুরাণ বিহারের ধার দিয়া পূর্ব্বমুখে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরিয়া, যেখানে বেণেদের অনেক গোলা আছে, সেইখানে যাইয়া স্নান করেন। সঙ্গে কেহ প্রায় থাকে না। অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তরমুখ হইয়া গুরুপুত্র কি দেখিবার জন্য চাহিয়া থাকেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডুব দিয়া চলিয়া আসেন। সেখানে অনেক-গুলা গোলা। সব বেণেদের। বড় বড় গোলা। দুই গোলার মাঝখানে প্রায় একটি গলি। গুরুপুত্র যে কোন্ দিন কোন্ গলি দিয়া, কোন্ ঘাটে যান, তাহার স্থিরতা থাকে না। স্থির কেবল এক জিনিস,—সেই দীর্ঘনিশ্বাসটি।

[৩]

স্নান করিয়া আসিয়া গুরুপুত্র প্রথমেই যুগনদ্ধ মূর্ত্তি হেরুকের মন্দিরে যান, সেখানে স্বহস্তে ধূপ জ্বালেন, দীপ জ্বালেন, ফুল দেন, মালা দেন, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করেন। তখন তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনির ন্যায় স্তবের ধ্বনিতে লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর দণ্ডবৎ হইয়া হেরুককে প্রণাম করেন। তাহার পর শাক্য মুনির প্রতিমার কাছে স্তব পাঠ করেন। এইরূপে পূজা শেষ করিয়া পাঠে বসেন; সে পাঠ তাঁহার নিজের জন্য, পরের উপদেশের জন্য নহে। হয় নাটমন্দিরে, না হয় দোতলার বারান্দায়, না হয় নিজের ঘরের মধ্যেই বসিয়া পাঠ করেন, অনেক সময় পাঠ করিতে করিতে বারান্দায় পাইচারি করেন। তাঁহার শোবার ঘরের এক কোণে একখানা চৌকির উপর

কতকগুলি তালপাতার পুথি সাজান থাকে, পুথিগুলি খুব ভাল ছোবান রেশমের কাপড়ে বাঁধান, আর রেশমের দড়ি দিয়া বাঁধা। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন তিনি বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পাইচারি করিতে লাগিলেন,—একটু অস্ফুট, সুতরাং অত্যন্ত মনোহর স্বরে পড়িতে লাগিলেন।—

জয়তি সুখরাজ এষ কারণরহিতঃ সদোদিতো জগতাং
যস্য চ নিগদনসময়ে বচনদরিদ্রো বভূব সর্ব্বজ্ঞঃ।

ঠিক কথা—এই সুখরাজই সারবস্তু, সর্ব্বজ্ঞ এ সুখরাজের কথা বলিতে গিয়া বচন-দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ তাঁহার কথা বাহির হইল না। এ কথা ঠিক, শাক্যসিংহ এ কথা বলেন নাই; তাঁহার এরূপ ধারণাই ছিল না। তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই চেষ্টা করিতেন। তাহার পর কি হইবে, সে কথা তাঁহার ভাবনার অতীত ছিল। তাই তাঁহার নিন্দা না করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, "বচনদরিদ্রো বভূব সর্ব্বজ্ঞঃ" এই যে মহাসুখ-বাদ, ইহাতে পরকাল সত্যই মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। অদ্বয় হইলাম, শূন্য হইলাম, শূন্য বুঝিলাম, আমিও শূন্য—বুঝিলাম; কিন্তু যখন বুঝিলাম, সেই শূন্য মহাসুখময়,—তখন শূন্যটাও যেন ভরা ভরা হইয়া উঠিল। শূন্যের শূন্যত্ব, শুষ্কত্ব শেষ হইয়া গেল। মহা-উৎসাহে দ্বিগুণ মনের বেগে সহজ ধর্ম্মের চর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম। শূন্যতা তখন দেবী, আমি তখন ভৈরব, আমরা দুজনে এক হইয়া শুদ্ধ যুগনদ্ধ অবস্থায় নহে,—লবণে ও জলে যেমন এক হইয়া যায়, তেমনি শূন্যে ও আমায় এক হইয়া গিয়া, মহাসুখে অনন্তকাল রহিলাম। এই মহাসুখময় ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে?

[৪]

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া পাইচারি করিতেছেন। হঠাৎ সেই মুখখানি, সেই বিষাদমাখা মুখখানি, তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। পা-চালি ধীর হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, "এ মুখ আমার মনে পড়ে কেন? আর মনে পড়িলেই এত আনন্দ হয় কেন? আনন্দ না হইলেই বা সে মুখখানি দেখিবার জন্য এত অধীর হই কেন? এত দীর্ঘনিশ্বাস কেন? ইহাকেই কি আচার্য্যেরা বলিয়াছেন স্বসংবেদ্য সুখ—যে সুখ নিজেই বুঝা যায়, অপরকে বুঝান যায় না। এই সুখ এই ধ্যানই কি তবে মহা-সুখ-সমাধির আরম্ভ? এই সুখকে 'বিগলিত-বেদ্যান্তর আনন্দ' বলে,—যে আনন্দ উঠিলে আর কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। এ আনন্দ উদয় হইলে বোধ হয় যেন, ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যায়, চক্ষু বল, কর্ণ বল, জিহ্বা বল, ত্বক্ বল—সব আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। অধোদেশে বল, ঊর্দ্ধদেশে বল, পার্শ্বে বল, কেবল আনন্দ—কেবল আনন্দ—কেবল আনন্দ। আচ্ছা—মন দিয়া যখন আমরা কাব্য পড়ি বা নাটক দেখি বা গান শুনি, তখনও এইরূপ বিমল, বিশুদ্ধ, স্বসংবেদ্য, 'বিগলিত-বেদ্যান্তর' আনন্দের উদয় হয়। তবে কেন আমি এই মুখ খানিকেই কাব্য করি না? এই মুখ খানিকেই নাটক করি না? এই মুখ খানিকেই গানের তাল-লয় করি না? কাজ কি সে আসল মুখে? যে মুখ আমার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি কেন মহা-সুখসমাধিতে ডুবিয়া যাই না? তাই ঠিক। আমি সেই মুখই ভাবিব, সেই মুখই ধ্যান করিব, সেই মুখখানি লইয়াই থাকিব। আমি আর বেণেদের গোলার ঘাটে যাইব না। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িব না। যাহা চাই, তাহা আমার নিজেরই কাছে

আছে। কেন পরের জিনিসে লোভ করি? কেন তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হই।" গুরুপুত্র যে এইভাবে কতক্ষণ রহিলেন, বলিতে পারি না।

[৫]

তারাপুকুরের রাজবাড়ীর একটি নির্জ্জন কুঠারীতে রূপা রাজা বসিয়া আছে। সামনে সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র—গোপনে তাঁহাদের কি একটা পরামর্শ চলিতেছে—ভারি গোপন; কুঠারীর সব দরজা বন্ধ।

শ্রীফল। মেয়েটাকে সত্ত্বে আনিতেই হইবে। ঐ মেয়েকে আনিতে পারিলে, মহাবিহার বড়মানুষ হইয়া যাইবে। ভিখারিণীরা এত চেষ্টা করিতেছে—তাহারা ত পারে নাই। বরং কথাটা একটু ফাঁস হইয়া গিয়াছে। সেটা ভাল হয় নাই। এখন কিরূপে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়?

সাধুগুপ্ত। বলপ্রয়োগ।

শ্রীফল। তাহাতে হইবে না। বিহারী দত্ত বেশ সতর্ক হইয়াছে। এখনও বিহারী একাই একশ। বলপ্রয়োগে মহা অনিষ্ট হইবে। কৌশল চাই। কিন্তু সে কিরূপ কৌশল?

রাজা। আপনারা সম্পত্তিটা হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার কিন্তু সে মেয়েটিতে আরও একটি প্রয়োজন আছে। তারই জন্য আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধুগুপ্ত। (আগ্রহের সহিত) আপনার আবার কি প্রয়োজন?

রাজা। প্রয়োজন আমার নিজের নাই, সহজ-ধর্ম্মের। গুরুদেব আমায় বারবার বলিয়াছেন—"এই ছেলেটি হইতেই সহজ-ধর্ম্মের চরম উন্নতি হইবে। সেই সহজ-ধর্ম্মের ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে ও সহজ-

সমাধিতে সিদ্ধ হইবে।” কিন্তু সে যোগে একটি যোগিনী চাই ? আর আমার বোধ হয়, বিহারী দত্তের মেয়েই আমার গুরুপুত্রের উপযুক্ত যোগিনী। উহাকে তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।

শ্রীফল। তাহা হইলে মহারাজেরও যে কথা আমাদেরও সেই কথা—মেয়েটাকে সঙ্গে আনা। তাহা হইলে আপনি যে বড় কথা বলিতেছেন, তাহাও হইবে ; আর আমরাও যে সামান্য অর্থের কথা ভাবিতেছি, তাহাও হইবে। কি কৌশলে তাহাকে আনা যায় ?

[৬]

তাঁহাদের কি পরামর্শ স্থির হইল, কেহই জানিল না। রাজা-রাজড়ার বাড়ীতে গোপনে পরামর্শ—কার সাধ্য জানিতে পারে। বিশেষ সেকালে মন্ত্রগুপ্তির বড়ই আদর ছিল। কিন্তু রাজা ঘন ঘন মহাবিহারে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। গুরুপুত্রকে তিনি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার ভক্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল। আহারাদির পর যখন গুরুপুত্র উপদেশ দিতে বসিতেন, রাজা প্রায়ই সে সময় উপস্থিত থাকিতেন ও মনোযোগের সহিত সে উপদেশ শুনিতেন। প্রায়ই বড় বড় লোক তিনি সঙ্গে লইয়া আসিতেন এবং যাহাতে গুরুপুত্রের উপর তাঁহাদেরও ভক্তি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। বেণেদের অনেককেই তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহাদেরও মধ্যে অনেকেই গুরুপুত্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আসিত। বাগ্দীদের মধ্যে অনেক বড় লোক রাজার প্রিয় হইবার জন্য গুরুপুত্রের কাছে দীক্ষাও গ্রহণ করিল। বিদেশ হইতে কোন বড় লোক আসিলে, রাজা তাহাকে গুরুপুত্রের উপদেশ শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন ও নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন। গুরুপুত্র কোন ভাল কথা বলিলে, লোকের মুখে মুখে

যাহাতে তাহার বহুদূর প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। মোট কথা. তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহার গুরুপুত্রের পসার ও প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া উঠে।

একেত গুরুপুত্রের রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তপ আছে, জপ আছে, পূজা আছে, পাঠ আছে, শীল আছে, বিনয় আছে, ক্ষান্তি আছে, ধ্যান আছে, বীর্য্য আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, বক্তৃতাশক্তি আছে, তাহার উপর তিনি বড় মানুষ, পঞ্চাশখানি গ্রামের উপস্বত্ব তিনি পান, তাহার উপর পূজাপার্ব্বণে প্রণামী পান, পালি-পার্ব্বণেও যথেষ্ট আয় আছে। তিনি নিজের জন্য কিছু খরচ করেন না। তাঁহার টাকা নিরন্নকে অন্নদানে খরচ হয়; বিবস্ত্রকে বস্ত্রদানে খরচ হয়; দুঃখীর দুঃখমোচনে খরচ হয়, রোগীর চিকিৎসায় খরচ হয়। তিনি অনাথের নাথ, পুত্রহীনের পুত্র, মাতৃহীনের মাতা, পিতৃহীনের পিতা, তাঁহার মিষ্ট কথায় রোগীদের রোগ শান্তি হয়, ভীতের ভয় শান্তি হয়, পাপীর পাপ শান্তি হয়। যাহার সংসারে কোনও শান্তি নাই, সেও যদি একবার দুদণ্ড তাঁহার কাছে বসে, তাহার সব শান্তি আসিয়া যায়। গুরুপুত্রের পসার প্রতিপত্তি যত বাড়িতে লাগিল, তাঁহার স্বভাবও ততই সুন্দর হইতে লাগিল, উপদেশও গভীর হইতে লাগিল। রাজারও তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ততই বাড়িতে লাগিল; শেস এমনি দাঁড়াইল, যেন রাজাই তিনি, রাজা তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্যমাত্র। রাজার কিন্তু এখনও ধারণা যোগিনী না থাকিলে গুরুপুত্র সিদ্ধ হইবেন না, আর সে যোগিনী ঐ বিহারী দত্তের বিধবা কন্যা মায়া। গুরুপুত্র নিজের মনের তলায় যে মন, তাহাতে মায়াকে মহামায়া করিয়া তুলিতেছেন; কিন্তু রাজা মায়াকে যোগিনী করিবার চেষ্টায় আছেন।

[৭]

কিছুদিন পরে সহরে গোল উঠিল যে, একজন মস্করী আসিয়াছেন। তিনি ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া গান করিয়া বেড়ান। তাঁহার বেশের ঠিক নাই। কখনও সন্ন্যাসীর বেশ, কখনও রাজার বেশ। কখনও ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও চণ্ডালের বেশ। কখনও পাগলের বেশ, কখনও ডাকাতের বেশ। কিন্তু যখন যে বেশেই থাকুন, তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তাঁহার গলা অতি মিষ্ট, গান গাহিলে বীণা হারিয়া যায়। তাঁহার কথাও বড় মিষ্ট। তিনি থাকেন কোথা কেহ জানে না। কোন দিন তাঁহাকে ধরমপুরের পুরাণ বিহারে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দিন মহাবিহারেও দেখা যায়। তিনি বেণেদের গোলায়ও কখন কখন উদয় হন। কখন কখন ব্রাহ্মণপল্লীতেও উদয় হন। কিন্তু কোনও না কোন ছবি তাঁহার হাতে থাকেই। মানুষের ছবিই বেশী, বুদ্ধ-বোধি-সত্ত্বের ছবিও আছে, তবে কম। কখন কখন কালী-দুর্গার ছবিও থাকে। তাঁহার হাতে ছবি দেখায় ভাল। সময়ে সময়ে মনে হয়, যেন ছবির সত্য সত্যই প্রাণ আছে। সে সব ছবি কে লেখে জানা যায় না। কিন্তু পাকা চিত্রকরের হাতের ছবিও বুঝি এত ভাল হয় না। সাতগাঁয়ে সব জায়গাই মস্করীকে দেখা যায়।

একদিন জীবন ধনীর গোলায় সে ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। এক দাসী গিয়া মায়াকে বলিল, মস্করী ছবি দেখাইয়া ভিক্ষা করিতেছে। মায়া ছবি দেখিতে আসিল। সেদিন মস্করীর হাতে সাতগাঁয়ের এক ব্রাহ্মণের ছবি ছিল। মায়া ব্রাহ্মণকে চিনিত। ছবি সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। দেখিল, ব্রাহ্মণ যেন কথা কহিতে যাইতেছে। মস্করীর উপর মায়ার বড় ভক্তি হইল। মায়া তাহাকে

বাবার ছবি দেখাইতে বলিল। দুই তিন দিন পরে মস্করী বিহারী দত্তের ছবি আনিল। বিহারী সমুদ্র হইতে আসিয়া গোলায় উঠিতেছে। ঠিক সেই অবস্থার ছবি। ছবি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ঠিক হুবহু বিহারী দত্তের ছবি। যেন নৌকা হইতে নামিয়া গোলার দুয়ারের দিকে যাইতেছে। একটি পা উঠিয়াছে আর একটি নড়িতেছে।

মায়া একা থাকে, সর্ব্বদাই একজিনিস ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। এবারও তাহার মনে হইল—মস্করী নাই, ছবি নাই। গোলার দরজায় সে আর তা'র বাবা। কতক্ষণ এইভাবে থাকিল। তাহার পর মায়ার যেন সব ফিরিয়া আসিল। তখন সে লজ্জিত হইল। মস্করী বলিল, "আচ্ছা—আমি আর একদিন তোমায় আর এক ছবি দেখাইব।"

এবার সে জীবন ধনীর ছবি আনিল। তীর-ধনুক লইয়া জীবন বাঘ মারিয়া বেড়াইতেছে—সেই ছবি দেখাইল। সেই দীর্ঘাকার ছোকরা. আঠার বছর বই বয়স নয়। বুক চটাল, বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল। মায়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল; আকার ইঙ্গিতে তাহাকে সমুদ্রের ধারের সেই ছবি দেখাইতে বলিল—যে ভাবে জীবন বাঘের মুখ হইতে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সে আর একদিন সে ছবিও দেখাইল। মস্করীর উপর মায়ার খুব ভক্তি হইল, খুব বিশ্বাস হইল। সে মায়াকে বলিল, "যে ছবি তুমি রোজ ধ্যান কর, সেই ছবিখানি যদি আমায় দিতে পার, তা হ'লে আমি তাহাতে প্রাণ দিয়া দিতে পারি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

[১]

একদিন রাত্রে গঙ্গার দু-ধারের লোক চকিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঝপ্‌ঝপ্ শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিতে শুনিতে কোথায় মিশাইয়া গেল,—দক্ষিণ হইতে আসিল, উত্তরদিকে গেল। এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিল। কি শব্দ, কে শব্দ করিল, কিছুই বুঝা গেল না। পর দিন সকালে সকল গাঁয়ের লোকই শব্দের কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু কেন, কি বৃত্তান্ত—কেহই বলিতে পারিল না। একজন বলিল, ছিপ-ছিপ। অনেক দাঁড়ের ছিপ। আর একজন বলিল—না না, কোন জানোয়ার জলের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আর একজন বলিল -না—হে না ঘূর্ণী জল ; চলিতে চলিতে শব্দটা মিলাইয়া গেল দেখিলে না। ছিপ হইলে শব্দটা থাকিত না? একেবারে কি কখন ছিপের শব্দ বন্ধ হয়? আমরা কিন্তু জানি শব্দটি ছিপেরই। যেখানে সরস্বতী গঙ্গায় পড়িয়াছে, তাহারও দক্ষিণ হইতে, অর্থাৎ সাতগাঁর রাজার এলাকার বাহির হইতে ছিপ আসিয়া এক রাত্রের মধ্যেই সাতগাঁ রাজ্যটা পার হইয়া বিক্রমনীপুরের পাশে দেবগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। ছিপে ছিল আমাদের পুরাণ বন্ধু শ্রীধর ভূরি। তিনি গাঙ্গী পাণ্ডুদাসের প্রতিনিধি হইয়া দেবগ্রাম যাইতেছিলেন। আগে বিক্রমনীপুর, তাহার পর দেবগ্রাম। ছিপ গিয়া দেবগ্রামে পঁহুছিল, শ্রীধর ঘাটে নামিলেন। একদল আধা-বয়সী ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে

লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। গাঁ-খানি নূতন বসান, গঙ্গায় একটা বাঁওড় পড়িয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বে দেবগ্রাম। বিক্রমনীপুরের ভাঙ্গা বাড়ীগুলা ভাঙ্গিয়া তাহারই মালমসলা দিয়া কতক পরিমাণে দেবগ্রাম বসান। সুতরাং মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি সরস্বতীমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হইতে লাগিল। লোকেশ্বরের মূর্ত্তি সূর্য্যমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হইতে লাগিল। বাঁওড়ের নাম হইল দিঘী। অনেক ব্রাহ্মণের বাস হইল। আগে যেমন হইত, এক গ্রামে একই গোত্রের ব্রাহ্মণ—এখানে তাহা হইল না। নানা গোত্রের ব্রাহ্মণ একত্র বাস করিতে লাগিল। গাঞী আর গ্রামের কর্ত্তা নহেন, গ্রামের কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীভবদেব শর্ম্মা সিদ্ধল। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহারই আশ্রিত, তাই মিশ্র মহাশয়কে তিনি একটি প্রকাণ্ড চৌবাড়ী করিয়া দিয়াছেন। অসংখ্য ছাত্র চৌবাড়ীতে পাঠ করে।

ছাত্রেরা খুব আদর করিয়া শ্রীধরকে চৌবাড়ীতে লইয়া গেল। চৌবাড়ীর চারিদিকে চারিখানি টোল-ঘর। টোল-ঘরগুলির দাওয়া খুব উচ্চ—প্রায় তিন হাত হইবে। প্রত্যেক টোল-ঘরে প্রায় ৫০টি করিয়া দরজা আছে। দুই দরজার মাঝখানে পিল্‌পা। যে দেয়ালে দরজা আছে, তাহার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটিও জানালা বা দরজা নাই। দরজার ঠিক সামনেই একটি একটি কুলঙ্গীমাত্র; কুলঙ্গীর নীচে মেঝেতে এক একটি উনুন কাটা। যেখানে পিল্‌পা, ঘরের মাঝে সেই খানেই এক একটি বেদী—প্রায় এক হাত উঁচু। বেদীর উপর দুইটি বিছানা হইতে পারে। এক এক বিছানায় এক একটি ছাত্র বাস করে। তাহারা মেঝের উনানে রাঁধে, কুলঙ্গীতে হাড়ী রাখে, বেদীতে শোয়; আড়ায় চালি দেওয়া আছে, তাহাতে আপন আপন জিনিষপত্র, পুথি-পাঁজী, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল রাখে। প্রায় সমস্ত দিনই দাওয়ায় বসিয়া তাহারা পড়ে, অথবা চণ্ডীমণ্ডপ বা আটচালায় থাকে, রান্নার সময়

এবং শোবার সময় ঘরের ভিতর আসে। রান্নাও যাহাদের পরস্পর ভোজ্যান্নতা আছে, তাহারা এক একজনে পালা করিয়া রাঁধে, আর সকলে একত্র খায়। যাহার অন্যের সহিত ভোজ্যান্নতা নাই, সে নিজেই রাঁধে। অধ্যাপক চাউল আর কাঠ জোগান, অন্য সামগ্রী তাহারা নিজেই সংগ্রহ করে। অধ্যাপক আরও যোগান এক একজন পেটেলী, অর্থাৎ পাট করিবার জন্য চাকরাণী। সে উনুন গোবর দেয়, ঘর নিকায়, উনান ধরাইয়া দেয়। ছাত্রেরা আপনার কাপড় আপনি কাচে। শরীর অসুস্থ হইলে, পেটেলী সে কাজটাও করিয়া দেয়।

[২]

বাচস্পতি মিশ্রের চৌবাড়ীতে এইরূপ চারি পোতায় চারিখানি টোল-ঘর আছে। মাঝখানটা একটা প্রকাণ্ড উঠান। তাহার ঠিক মাঝখানে একখানা বারদুয়ারি আটচালা। তাহাতেই বসিয়া অধ্যাপক পাঠ দেন। এক এক পাঠে দশ বারটি, কখন কখন ৫০টি ছাত্রও বসে। পুরাণ ছাত্রেরা বারদুয়ারীর দাওয়ায় বসিয়া নূতন ছাত্রদের পাঠ দেয়, অথবা নিজে বসিয়া পুথি দেখে। চৌবাড়ীতে প্রায় ৪০০ ছাত্রের স্থান আছে। ইহা ছাড়াও ভদ্রলোকের বাড়ীতে অনেকে স্থান পাইয়াছে। ছাত্রদের স্থান দেওয়া, খরচ জোগান, বেণেরা নিত্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। সুতরাং দেবগ্রাম একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীধর উপস্থিত হইলে বাচস্পতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পড়ুয়াদের শিষ্টানধায় হইল। অনেকে হো হো করিয়া বেড়াইতে লাগিল; অনেকে শ্রীধরের সেবায় নিযুক্ত হইল; অনেকে তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীধরও কাহারও বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ বলিয়া, কাহারও

বেশ পড়া শুনা আছে বলিয়া, কাহারও বাক্‌চাতুর্য্য বেশ আছে বলিয়া, খুসি করিয়া দিতে লাগিলেন।

[৩]

এইরূপে দুই তিন দিন গেলে মহাসভার অধিষ্ঠান হইল। বাচস্পতি মিশ্রের চৌবাড়ীর বারদুয়ারী আটচালায় অধিষ্ঠান হইল। শ্রীধর যেমন বাচস্পতির অতিথি হইয়াছেন, অন্যান্য অধ্যাপকগণ তেমনি কেহবা ভব দেবের, কেহবা দেবগ্রামের কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের অতিথি হইয়া আছেন। অধিষ্ঠানের দিন সকলে আসিয়া বারদুয়ারীতে বসিলেন। সভাপতি হইলেন ভবদেব। বাচস্পতির প্রধান ছাত্র ত্রিবিক্রম প্রতিনিধি হইলেন। বিহারী দত্তের প্রধান কর্ম্মচারী দাওয়ায় বসিয়া তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার প্রধান কথা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে বেণেদের স্থান কোথায়? ত্রিবিক্রম সেই কথা পরিষদে নিবেদন করিলেন। পরিষদ্ বিচার করিতে বসিলেন। প্রথম কথা তাহারা সদাচারী কি না? চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজে তাহাদের স্থান হইতেই পারে কি না। তাহারা দশবিধ সংস্কারে শুদ্ধ হয় কি না? সে সকল কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইল, ত্রিবিক্রমকে অনেকবার বাহিরে আসিয়া বিহারীর লোকের নিকট হইতে খবর লইয়া যাইতে হইল। স্থির হইল, তাহারা সদাচারী বটে, তাহারা দশবিধ সংস্কারও লয়। কেহ কেহ দশ বারই সংস্কারের উদ্যোগ করে। কেহ কেহ বা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও বিবাহের সময় অন্যান্য সংস্কার লইয়া দশ সংখ্যা পূরণ করে। একজন বলিলেন, উহারা বোধমার্গী কি না? তাহাতে আপত্তি করিয়া ভবদেব বলিলেন, সে কথা আমাদের শুনার কিছুই দরকার নাই। সম্প্রদায়ভেদের কথা এ সভায় উঠিতেই পারে না। বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাড়ী আসিলে আমরাও ভিক্ষা দিয়া থাকি, বেণেরাও দেয়, তাহাতে

ক্ষতি কি ? প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযোগী বাড়ী আসিলে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা সবারই উচিত। আর মানতের কথা— রোগী, আর্ত্ত, পীড়িত সকল লোকের কাছে, সকল দেবতার কাছেই, শান্তির আশা করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের সমাজের কোনও ক্ষতি হয় না। আসল কথা, গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কারের। সে গুলি রীতিমত হইলেই চাতুর্ব্বণ্য সমাজে সে স্থান পাইবে ? একজন আপত্তি করিয়া বলিলেন, এখন অনেক পাষণ্ডমতাবলম্বীরাও তাদের মনের মত এক রকম সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাতে ভবদেব বলিলেন, গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানে সংস্কার হওয়া চাই। প্রতিনিধি বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংস্কার করায় কে ? উত্তর হইল ব্রাহ্মণে। তখন বেণেদের চাতুর্ব্বণ্য-সমাজে স্থান আছে, ঠিক হইয়া গেল।

[৪]

এখন কথা হইল, তাহারা কোন্ বর্ণ ? এইবার ঘোর বাদানুবাদ চলিল। ত্রিবিক্রম বার বার গাঁথাঘর (গ্রন্থাগার) হইতে পুঁথি আনিয়া খুলিয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, —"নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" ক্ষত্রিয়েরই লোপ হইয়াছে। বৈশ্যের ত লোপ হয় নাই। বেণেরা বৈশ্যবৃত্তি করে, সুতরাং তাহারা বৈশ্যই। বৈশ্য হইলে সে ত ত্রৈবর্ণিক হইবে। তাহার বেদে অধিকার থাকিবে। তাহাদের ত অনেক দিন বৈদিক ক্রিয়া কলাপ লোপ হইয়াছে। এখন তাহাদের বেদে অধিকার দিতে হইলে বড়ই মুস্কিলের কথা। তাহাদের বাড়ীতে সকল ব্রাহ্মণকেই অন্ততঃ ফলাহার করিতে হইবে। তখন ত্রিবিক্রম মহা ফাঁফরে পড়িলেন, রাশি রাশি পুঁথি আনিতে লাগিলেন, কিন্তু বচন পাওয়া যায় না। শেষ এক বচন বাহির হইল, "কলাবাদ্যশ্চ অন্ত্যশ্চ" কলিতে আদি ও অন্ত্যবর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ নাই। সুতরং বিহারী দত্ত ও তাহার জাতি-ভাই সকলেই শূদ্র।

তাহার পর প্রশ্ন হইল, বিহারীর দেহান্তে তাহার ধন কে পাইবে? তাহার এমন কি নিকট সপিণ্ড-জ্ঞাতিও নাই। তখন ভবদেব বলিলেন,— সে কথা আমি অনেক দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সে পোষ্যপুত্র লউক। তাহার একটি শ্যালক আছে, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। সে সেই টিকেই পোষ্যপুত্র লউক।

"আর তাহার কন্যা?"

"সাধু ধনীর পুত্রবধূ? সেও ধনী বংশের কোন একটি ছেলেকে পোষ্য পুত্র লউক; ধনীবংশের ছেলের অভাব নাই।"

এই দুই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। স্থির হইল, বেণেরা শূদ্র, বিহারী শালাকে পোষ্যপুত্র লউক, আর তাহার মেয়ে ধনীবংশের কোন ছেলেকে পোষ্যপুত্র লউক। ত্রিবিক্রম এই মর্ম্মে ব্যবস্থা লিখিয়া আনিল, সকলে স্বাক্ষর করিলেন। ব্যবস্থাপত্র লইয়া ত্রিবিক্রম বিহারীর কর্ম্মচারীর হস্তে দিল। কর্ম্মচারী তোলবট স্বরূপ প্রত্যেক পারিষদকে হাজার করিয়া টাকা দিলেন, আর ত্রিবিক্রমকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। সভাভঙ্গ হইল। অধ্যাপকগণ দুচার দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন। শ্রীধরের জন্য আবার ছিপের বন্দোবস্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

[১]

মস্করি, তুমি করিলে কি?—তুমি কি যাদুবিদ্যা জান? তুমি যে মায়াকে বড়ই বশ করিয়াছ, সে যে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে· কখন্ তুমি আসিবে, কখন্ তুমি তাহার স্বামীর ছবি দেখাইবে। সে ছবি দেখিয়া সে যে শিহরিয়া উঠে,—তাহার ভ্রম হয়, স্বামী তাহার জীবিত। তুমি ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া তাহার অতিপ্রিয় স্বামীর ছোট ছবিখানি আত্মসাৎ করিয়াছ। সে ছবি পাবার জন্য মায়া বড় ব্যস্ত। সে কখন সে ছবি হাতছাড়া করে নাই। তুমি কোন্ মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া তাহার অতি গোপনীয় ধন সে ছবিখানিও বাহির করিয়া লইয়াছ। সে ছবি লইয়া তুমি করিবে কি? আহা! সে তাহার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে সেখানি ফিরাইয়া দাও। তাহা দিয়া তোমার কোনও কাজ হইবে না। কেন এত ভালবাসার জিনিসটি হইতে বেচারাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ? দাও দাও,—তাহার স্বামীর ছবি তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

ও কি!—তুমি মায়াকে কি বলিতেছ? ঐ দেখ, সে কান খাড়া করিয়া শুনিতেছে। তুমি বলিতেছ, ওই ছবিখানা তুমি একজন শিল্পীকে দিয়াছ। সে ঐ ছবি দেখিয়া একটি মূর্ত্তি গড়িবে, তুমি তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে কথা কহাইবে। তোমার এ কথায় আর ত কেহ বিশ্বাস করিবে না,—মানুষে নাকি মরিয়া গেলে কথা কহে! মূর্ত্তিতে নাকি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে না কি মূর্ত্তি সজীব হয়! প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

করে সত্য, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে অনেক লোকে ভাবে, প্রতিমা সজীব হয় ; প্রতিমা নড়ে, প্রতিমার ঘাম হইতে দেখা যায়, কিন্তু মানুষের মূর্ত্তির সেরূপ হয় কি ? কখন ত এ কথা কেহ ভুলেও বলে না যে, মানুষের মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে সে কথা কহে, তাহা হইলে কত পুত্রহীন পিতা, কত পুত্রহীনা মাতা, কত বিধবা মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিত, কথা কহাইতে চেষ্টা করিত। লোকে যাই ভাবুক, মায়া তোমার কথায় খুব বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার দেরী সহে না। তুমি তাহাকে পাগল করিয়াছ,--উন্মাদ করিয়াছ। সে চায়, এখনি তুমি তাহার স্বামীর মূর্ত্তি আনিয়া দাও,—এখনি তাহাকে কথা কহাও। তুমি যত দেরী করিতেছ, সে ততই ব্যাকুল হইতেছে। তুমি ক্রমে তাহাকে এমন বশ করিয়া ফেলিয়াছ যে, তুমি যাহা বলিবে, সে তাহাই করিবে, এবার তুমি কি বলিবে ? বলিবে, যদি বিলম্ব না সহে, আমার সঙ্গে চল। যেখানে মূর্ত্তি গড়িতেছে, সেইখানে তোমায় লইয়া যাই, সেইখানেই তোমায় এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইব।

ও কি মায়া !—তুমিও যে রাজী ! তুমি কুলকন্যা, কুলকামিনী, তোমার কি এই পরপুরুষের সঙ্গে যাওয়া উচিত ? লোকে যে কলঙ্ক রটনা করিবে ! তোমার যে ভারি নিন্দা হইবে। আমরা জানি, তুমি নির্দ্দোষ। তুমি স্বামীকে দেখিবার জন্যই যাইতেছ, কিন্তু দুষ্ট লোকে ত সে কথা শুনিবে না,--জানিবে না। তাহারা মনে করিবে ও বলিয়া বেড়াইবে,—যে কারণে অন্য পাঁচটা বালবিধবা ঘরের বাহির হইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ যাইতেছ ;—অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ কর। যাইতে হয়, বাবাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও ; মাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও। তোমার সংসারে মান-মর্য্যাদা আছে, অর্থ-সামর্থ্য আছে ; উপযুক্ত সাজসজ্জা কর, লোক জন সঙ্গে লও তবে যাও। একলা যাইও না,—যাইও না।

এ কথায় মায়া রাজী নয়। বাবাকে বলিলে তিনি যাইতে দিবেন না।

মাকে বলিলে তিনি যাইতে দিবেন না। সুতরাং সে স্থির করিল, তাহার নিজের ধাই মা ও জীবন ধনীর ধাই-মা, এই দু'জনকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহাদের দু'জনের মায়া-অন্ত প্রাণ। মায়ার সঙ্গেই তাহারা থাকিবে। মায়ার মায়া তাহারা এড়াইতে পারিবে না,—তাহারা যাইবে। কাজ সারিতে বেশী দিন লাগিবে না। মায়া যেদিন বলিবে, সেই দিনই মস্করী তাহাকে তাহার বাড়ী পঁহুছিয়া দিয়া যাইবে। মস্করীর আচার-ব্যবহার আমরাও অনেক দিন জানি। সে কোনও কু মৎলবে যে মায়াকে লইয়া যাইবে, তাহা ত বোধ হয় না। আর যদি তাই হইত, ধাই-মা দু'টাকে লইয়া যাইব কেন? সুতরাং যে কু-মৎলবে মেয়েছেলেকে ঘরের বাহির করে, এখানে সেটা নাই। অন্য কিছু আছে কি না, ভগবান্ জানেন।

[২]

একদিন রাত্র দুপরের পর একখানা বড় নৌকা আসিয়া ধনীদের গোলার ঘাটে লাগিল। ধীরে ধীরে মায়া আসিয়া নৌকায় উঠিল, দাই দু'জন নৌকায় উঠিল, মস্করী উঠিলেন, আরও দু-একটি লোক উঠিলেন, মায়ার দু-একটি বিশ্বাসী চাকরও উঠিল। দুইজন ধাইই জিজ্ঞাসা করিল,—কতদূর যাইতে হইবে? মস্করী বলিলেন, "দেখ মা—সাতগাঁয়ে ত বড় ঘন বসতি, ওখানে ত বড় কারখানা থাকিতেই পারে না। সাতগাঁ হইতে ২।৪ ক্রোশের মধ্যেই একখানি গাঁ আছে, সেখানে অনেক ভাল ভাল কুমার আছে। তাঁ'দের উপরই মূর্ত্তি গড়ার ভার দিয়াছি। গেলেই দেখিতে পাইবে, আমার কথা কতদূর সত্য।" সমস্ত রাত্রি বাহিয়া নৌকা গঙ্গা ত্যাগ করিয়া সরু একটা নদীর ভিতর ঢুকিল। ৫।৭ ক্রোশ বাহিয়া গিয়া সেই ছোট নদীটা দুই ফাঁক হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের নদীটা

সাতগাঁয়ের উত্তর সীমায়। আর একটি নদী—আরও উত্তরে গিয়া পশ্চিম-বাহিনী হইয়াছে, সেই নদী ধরিয়া নৌকা চলিল। নৌকায় আহারাদির সব ব্যবস্থা ছিল, কাহারও কোনও কষ্ট হইল না। সন্ধ্যার সময় নৌকা একটা গ্রামে উঠিল, সকলে নামিল। নিকটেই একটি বিষ্ণু-মন্দির ছিল। তাহার পাশেই একটি একতালা পরিষ্কার বাড়ীতে মায়ার বাসের স্থান দেওয়া হইল। মায়া দেখিল, নিকটেই একটা কুমারের কারখানা। তাহার জানালার নীচেই একজন কুমার তাহার স্বামীর সেই ছবি সামনে রাখিয়া এঁটেলা মাটিতে মূর্ত্তি গড়িতেছে। মূর্ত্তিটি এদিক্ ওদিক্ করিয়া ঘুরাইতেছে; ছবি দেখিতেছে, আর পাতলা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া এঁটেলা মাটী চাচিতেছে। কখনও বা চাঁচিতেছে, কখনও বা কোথাও মাটী দিতেছে, আবার চাঁচিতেছে। মূর্ত্তির দিকে বার বার চাহিতেছে। কখনও তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন হইতেছে; কখনও সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছে। আবার চেঁচাড়ি ধরিতেছে, একবার ছবিখানি দেখিতেছে, আবার মাটীর মূর্ত্তির দিকে চাহিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে কারখানার ঘরটি বন্ধ করিয়া ছবিখানি একটি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া চলিয়া গেল।

জানালায় বসিয়া মায়া সব দেখিলেন। ধাই দেখিল, ধনীর ধাই দেখিল, তাহাদের বিশ্বাস হইল, মঙ্করী যাহা বলিয়াছিল, সব সত্য। সত্য-সত্যই মূর্ত্তি গড়া হইতেছে, সত্য-সত্যই মূর্ত্তিতে প্রাণ আসিবে, সত্য-সত্য মূর্ত্তি কথা কহিবে। ঘর হইতে চলিয়া আসায় তাহাদের মনের যে উদ্বেগ হইয়াছিল, দেখিয়া শুনিয়া তাহার অনেকটা দূর হইল।

পরদিন মায়া কুমারকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, সে যত শীঘ্র মূর্ত্তি করিয়া দিতে পারিবে, ততই তাহারা খুসী হইবে এবং তাহাকে বেশ টাকা-পয়সা বক্‌সীস্ দিবে। কুমার বলিল, "আমার যতদূর সাধ্য আমি শীঘ্র

শীঘ্রই করিব। কিন্তু এ সব ত কলের কাজ নয়। হাঁড়ী গড়া নয় যে চাকা ঘুরাইয়া দিলাম, আর হাঁড়ী গড়া হইল। কত যে ছোট ছোট জিনিস দেখিতে হয়, কত যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কত যে চাঁচিতে হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আর আমরা যে মূর্ত্তি গড়ি, কোনও জায়গায় যদি এতটুকুও দোষ থাকে, আমাদের ঘুম হয় না। যতক্ষণ মূর্ত্তিটি ঠিক না হয়, ততক্ষণ আমাদের ছাড়িয়া দিবার হুকুম নাই। প্রতিমা গড়াও সহজ, কেন না তাহার মাপ আছে, অঙ্কপাত আছে, অনুপাত আছে। মানুষের মূর্ত্তিতে ত মাপ পাইবার যো নাই। তারপর যদি মানুষ দেখিয়া মূর্ত্তি গড়া হয়, সে একরকম হয়, যেমন দেখি তেমনি গড়ি। এ ছবি দেখিয়া গড়া, এ আরও কঠিন। ছবিতে কেবল আড় ও দীঘ্ আছে। মূর্ত্তির আবার একটা বেধ আছে। সেটা ছবি দেখিয়া ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের অনেক কষ্ট করিয়া সেটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। তা মা তুমি এখানে আছ, আমায় সময়ে সময়ে সাহায্য করিও। শুনিয়াছি, আমি যাঁহার ছবি গড়িতেছি, তিনি তোমার স্বামী। যদি সময়ে সময়ে মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিয়া আমায় উপদেশ দাও, কাজ একটু শীঘ্র হইতে পারে।" মায়া কিন্তু যতবার উপদেশ দিতে যান, ক্রমেই আরও দেরী হইয়া যায়। অনেক সময় কুমার তাহার কথার ভাব ঠিক বুঝিতে পারে না, উল্টা করিয়া ফেলে; আবার সেটা শোধরাইতে সময় যায়। এইরূপে মায়া স্বামীর মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সাহায্য করুন, ওদিকে সাতগাঁয়ে কি হইতেছে আমরা দেখিতে যাই।

[৬]

মায়ার চলিয়া যাইবার কথা দু-এক দিনের মধ্যেই সাতগাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ক'ড়ে রাঁড়ী বেরিয়ে গিয়েছে। অনেকেই

বলিল, বৌদ্ধেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা একটা খুব দাঁও পটিয়েছে, একবার ভিক্ষুণী সাজাইতে পারিলেই অনেক টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য হাতে আসিয়া পড়িবে। অধিকাংশ লোকই এই কথা বিশ্বাস করিল। যাহারা বৌদ্ধ নয়, তাহারা বৌদ্ধদের উপর ক্ষেপিয়া উঠিল। রাজা যে বৌদ্ধ, তাহা জানিয়া শুনিয়াও তাহারা বৌদ্ধদের গালাগালি দিতে বিরত হইল না ; এবং তাহাদের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। যাহাদের দু'নৌকায় পা ছিল, অর্থাৎ কতক বৌদ্ধ ও কতক হিন্দু যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দুর দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। সাতগাঁয় ঘোর আন্দোলন,---যেখানে যাও ঐ কথা। বৌদ্ধরা টাকার লোভে বিহারী দত্তের মেয়েটাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিহারী দত্তের লোক এখনও দেবগ্রাম থেকে ফিরে নাই। ইহারই মধ্যে এই ঘটনা! বিহারী তাঁহার সমস্ত নৌকা সজ্জিত করিলেন ও তাহাদিগকে সাতগাঁয়ের সীমানায় হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সব বেণেরাই বিহারীর মত করিতে লাগিল। দুই তিন দিনের মধ্যে অত যে সাতগাঁয়ে নৌকা ছিল, সব যে কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারিল না। পূর্ব্বে নাউপালা, উত্তরে অম্বিকা, দক্ষিণে সরস্বতী সঙ্গম,---এই সব জায়গায় বেণেদের নৌকা জড় হইতে লাগিল, আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইতে লাগিল, গোলায় পল্টন বসিল। সাতগাঁয় বাজার হাট বন্ধ হইল। বেগোছ দেখিয়া অনেক লোক সাতগাঁ ছাড়িয়া পলাইল। রাজাও চুপ করিয়া রহিলেন না। রোজ বাগ্দীদের কুচ-কাওয়াজ হইতে লাগিল। তীরধনু তলওয়ার রাশি রাশি তৈয়ারি হইতে লাগিল। ঠন্ ঠন্ শব্দে সাতগাঁ পূরিয়া গেল। অধিকাংশের ধারণা বৌদ্ধেরা চুরি করিয়াছে. রাজাও এর ভিতর আছেন। তাঁহার পরিষদ্, সভাসদ্ সবাই জানে। কেহ বলিল, রাজার এই ব্যবহার! গৃহস্থ ঝি-বৌ লইয়া ঘর করিতে পারিবে না! রাজা প্রচার করিয়া দিলেন,

বৌদ্ধেরা এ কাজ করে নাই, মেয়েটাই পলাইয়াছে। বৌদ্ধেরা কেহই তাহার বাড়ীর দিকে যায় নাই—প্রায় দুই বৎসর। এ কাজ বৌদ্ধদের নহে। কিন্তু কে শুনে? লোকের মনে একটা ধারণা হইয়া গেলে তাহা দূর করা বড় শক্ত। রাজা যতই বৌদ্ধদের নির্দোষ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, লোকে বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর ঘরে কেরে?" "আমি ত কলা খাইনি!" প্রজা-বিরাগ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাতে বেণেদের নৌকা না থাকায় বিদেশী জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। জিনিস-পত্র দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল। প্রজা-বিরাগ আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তবে হাহাকার পড়িল না, কারণ, ধান-পান সকলেরই ছিল, গোলা-মরাই সকলেরই ছিল, পেটের ভাতটায় আর কাটি পড়ে নাই।

কেহ বলিল, মায়াকে মহাবিহারে লুকাইয়া রাখিয়াছে। গুরুপুত্রের অনেক দিন ধরিয়া মেয়েটার উপর ঝোঁক ছিল, এ তারই কাজ। গুরুপুত্র এই কথার সূচনা শুনিয়া বিহারী দত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা আসিয়া সমস্ত মহাবিহার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যদি তোমার মেয়েকে পাও, তৎক্ষণাৎ লইয়া যাও। আর আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আমি বলিতেছি,—মহাবিহারের লোকে এ কাজের জন্য দায়ী নহে।" তিনি স্বয়ং বিহারীর বাড়ী গিয়া তাহাকে এ কথা বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাজা বুঝাইয়া দিলেন, সেটা নীতিসঙ্গত হইবে না। বিহারী তাঁহাকে আটক করিতে পারে,—অপমান করিতে পারে। গুরুপুত্র বলিলেন,—"ভিখারীর আবার মান-অপমান কি? একটা প্রলয়ের সূচনা দেখিতেছি। যত শীঘ্র মিটিয়া যায় ততই ভাল।" কিন্তু রাজার কথা এবার তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইল। তিনি গেলেন না, কিন্তু বিহারীকে স্বয়ং বা লোকদ্বারা মহাবিহার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে অনুমতি দিলেন। যে ভয়ে রাজা গুরুপুত্রকে যাইতে দিলেন না, বিহারীর বন্ধুবান্ধবেরা ঠিক

সেই কারণেই বিহারীকে মহাবিহারে যাইতে দিল না। উভয় পক্ষই উত্তেজিত হইয়া রহিল। এমন কি, যুদ্ধের উদ্যোগই চলিতে লাগিল।

[৪]

সাতগাঁয়ে ত এইরূপ প্রজার বিরাগ হইল, রাজার উপরও রাগ হইল, সধর্ম্মীদের উপরও রাগ হইল। মাঝে মাঝে ঝগড়া মারামারিও হইতে লাগিল। বাহিরে কি হইল,—সকলেই ছিছি করিতে লাগিল। ছেলে মেয়ে চুরির জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ হইবে বলিতে লাগিল। শত শত লোক বিহারীর বাড়ী আসিয়া, বিহারীকে পত্র লিখিয়া জানাইতে লাগিল যে তাহারাও তাঁহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার ব্যথায় ব্যথী; কেহই ত ছেলেমে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারিবে না। চুরি করিলেই সঙ্ঘের লা তাহারা উত্তরাধিকার পাইবে। সুতরাং এ পাপ সঙ্ঘ যাহাতে উঠিয়া যা তাহাই করিতে হইবে। কেবল একজন জ্যোতিষী, তাঁহার নাম জোগ্নোব তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"বিহারী, তোমার ভয় নাই;— ইহার ফল ব ভাল হইবে। তোমার বিশেষ চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

হরিবর্ম্মার রাজসভায় এ কথা উঠিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?" ভবদেব বলিলেন, "তিনি দশবিধ সংস্কার করে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করেন, তিনি হিন্দু, জাতিতে বৈশ্য হইলেও এখ খাঁটি শূদ্র।" তখন হরিবর্ম্মা বলিলেন, "তবে ত উহাকে সাহায্য ক আমাদের আবশ্যক। বাগ্দী রাজা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করি আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" ভবদেব বলিলেন, "সে কথা সত্য বটে কিন্তু বাগ্দীরা বড় রণবঙ্কা। উহাদের সংখ্যাও দশ পনর হাজার—ভয়ান যোদ্ধা!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, –"উহার নৌকা কত আছে ?"

"জানি না। তবে সাতগাঁয়ে বেশী নৌকা বেণেদের। তাহারা সব
রাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাও আছে, তাহাও সরাইবে।"

"আমাদের সাতগাঁয়ে যাবার রাস্তা—?"

"জলপথে ত আমরা সব জায়গা দিয়াই যাইতে পারি। স্থলপথে
নোর ধার দিয়া, বিক্রমণীপুর হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যাইতে পারি।
র উৎকল হইতেও আসিতে পারি। কাঁকড়া অনেকগুলা দাড়া দিয়া
ন্তু জানোয়ার ধরে, আমরাও তেমনি করিয়া চারিদিক হইতে সাতগাঁকে
রিতে পারি।"

"মাঝে দক্ষিণ-রাঢ়ের শূর রাজা কি করিবে ?"

"কি আর করিবে ? মহারাজও যেদিকে যাইবেন, তিনিও সেইদিকে
ইবেন। তিনি বহু বিষয়ে আপনার নিকট উপকৃত, আপনার মিত্রতায়
় এবং আপনার একান্ত অনুরাগী। বিধর্ম্মীদের উপর আপনার যেমন
া, তাঁহারও তেমনি। আপনি না থাকিলে বাগ্দীরা তাঁহারও ছোট
জ্যটি গ্রাস করিয়া ফেলিত।"

"আপাততঃ কোনও কথায় কাজ নাই, কেবল নৌকাগুলাকে সাজাইয়া
তগাঁ রাজ্যের পাশে পাশে রাখিয়া দাও। পরে দেখা যাক্, কোথাকার
় কোথায় মরে।"

দক্ষিণ রাঢ়েও এ কথা প্রচার হইলে, রাজা রণশূর তন্ন তন্ন করিয়া সব
র লইলেন, এবং হিন্দুদের সাহায্য করাই উচিত বোধ করিলেন। তিনি
সূটের বামুনদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—গঙ্গার উপর,
শষ ঠিক্ ত্রিবেণীতে একটা বাগ্দী,—তায় বিধর্ম্মী রাজা থাকে, সেটা ঠিক্
়। যেরূপে হউক, উহার বিনাশ সাধন করিতেই হইবে।

মহীপাল যখন শুনিলেন, সাতগাঁয়ের বিহারী দত্তের মেয়েকে সধর্ম্মীরা

চুরি করিয়া হইয়া গিয়াছে, তিনি যে বিশেষ খুসী হইলেন তাহা নয়। বলিলেন,--"এরূপ বোকামীটা এখন না করিলেই হইত। নূতন রাজা নূতন রাজা, এখন কি এত বড় একটা লোককে চটাতে আছে! ও মোকান সব দেশে আছে, সব রাজার সঙ্গে ওর কারবার আছে, এক মুহূর্ত্তে বিহারী একটা অনর্থ বাধাইয়া তুলিতে পারে। কাজ নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। যাই হোক, আমাকে বাগ্দী রাজার দিকেই থাকিতে হইবে এবং বিশেষ উদ্যোগও করিতে হইবে।"

[৫]

সাতগাঁয়ে একদিন মন্ত্রণাগৃহে বসিয়া নিভৃতে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,- সাতগেঁয়ের উপর মামদোবাজী করিল,---এ মস্করীটা কে হে? ওটাকে আমরাই লাগাইয়াছিলাম। মেয়েটাকে লইয়া হয় কোন বিহারে, না হ তারাপুকুরে আনিবে। কিন্তু সে এ কি করিল?—মেয়েটাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেল? ভাগ্যিস্ মস্করীর কথাটা লোকে বড় জানে না নহিলে আমরাও হাতে নাতে ধরা পড়িতাম। শ্রীফলচন্দ্র, তুমিই উহাকে আমার কাছে আনিয়াছিলে?

"হাঁ মহারাজ, আমিই উহাকে আনিয়াছিলাম। লোকটা তৈয়ার বলিয়াই আনিয়াছিলাম। এখন দেখছি, আমাদের উপর এক কাঠি লোকটা বিহারে বিহারে বেড়াইত, রাত্রে বিহারেই থাকিত, সাজসজ্জা বিহারেই করিত। আমরা জানিতাম, আমাদেরই লোক।"

"কোথায় খাইত বল দেখি?"

"কোনও দিন খাইতে দেখি নাই।"

"আমার সন্দেহ হয়, ওটা বামুনদের চর।"

সাধুগুপ্ত বলিলেন,—"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমারও সেই সন্দেহই হইতেছে। কোনও দিন উহাকে কোথাও খাইতে দেখি নাই। তাতে বোধ হচ্ছে বেটা বামুন। কিন্তু বামুনরা মেয়েটাকে নিয়া কি করিবে?"

রাজা। "বামুন বেটারা বড় ঝুনো, মেয়েটাকে তারা এখন লুকিয়ে রাখিবে, লোকেরা সন্দেহ করিবে আমাদের উপর। প্রজারা চটিবে আমাদের উপর, আর সধর্ম্মীর উপর। এমন একটা ব'ড়ের চালে কিস্তিমাৎ কখন কি কেহ শুনিয়াছে? যাই হোক, এখন ভিখারিণীদের বলিয়া দেও, তাহারা সাতগাঁয়ের সব জায়গায় ঘুরিয়া মস্করীর সন্ধান লউক। 'সে কার বাড়ী খাইত?' 'কে তাহাকে আশ্রয় দিত?' 'কেমন করিয়া সে মেয়েটাকে সরাইল?' এ সব খবর পেলে কোন না কোন উপায় করা যাইতে পারিবে। আর যদি চরমেই দাড়ায়, রাজা মহীপালের কাছে লোক পাঠান যাক। তাঁহাকে বলা যাক, তিনি যেন দরকার হ'লে আমাদের পক্ষে দাড়ান। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, বোধ হয়, বাঙ্গালায় গুভাজু আর দেবভাজুতে শীঘ্রই লড়াই হইবে। সব গুভাজুরা এক না হইলে রক্ষা নাই, সদ্ধর্ম্ম বাঙ্গালা হইতে লোপ হইবে।" আবার একটু ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অজ্ঞাতকুলশীল লোকের উপর গুরুতর কাজের ভার দিয়া কি অন্যায়ই হইয়া গিয়াছে। শ্রীফলবজ্র তুমি যে এত কাঁচা, তাহা আমি জানিতাম না। লোকটার পূর্ব্বাপর কোন সংবাদ না জানিয়া তাহাকে লাগান ভালই হয় নাই। অথবা গতস্য শোচনা নাস্তি। আচ্ছা, শ্রীফল তুমি উহাকে কোথায় প্রথম দেখিয়াছিলে?"

শ্রীফল বলিল—"আজ্ঞে তাহা আমার ঠিক মনে হয় না। তবে ধরমপুর সঙ্ঘারামেই প্রথম দেখি মনে হইতেছে। ও যে গৃহী, সন্ন্যাসী নয়, সে কথা আমার এখনও মনে লইতেছে না। ছবি হাতে করিয়া ভিক্ষা করিত, সব জায়গায় যাইত।"

শ্রীফলের কথায় রাজা বেশ একটু চটিলেন,--কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া একলা পাইচারী করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন—"বামুনদের লোক, তা হ'লে সে সাতগাঁয়ে নাই, সাতগাঁয়ের বাহিরে কোথায় রহিয়াছে ও মেয়েটাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীফল ত লুইসিদ্ধার দলের উপর চটা; ওই এ কাণ্ডটা বাধায় নাই ত? কিন্তু ঘরের ভিতর আর বিবাদ বাধাইবার সময় নাই। ওর ত বিহারেই জন্ম, বিহারেই কর্ম্ম, বিহারেই লেখাপড়া শিখিয়াছে, পণ্ডিত হইয়াছে। রাজনীতির কোনও ধারই ধারে না। লোকটা নির্ব্বোধও বটে। যাই হোক, এখন যা দেখিতেছি, যুদ্ধ হইবেই। বেণেগুলাকে আটক করা যাক।" বলিয়া কোটালকে ডাকিয়া বেণেদের উপর বেশ নজর রাখিতে বলিলেন,- সে বলিল, "মহারাজ, বিহারীদত্ত ত সাতগাঁয় নাই। সে দুই তিন দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে, দেবগ্রামে যাইব।"

রাজা। বিহারী দেবগ্রামে গিয়াছে,- সেটা ভবদেবের রাজ্য না? কি সর্ব্বনাশ! তবে ত আর ভাবিবার অবসর নাই। আচ্ছা কোটাল, তুমি বাকী বেণেদের উপর নজর রাখ। তাহারা যেন খাবার সামগ্রী সরাইয়া না লইয়া যায়।

বেণেদের নৌকা সব চলিয়া গিয়াছে, আর আসিতেছে না, যাহা লইবার লইয়া গিয়াছে। আর আসিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, আমি সেটা বেশ দেখিতেছি।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোটালকে কয়েকটি হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

[১]

মায়ার কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না; মঙ্করীর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না; ধাইদের কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। খুঁজিতে উভয় পক্ষের কেহই ত্রুটি করিল না। বিহারীও চারিদিকে লোক লাগাইল; রূপারাজাও চারিদিকে লোক লাগাইল। তাহারা ডাঙ্গা দিয়া গেল, কি জল দিয়া গেল, তাহাই ঠিক হইল না। পাল্কীতে গেল, কি ডুলীতে গেল, কি নৌকায় গেল, কিছু স্থির হইল না। যে নৌকায় তাহারা যায়, মঙ্করী সে নৌকা দূরদেশ হইতে অমনি অমনি ঐখান হইতেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। সাতগাঁয়ের লোকের সাধ্য কি, তাহার কোন সন্ধান পায়। মায়া বেশ মনের আনন্দে আছে। মূর্ত্তি তৈয়ার হইলেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। মূর্ত্তি নড়িবে-চড়িবে, কথা কহিবে। সে ক্রমাগত দেখিতেছে,—মূর্ত্তিটি দেখিতে ক্রমেই তাহার স্বামীর মত হইতেছে। তাহারও মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হইতেছে। সে বাপ-মা, সাতগাঁ, গোলা সব ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এক চিন্তায়ই সে মগ্ন আছে।

কিন্তু তার জন্য সারা বাঙ্গলা তোলপাড় হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সব ক্ষেপিয়াছে। প্রলয়কাণ্ড হইবেই হইবে। কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। গুরুপুত্র মিটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা মিটামিটীর বিরোধী। গুরুপুত্র বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত। লুই-সিদ্ধার এখন খবর

নাই। তিনি যে কোথায় আছেন, কেহ জানে না। তবে তিনি বাঙ্গলায় নাই। রাজারা সব এক এক দিকে যোগ দিয়াছে; হিন্দুরা হিন্দুর দিকে, বৌদ্ধেরা বৌদ্ধের দিকে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্রই হিন্দুর পক্ষে; নানা শান্তি, নানা স্বস্ত্যয়ন, নানা উপায়, নানা চেষ্টা করিতেছেন; সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সকল রকমেই পরামর্শ দিতেছেন; সময়ে সময়ে যুদ্ধের জন্যও সজ্জিত হইতেছেন; ব্যূহ-রচনা অভ্যাস করিতেছেন; যুদ্ধবিদ্যার পুস্তক পড়িতেছেন; মহাদেবের ধনুর্ব্বিদ্যা, বিক্রমাদিত্যের ধনুর্ব্বিদ্যা, চতুরঙ্গবলবিদ্যা পাঠ করিতেছেন। কিসে সধর্ম্মের বিনাশ হয়, তাহার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে লাগিয়াছেন। নিজে অস্ত্র-বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন, দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে শিখিতেছেন। বিহারওয়ালারা সব বৌদ্ধদের পক্ষে, কিন্তু তাহাদের ঘরে ঘরে ঐক্য নাই। আসল মহা-যানীরা ত আর সকলকেই উপেক্ষা করে। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্র-যান, সহজযান সব আপন আপন উন্নতিই খোঁজে। সকলে এক হওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তবে এবার ব্রাহ্মণ প্রবল, সকল বৌদ্ধেরই সামাল সামাল পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং মনের দ্বেষ মনেই চাপিয়া সকলে কতকটা পরস্পরের সাহায্য করিতেছেন। তার মধ্যে আবার রূপা রাজা একেবারে ভয়ানক সহজপন্থী, অন্য পন্থা তাঁহার ভালই লাগে না। যা হোক, এবার যেন সব সধর্ম্মী এক হইয়া উঠিয়াছে।

তারাপুকুরে যুদ্ধসভা বসিয়াছে। রাজা বলিতেছেন,—“এই যে বেণেদের বিদ্রোহ, আমি সে বিষয়ে নিরপরাধ। কে যে বিহারী দত্তের মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু সকলেই আমাদের উপর দোষ চাপাইতেছে, আর আমার দেশটা লণ্ড-ভণ্ড করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যখন দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে,

নৌকা, কিস্তী, মালপত্র সব সরাইয়াছে, তখন আর তাহাদের সঙ্গে মিটামিটীর সম্ভাবনা নাই। আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।”

বাগ্দী সেনাপতি বলিলেন,—“মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আত্ম-রক্ষার জন্য আমরা সততই প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন, আমরা নিরপরাধ. তাহারাই অত্যাচার করিতে প্রস্তুত; সুতরাং আমাদের উচিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা না করিয়া, অগ্রসর হইয়া আমরা শত্রুর দেশ আক্রমণ করি।”

রাজা। কিন্তু কে শত্রু, কে মিত্র, এখনও ত সে কথা জানা যায় না।

সেনাপতি। মহারাজ, হিন্দুই শত্রু, বৌদ্ধই মিত্র, এই মনে করিয়া, আসুন আমরা হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করি। হরিবর্ম্মা বড় রাজা; তিনি বেগু নদীর ধারে তাঁবু গাড়িয়া বসিয়া আছেন। আসুন, আমরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিই। তিনি গেলেই হিন্দুদের দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অনেক বাদানুবাদের পর তাই সিদ্ধান্ত হইল। রাজা পাঁচ হাজার বাগ্দী লইয়া তারাপুকুর রক্ষা করিবেন। সেনাপতি দশ হাজার বাগ্দী লইয়া বেগু নদীর দিকে যাইবেন। প্রান্তপালগণ প্রান্ত-দুর্গ সজাগ হইয়া রক্ষা করিবেন।

[২]

বাগ্দীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপা রাজার সেনায় কেবল বাগ্দী; বাগ্দীর সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ বাগ্দী যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, “সব বাগ্দী সাজ।” বাগ্দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর

গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ। আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগ্দী সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

আগডোম বাগডোম ঘোঁড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামনপাড়া।

ডোমদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে সাড়া ক্রমে হরিবর্ম্মার তাঁবুতে পঁহুছিল। তাঁহার লোকের—চরের অভাব ছিল না। তিনি চর পাঠাইলেন; শুনিলেন,—দশ হাজার বাছা বাছা বাগ্দী-যোদ্ধা ও পাঁচ হাজার ডোম লইয়া রূপা রাজার সেনাপতি মেঘা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি জনকতক বিশ্বাসী লোককে বৌদ্ধ ভিক্ষু সাজাইলেন। তাহারা মেঘার তাঁবুতে ভিক্ষা করিতে গেল। মেঘা তাহাদের পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। তাহাদের সেতো করিয়া লইলেন, অর্থাৎ তাহারা তাঁহাকে গুপ্ত পথ দিয়া বেঙ নদীর তাঁবুতে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু মস্করীর ব্যাপারের পর, বাগ্দীরা আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। সুতরাং মেঘাও এই ভিক্ষুদের উপর দুজন বাগ্দীকে চর লাগাইয়া দিলেন। দুই তিন দিনের পর তাহারা খবর দিল যে, এরা ভিক্ষু নয়, ও পক্ষের চর। মেঘা আর কিছু না বলিয়া এক দিন ভোরে তাহাদের ডাকাইয়া বলিয়া দিল, "তোমরা এই দণ্ডেই যদি আমার তাঁবু ত্যাগ করিয়া না যাও, তোমাদের আটক করিব ও বধ

করিব।" তাহারা ভয় পাইল না ; বরং ঝগড়া করিতে লাগিল। মেঘা তখন শূল আনাইল, তাহাদের শূলে চড়াইব বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদের বাসা-ঘর, কাপড়-চোপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। দিতে দিতে দেখা গেল যে, তাহারা ভিক্ষু নহে। তাহারা ভিক্ষুর কাচ কাচিয়াছে মাত্র ; তখন তাহাদের আটক করিয়া কয়েকজন চতুর রক্ষী-সৈন্যের অধীনে সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেঘা মনে করিয়াছিল, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হরি বর্ম্মার ছাউনি ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে; কিন্তু সে শুনিল, তিনি সব খবর রাখেন, আর বেশ প্রস্তুতও আছেন। তখন বাগ্দীরা তাঁহার দেশ লুঠিতে লাগিল। প্রজারা গিয়া হরি বর্ম্মাকে জানাইল। হরি বর্ম্মা ভৈরব নদীর ধারে আসিয়া তাহাদের সামনা হইলেন। আর ভৈরব নদী দিয়া অনেক নৌকা আসিয়া ক্রমাগত লোক নামাইতে লাগিল। মেঘা বেগোছ দেখিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিতে লাগিল এবং পিছনে যাহা কিছু পাইল, ধ্বংস করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সকল নদীতেই হরি বর্ম্মার নৌকা আর বেণেদের নৌকা। নৌকায় কেবল লোক আর অস্ত্র-শস্ত্র। নদী পার হওয়া মেঘার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাগ্দীদের সাহস অসীম, তাহাদের সম্মুখে কেহ আসিতে সাহস করে না,— এলেই সর্ব্বনাশ। এক একবার তাহারা তাড়াইয়া যায়, আর হিন্দুদের কিছু সৈন্য ক্ষয় করিয়া দেয়। যাহা হউক, তাহারা ক্রমে আসিয়া যমুনার ধারে দাঁড়াইল। হিন্দুরাও সেইখানে দাঁড়াইল। কেহই কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। মেঘা রূপা-রাজাকে আরও সৈন্য পাঠাইতে লিখিতে লাগিল। সৈন্যও আসিতে লাগিল। একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাগ্দীদের নৌকা বেণেদের নৌকা তাড়াইতে লাগিল। বেণেরা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে

পারিল না। বাগ্দীরা অনেক খাবার পাইল এবং সেগুলা ডাঙ্গায় তুলিয়া তাঁবুর মধ্যে আনিয়া ফেলিল। কেন না, তাহারা ঠিক জানিত, হরি বর্ম্মার নৌকা আসিয়া জুটিলে তাহারা হারিয়া যাইবে ;—হইলও তাহাই। হরি বর্ম্মার নৌকা আসিলে নাউপালা হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে বাগদীরা মহাতেজে তাহাদের আক্রমণ করিল। তাহারা হরি বর্ম্মার অনেক নৌকা ডুবাইল, অনেক ক্ষতি করিল ; কিন্তু দুই তিন দিনের পর হারিয়া পলাইয়া গেল ও নাউপালায় যাইয়া আরও নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং সাতগাঁর সীমানায় না আসে, তার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। ডাঙ্গায় যুদ্ধের আগে অন্য জায়গায় কি হইতেছে, তাহার খবর লওয়া যাক্।

[৩]

ওদিকে মহীপাল উত্তর-রাঢ় হইতে ৫০০০-এর অধিক সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না ; কারণ কাশীরও অনেক পশ্চিমে তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি যে সৈন্য পাঠাইলেন, তাহাও নূতন, তাহাদের শিক্ষাও ভাল হয় নাই। এ দিকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রণশূর রাজা বাউরি, শুকলি, কোল প্রভৃতি জঙ্গলা জাতি লইয়া প্রকাণ্ড একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সেই সৈন্য লইয়া উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের সন্ধিস্থলে যোগাদ্যার মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করিতেছিলেন। উত্তর-রাঢ়ের সৈন্য নিকটে আসিয়া পঁহুছিলে, তিনি অতর্কিতভাবে উহাদের আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। উত্তর হইতে তখন আর কোনও ভয় রহিল না। তখন ত্বরিত-গতিতে তিনি খড়ী নদী ও বল্লুকা নদী পার হইয়া পড়িলেন। নারিকেলডাঙ্গায় মনসা-মন্দিরের নিকট বাগ্দীরা তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল ;—কিন্তু হটিয়া গেল।

মানাদের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রণশূর জয়লাভ করিলেও আর আগাইয়া যাইতে পারিল না। কারণ, বাগ্দীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, আর ক্রমেই তাহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের বাগ্দী রাজা যদি রণশূরের রাজ্য আক্রমণ করেন, তবে সাতগাঁ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা নাবালক, আর তাঁহার অভি-ভাবকগণ আপনাপন লাভের চেষ্টায় আছেন। সাতগাঁয়ের সাহায্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। রণশূর এই সময়ে এক চাল চালিলেন। তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া দামোদর-ধারে পঁহুছিলেন। বাগ্দীরা তাড়া করিয়া আসিল। তাহারা বেশী লোক আনে নাই। তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করিলেন। বাগ্দীরা কিন্তু মানাদের সব সৈন্য লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। কারণ, ওদিকে নাউপালার খবর ভাল নহে। বরং রাজা পশ্চিম হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া তারাপুকুর রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। রণশূর যখন দেখিলেন, বাগ্দীরা চারি পাঁচ দিন আর আক্রমণ করিল না, তখন তিনি অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে আসিয়া তারাপুকুরের উত্তর কুন্তী-নদীর উত্তরে তাম্বু গাড়িলেন। নদী পার হওয়া বিষম কঠিন। কারণ, ওপারে বাগ্দীদের অগণিত সেনা, রূপা-রাজা নিজে ও মেঘা দুর্গ রক্ষা করিতেছে। হরি বর্ম্মা কিন্তু এখনও আসিয়া পঁহুছান নাই। বাগ্দীরা হারিয়া আসিলেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে আর নৌকা ও লোক না আসিলে, তিনি আর আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে উড়িষ্যায় বেশ শান্তি ছিল। ভুবনেশ্বরে হরি বর্ম্মার যে সৈন্য ছিল, তাহারা আসিয়া সহসা রণশূরের সঙ্গে যোগ দিল। রণশূর কুন্তী পার হইলেন এবং তারাপুকুরের উত্তর দ্বার অবরোধ করিয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ;—চেষ্টা বিফল হইল। শেষে বারুদ দিয়া রণশূর দ্বার উড়াইয়া

দিলেন। দ্বার চাপা পড়িয়া রূপা-রাজা মারা গেল। মেঘা তখন তারাপুকুর ছাড়িয়া সাতগাঁ রক্ষা করিতে গেল। যেখানে প্রজাবিদ্রোহ, সে জায়গা রক্ষা করা দায়। সে পারিল না। রণশূর অনায়াসেই সাতগাঁ দখল করিলেন। মেঘা তখন মহাবিহারে আশ্রয় লইল।

মেঘা দুই তিন মাস ধরিয়া সদর্পে মহাবিহার রক্ষা করিল। রণশূর ধরমপুর বিহার অধিকার করিয়া, তাহার চারিদিকে তাম্বু গাড়িয়া, উত্তর-দ্বার আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু সে খাই পার হইতে পারিলেন না। দুই তিন মাসের পর হরি বর্ম্মা যখন সদলবলে গঙ্গা বহিয়া পূর্ব্ব-দ্বার আটকাইলেন, তখন মেঘা মহাবিহার শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া বিষ্ণুপুর প্রস্থান করিল। গুরুপুত্র মহাবিহারের চাবি হরি বর্ম্মার হাতে দিলেন। হরি বর্ম্মা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, ভবদেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মস্থানে কোন অত্যাচার না হয়, সেটা আপনার দেখা উচিত। আপনি জানেন, আপনার পনর-আনা প্রজা বৌদ্ধ। এটা তাহাদের ধর্ম্মস্থান। চাবি গুরুপুত্রের হাতে ফিরাইয়া দিন। গুরুপুত্র এতদিন রূপা-রাজার রাজ্যে বিহারের অধিকারী ছিলেন; এখন তিনি আপনার রাজ্যে বিহারের অধিকারী; বিহারের ভার তাঁহার হাতে যেমন ছিল, তেমনি থাকুক।"

[৪]

এদিকে মায়া সব ভুলিয়া জীবন ধনীর যে মূর্ত্তি তৈয়ার হইতেছে, তাই দেখিতে লাগিল ও তাহাতেই তন্ময় হইয়া রহিল। ক্রমে পক্ষ মাস অতীত হইয়া গেল, মূর্ত্তি ঠিক জীবন ধনীর জীবন্ত মূর্ত্তির মত দেখাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার গায়ে রঙ দেওয়া হইল। রঙটি

ঠিক জীবন ধনীর যে রঙ ছিল,—তাই। কেমন করিয়া কুমার সে রং ফলাইল, সেই ত চমৎকার। মায়াও বলিল, "এই রঙ", ধাইরাও বলিল, "এই রঙ"। উজ্জল শ্যামবর্ণ হইতে একটু মাট রঙ। যখন রঙ ফলান হইল, চুল বসান হইল, মূর্ত্তি ঠিক হইল, তখন উহাতে ঘাম-তেল দেওয়া হইল। মূর্ত্তি যেন ঘামিয়াছে।

এক দিন মস্করী আসিলেন। মস্করী বেশ ত্যাগ করিলেন; দেখা গেল, তিনি একজন বেশ সুপুরুষ। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। শরীর বিলক্ষণ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতার গোছা ধব ধব করিতেছে। পুরুষটি একটু দীর্ঘচ্ছন্দ। গোঁফ-দাড়ী একেবারে কামান। তাঁহার সঙ্গে আর একজন আসিয়াছেন,—তাঁহার বয়স আরও অধিক। মাথায় একগাছিও কাল চুল নাই। শরীরের লোমগুলি পর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া এখনও লোল হয় নাই। চক্ষুর দীপ্তি যুবা পুরুষের মত, তবে চক্ষু দুটি একটু বসা। ইহাঁর বয়স ৯০ বৎসর হইবে। তান্ত্রিক-কর্ম্মে ইনি অদ্বিতীয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তাই মস্করী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। বিশেষ এটি ত শূদ্রের কার্য্য। মস্করী ভাল ব্রাহ্মণ, সে তাহা করিবে কেন? তাই তিনি একজন সাতশতী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। ইনি মায়ার পৌরোহিত্য করিবেন। ব্রাহ্মণের নাম বিধুভূষণ। ইহাঁর সাতশতী-গাঞী-এর নাম ফরফর; পুরা নামটি বিধুভূষণ ফরফর। লোকে ইহাঁকে ফরফর ঠাকুর বলিয়াই ডাকে। নব্বই বৎসর বয়স হইলেও ইনি ভারী হন নাই; ফরফর করিয়াই বেড়ান। ইহাঁর কাজ করিবার ক্ষমতার কিছুই হানি হয় নাই।

মস্করী ইহাঁকে আনিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, জীবন ধনীর যে প্রতিমা গড়ান হইয়াছে, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে, তাহাকে কথা

কহাইতে হইবে, ব্রাহ্মণও তাহারই উদ্যোগে আছেন। প্রথমতঃ কত জিনিসপত্র চাই, তাহার হিসাব হইল। সব জিনিস বিধু-ফরফর নিজে দেখিয়া লইতে লাগিলেন, কোনও জিনিসে কোনও ত্রুটি থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেছেন। গব্যঘৃত হোমের জন্য টাট্‌কা আনান হইল। বিল্বদলগুলিতে দাগ থাকিবে না, ছেঁদা থাকিবে না, সবগুলিই ত্রিপত্র হইবে, বেশী পাকা হইবে না, বেশী কচিও হইবে না। এমন বিল্বদল বাছিয়া বাছিয়া এক হাজার সংগ্রহ করা হইল। যজ্ঞডুমুরের এক হাজার আগডাল সংগ্রহ করা হইল। প্রত্যেকটিকে ঠিক বিতস্তি-প্রমাণ করিয়া কাটিয়া লওয়া হইল, আর তাহার আগায় দু-একটি কচি পাতা রহিল। পুষ্পপাত্রে ফুল সাজান হইল। তিন চার রকম চন্দন ঘষা হইল। বেলকাঠ ও তুলসীকাঠ ঘষিয়া চন্দন করা হইল। আলো-চাল, যব, তিল, আপাঙের গাছ, আপাঙের শিকড়, আপাঙের শীষ সংগ্রহ করা হইল।

প্রথম দিন বিধুভূষণ প্রাতঃকাল হইতেই পূজায় বসিলেন; শিবের ও কালীর পূজা করিলেন। সর্ব্বত্রই পূজা নিরুদ্বেগে শেষ হইল। কোন বাধা-বিঘ্ন বা অভাব হইল না। বেলা দুপরের পর ব্রাহ্মণ হোমে বসিলেন, একটি একটি করিয়া গণিয়া সমস্ত ত্রিপত্রগুলি গাওয়া ঘিয়ে ডুবাইয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। এক হাজার আহুতি শেষ হইলে তিনি যজ্ঞডুমুরের পল্লব ধরিলেন। সেগুলি একটি একটি করিয়া গণিয়া হোম করিলেন। যখন সব শেষ হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে উঠিয়া পূর্ণাহুতি দিলেন এবং তার পর মায়ার কপালে হোমের ফোটা দিয়া নিজে জলযোগ করিলেন।

আশায়, আনন্দে, ভয়ে, ভরসায় মায়ার দিনটি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা আরম্ভ হইল। ষোড়শ-

উপচারে হর-পার্ব্বতীর পূজা হইল। তাহার পর জীবনের প্রতিমার পূজা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ষোড়শোপচারে জীবনের পূজা করিল; তাহার পর তাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিল। সে দিন এই পর্য্যন্ত।

[৫]

তাহার পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাগারা বাজিতে লাগিল। স্নান-আহ্নিক করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিলেন, ২।৩ দণ্ড নিশ্চল-নির্ব্বিকারভাবে ধ্যান করিয়া জপে বসিলেন। জপ শেষ হইলে রাশি রাশি ধূপ-ধুনা আগুনে দিতে বলিলেন। ধূপ ও ধূনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল, ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দীর্ঘদেহ গরদের কাপড়ে ঢাকিয়া জীবন ধনীর মূর্ত্তির বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্থ ধনিনঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ—

মায়া নিকটেই বসিয়া ছিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিমা নড়িতেছে।

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিল—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ জীব ইহ স্থিত ঃ—

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ বাঙ্মনঃশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণাঃ সুখং

চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা—বলিয়া ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল। মায়ার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন ;—তিনি জীবিত। মায়ার ইচ্ছা,—তাহার স্বামী কথা কন। সে ব্রাহ্মণকে কথা কহাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মস্করীর দিকে চাহিল। মস্করী ইসারা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল ; প্রতিমার মুখে হাত দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। ধূপ-ধূনার ধোঁয়ায় ও গন্ধে ঘর পূরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্র পড়া হইল। প্রতিমার ঠোঁট দুটি তখন খুলিয়া গেল। বোধ হইল যেন, কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, "এই মায়া তোমার স্ত্রী, এ পতি বই আর জানে না। তোমার পূজায়, তোমার স্মরণে জীবন ধরিয়া আছে। ইহাকে কিছু উপদেশ দাও, যাহাতে ও জীবনের অবশিষ্ট অংশ সুখে থাকিতে পারে।" ঠোঁট আরও নড়িতে লাগিল,—শেষে স্পষ্ট শুনা গেল, "মায়া, পোষ্য-পুত্রে ভাল হবে।" ঠোঁট দুটি বুজিয়া গেল। ধাইরা বলিল, ঠিক যেন জীবনের স্বর, তবে যেন একটু নাকি সুরে কথা কহিল। মায়া ত মূর্চ্ছিত,—সংজ্ঞাহীন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "স্বামীর কথা মাথায় করিয়া লইলাম।" সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আবার বলিল, "তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" মায়া এমন স্থিরভাবে এই কথাগুলি বলিল, বোধ হইল যেন, তাহার বুকের একটা পাথর বসান ছিল, সেটা সরিয়া গেল ; যেন তাহার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বোঝা ছিল, সেটা নামিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর সকলে চলিয়া গেলে মস্করীকে ডাকিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছেন, আর একটিবার একটু কষ্ট করুন। এটি মাটীর মূর্ত্তি—এইরূপ একটি

অষ্ট-ধাতুর মূর্ত্তি করিয়া দিন, আমি তাহা আমাদের গোলাবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিব ও স্বামীর আজ্ঞামত একটি পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে লালন-পালন করিব।” হঠাৎ যেন মায়ার মুখ থেকে সেই পুরাণ বিষাদের ছায়াটা সরিয়া গেল। তাহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে যেন একটা নূতন স্ফূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

মস্করী বলিল, “আচ্ছা, আমি তাহাই করিয়া দিব। কিন্তু এখানকার ত কার্য্য শেষ হইয়া গেল; এখন আমরা গোলাবাড়ী ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করি।”

মায়া বলিল,—“অষ্ট-ধাতুর মূর্ত্তি কবে হবে?”

মস্করী বলিল,—“সেইখানেই হবে।”

[৬]

মহাবিহারের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার উপর একটা প্রকাণ্ড পরিষ্কার ঘাসের জমীতে একটা প্রকাণ্ড পাল খাটান হইয়াছে। পালের নীচে দক্ষিণ দিকে ঠিক মাঝখানে একখানা সোনার সিংহাসন, তাহার উপর চাঁদোয়া; আর দুই পাশে দুইখানা রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের নীচে ও তাহার সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গালিচা পাতা, গালিচারও উত্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সতরঞ্চি পাতা, তাহারও উত্তরে মাদুর, চট ইত্যাদি পাতা। চারিদিকে পাহারা; ঢাল-তলবার লইয়া অনেক লোক পাহারা দিতেছে। বেলা তিনটার সময় তথায় পাহারাওয়ালা ভিন্ন আর একটিও লোক ছিল না। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, অসংখ্য লোক নানা দিক্ হইতে আসিয়া কেহ গালিচায় কেহ সতরঞ্চে কেহ বা মাদুরে বসিতে লাগিল। বহুসংখ্যক নৌকা গঙ্গার ও-দিকের কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। নৌকা নানারূপে ঘোরাল রঙ দিয়া সাজান। সবগুলিতেই ধ্বজা, পতাকা উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি বড় নৌকা পার হইয়া মহাবিহারের ঘাটে লাগিল। ঘাটে সকলের নীচের ধাপ পর্য্যন্ত লাল বনাত পাতা ছিল। নৌকা হইতে সিঁড়ি বহিয়া তিন জন লোক নামিয়া বাঁধা ঘাটের ধাপে উঠিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে "মহারাজের জয়" "মহারাজ হরি বর্ম্মার জয়" "বঙ্গাধিপের জয়"-ধ্বনি উঠিল। তাহাতেই বুঝা গেল যে, যাঁহার মাথায় মুকুট ও যাঁহার গায়ে নানা হীরা-মতি জড়ওয়া-গহনা, ঘোরাল রঙের রেশমী কাপড়, তিনি মহারাজ হরি বর্ম্মা। তাঁহার সহকারী একজন গরদের ধুতি ও চাদর পরিয়া আসিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবদেব ভট্ট। আর একজন রাজবেশধারী—তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা।

রাজা সিঁড়ির ধাপে উঠিবামাত্র সৈন্যগণ দুইধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। ভাটেরা রাজার যশোগান করিতে লাগিল। সকলেই মাথা নোয়াইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিল। ঘাটের উপরের চাতালে সাতগাঁবাসীরা সকলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়াছিল—সকলে রাজাকে নমস্কার করিল। রাজা কাহারও সঙ্গে একটি কথা কহিলেন, কাহাকেও "ভাল আছেন" জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকেও একটু হাসিয়া আপ্যায়িত করিলেন, কেহ বা প্রণাম করিতে আসিলে তাহার পিঠে হাত দিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহারী দত্তকে দেখিতে পাইয়া রাজা হাত বাড়াইয়া দিলেন, সে তাঁহার হাত ছুঁইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। এইরূপে সকলকে সম্ভবমত আপ্যায়িত করিয়া রাজা স্বর্ণসিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। ভবদেব ও রণশূর দুইখানি রূপার সিংহাসনে বসিলেন। রাজা ভবদেব ভট্ট মহাশয়কে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। ভবদেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

"মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব এবং তাঁহার মিত্রবর্গ এই সাতগাঁ রাজ্য যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ দেবের রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মহারাজাধিরাজ প্রজাদিগকে অভয়দান করিতেছেন যে, যদি তোমরা শান্তভাবে থাকিয়া আপন আপন জীবন যাপন কর, তোমাদের ধন, মান, দেহ, মন তিনি প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। যে সকল বাগ্দীরা যুদ্ধ করার জন্যভূমি ভোগ করে, তাহারা যদি নূতন রাজার সহিত সেই বন্দোবস্তে চলে, তাহাদের ভূমিতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যাঁহারা যে ধর্ম্মেই থাকুন, যদি রাজার রাজবিধি মানিয়া চলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে নূতন রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ যে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভার যাঁহাদের উপর আছে, তাঁহাদের উপরেই থাকিবে। তাঁহারা যেমন রূপনারায়ণের অধীনে থাকিতেন, আমাদের মহারাজের অধীনে তেমনই থাকিবেন। তাঁহারা যে ৫০টি গ্রাম ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই করিবেন ; তবে তাহার মধ্যে ৩০টি গ্রাম আমাদের পাট্টা করিয়া দিতে হইবে। আমরা তাহার যথাযোগ্য রাজস্ব মহাবিহারের অধ্যক্ষকে দিব। আর যত দিন মিত্রবর্গের মধ্যে সাতগাঁ রাজ্য ভাগ না হয়, তত দিন শ্রীযুত বিহারী দত্ত এই রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তাহার পর ভাগ হইয়া গেলেও, আমাদের মহারাজাধিরাজ যে অংশ পাইবেন, তাহার সম্পূর্ণ ভার বিহারীর উপরই দেওয়া থাকিবে। এখন হইতেই তোমরা বিহারী দত্তকে রাজার প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিবে এবং তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান করিবে। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার মিত্রবর্গ টীকা লইবার জন্য শ্রীযুত বিহারী দত্তকে আহ্বান করিয়াছেন।"

পরে কয়েকজন ভাট গিয়া যশোগান করিতে করিতে বিহারীকে

ভুজন রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রথমে হরিবর্ম্মদেব ও পরে রণশূরদেব উহার কপালে কুঙ্কুম ও চন্দনের টিপ পরাইয়া দিলেন।

[৭]

বিহারীর রাজ-পদ লাভে বেণেরা মহা আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। সাতগাঁয়ের সকল লোকই তাহাতে যোগ দিল। সাতগাঁ ভাটেদের প্রধান জায়গা। তাহারাও মহা আনন্দে তাহাতে যোগ দিল।

এমন সময়ে খবর আসিল যে, বিহারী দত্তের কন্যা মায়া তাহাদের গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খবর শুনিয়া বিহারীর ত আনন্দ ধরে না। তিনি মহারাজাধিরাজ, মহারাজ ও ভবদেব ভট্টের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! মঙ্গলই মঙ্গলের অনুবন্ধী। এত দিনের পর আমার কন্যা আপন বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন, আমি গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।"

ভবদেব বলিলেন, "সে ত সাতগাঁয়েরই মেয়ে, এই উৎসবের সময় তাহাকে এখানে আনিতে দোষ কি?" সকলেই অনুমতি দিলে মহারাজাধিরাজ তাহাকে সভাস্থলে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সেই মস্করী। মস্করীকে দেখিয়াই ভবদেব তাহাকে চিনিলেন। সে চতুর্থ-খণ্ডের পাড়া, পিশাচ-খণ্ডের গাঞী। মস্করীকে ডাকিয়া তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, মস্করী বলিল, "ভিখারিণীরা মায়াকে ভুলাইয়া যখন সঙ্ঘে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, রূপা-রাজা উহাকে গুরুপুত্রের শক্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর বিহারী ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, সে সময়ে আমি সাতগাঁয়ে আসিয়াছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। সে একান্ত পতিপ্রাণা। পতির ছবি সে প্রত্যহ পূজা

করে, পতির কাপড়, চাদর, জুতা সে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। আমি মস্করী সাজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পাছে সন্দেহ করে, তাই বিহারে বিহারেই থাকিতাম। মায়াকে স্বামীর সহিত দেখা করাইব,—কথা কহাইব বলিয়া তাহাকে লইয়া পিশাচ-খণ্ডে লুকাইয়া রাখি। তথায় ভাল ভাল কুমার আনাইয়া তাহার স্বামীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাই;—তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাই। প্রতিমা কথা কহিয়া বলে,—"মায়া, পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর।" স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি মায়ার বেশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমি এমন পতিভক্তি দেখি নাই!"

মস্করী অথবা পিশাচ-খণ্ডের গাঞ্জীর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই মায়াকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্থির হইল, বিহারী সাতগাঁ রাজ্যে শান্তি-স্থাপনের পরই নিজে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে,—মায়াকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইবে। পোষ্যপুত্র গ্রহণ ভবদেবভট্টের পদ্ধতিমতে হইবে। প্রায় সন্ধ্যা হয়—হয়, এমন সময়ে সভাভঙ্গ হইল। রাজারা নৌকায় উঠিলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিল, "মহারাজ হরি বর্ম্মার জয়", কেহ বলিল, "রণশূরের জয়", কেহ বলিল, "বিহারী দত্তের জয়", কেহ কেহ বলিল, "ভবদেবের জয়", কেহ কেহ বা বলিল, "জয় মায়া দাসীর জয়!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

[১]

মহাবিহার ও গঙ্গার মধ্যস্থলে মহাসভা হইয়া গেল, রূপা রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ ও হরিবর্ম্মার হিন্দুরাজ্য স্থাপন হইয়া গেল। বিহারী সাতগাঁ রাজ্যের সমস্ত ভার পাইল, লোকে খুব খুসী হইল; কিন্তু অনেকের আবার এই সকল ব্যাপারে মর্ম্মান্তিক হইল। বৌদ্ধ যাহারা ছিল, তাহাদের ত রাজা গেল, রাজ্য গেল, দেশে যে দব্‌দবা ছিল, সেটি গেল, মহাবিহারও গতপ্রায়, তাহারা বড় খুসী হইতেই পারে না।

এখন আবার এক সভা হইবে। সেটা রাজার খাস সভা, তাহাতে সাতগাঁ-রাজ্য বাটোয়ারা হইবে। যাহারা হরিবর্ম্মার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজ্যের যাহাতে সুশৃঙ্খলা হয়, তাহা করিতে হইবে। আর মোট কথাটা, বৌদ্ধেরা যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক লেখাপড়া চাই, অনেক সন্ধান লওয়া চাই, অনেক পরামর্শ চাই, অনেক বিবেচনা চাই। সুতরাং কিছুদিন সকলকে সাতগাঁয়ে থাকিতে হইবে। এই কিছু দিনের মধ্যে তারাপুকুরের কেল্লাটা নূতন করিয়া গড়া চাই। ছাউনি, বাউতপাড়া সব নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করা চাই। চারিদিকে লোক লাগিয়া গেল। সাতগাঁ বেশ সরগরম রহিল।

এই দীর্ঘকাল মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মা, যদিও বয়স হইয়াছে, মাছ ধরা, কুমীর মারা, হাঙ্গর ধরা, শীকার করা, বাজ পাখীর খেলা করা, এই সব

লইয়াই রহিলেন। সাতগাঁ ও মহাবিহারের সম্মুখে গঙ্গা খুব চওড়া, একটা সমুদ্রের খাড়ীর মত, মাঝে মাঝে বালির চড়া। দু'একটা চড়ায় মাটি আছে, আর তার উপর নিবিড় জঙ্গল ;—আস্‌সেওড়া, পটপটী, বন-ঝাউ, নানা রকমের লতা, কাঁটাগাছ, কাঁটানটে, কন্টিকারি, কালকাসন্দা, চাক্ চাকন্দা, শ্যালকাঁটা, ফেনী-মনসা, গোয়ালে-লতা। এই সবের মধ্যে পা বাড়ান যায় না। আবার ওপারে দূরে সুন্দরবন—সুঁদরী গাছ, বেত গাছ, গোলপাতার গাছ, সঙ্গে সঙ্গে নোনা, ভাটুই, গম্ভীরা, জীবন, জিউলী সেও খুব ঘন, তার নীচেও আবার ঘন বন। মহারাজাধিরাজের ভারি আমোদ—বালির চড়ায় কুকুর ছাড়িয়া দেন, তাহারা খরগোস, শজারু, গোসাপ, গন্ধগোকুলা ধরিয়া লইয়া আসে। খরগোসও ছোটে, পিছু পিছু কুকুরও ছোটে—দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। আবার দু'মিনিট পরে কুকুরটা খরগোসটিকে দাঁতে ধরিয়া মহারাজাধিরাজকে পুরস্কার দেয়। মহারাজাধিরাজ কুকুরের গায়ে হাত দিয়া তাহাকে আদর করিলেন, সে আবার আর একটা কি দেখিয়া ছুটিল। তাহার আদর দেখিয়া আর পাঁচটা কুকুরও আপন আপন বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ছুটিল। একবার পাঁচ সাতটা কুকুরে একটা নেক্‌ড়ে বাঘকে তাড়া করিয়াছে, সে চারিদিকে ছুটিতেছে। কোথাও পরিত্রাণ নাই দেখিয়া, যেদিকে রাজা ছিলেন, সে সেই দিকে ছুটিল। রাজা ও শীকারীরা তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া প্রস্তুত হইলেন ; কিন্তু দূর হইতেই মহারাজাধিরাজের এক তীরেই তাহার জীবন শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানা রকমের পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায় ; কত রকম শব্দ করে, গান করে, খেলা করে ; আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ এক এক দিন ঐ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইত,

বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্ চিল্ চিল্ চিল্ শব্দ করিত, এক একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার আর একটার উপর ধাওয়া করিত। নীচে লোক পাখী কুড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিত। মরা পাখী কতক মাটিতে পড়িত, কতক জলেও পড়িত, কিন্তু একটিও নষ্ট হইত না। কাছে হইলে লোকে জলে পড়িয়া সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত, আর দূরে হইলে ডিঙ্গী ত ছিলই।

সকালবেলা নদীর ওপার জঙ্গলের নীচে চড়ার উপর বাতী-শালকাঠের মত কি পড়িয়া থাকিত। যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে, বাহাদুরী কাঠ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, সেগুলা কুমীর, নানাজাতীয় কুমীর। মহারাজাধিরাজ কুমীর শীকারের জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে বর্শা, বল্লম, কোঁচা আর চতুর কয়েকজন শীকারী। কুমীরের গায় বল্লম বসে না। তাহাদের চোখে না হয় মুখে বিঁধিতে হয়। রাজা অনেক ধস্তাধস্তির পর কুমীরের মুখে বর্শা চালাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড কুমীর এক মোচড়ে বর্শা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঝুপ্ করিয়া জলে পড়িল; কিন্তু ভাঙ্গা বর্শা বাধিয়া থাকায় তাহার নড়াচড়ার পক্ষে বড়ই উৎপাত হইতে লাগিল। একটু চাড় পাইলেই মুখে লাগে আর যন্ত্রণায় কুমীর অস্থির হয়। শেষে সে ভাসিয়া উঠিল—অমনি প্রকাণ্ড কাছি আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। কুমীর মহাশয় মরিলেন, পেট চিরিয়া তাঁহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করা হইল, পেটের মধ্যে তূলা ও বিচালীর কুচি পূরিয়া দেওয়া হইল,—আবার সেলাই করা হইল। তিনি বহুকাল ধরিয়া রাজবাড়ীর দেউড়ীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শব্দভেদী বাণের তখন খুব চলন ছিল। আর রাজা হরিবর্ম্মা শব্দভেদী বাণে খুব দক্ষহস্ত ছিলেন। নৌকায় বসিয়া যেই শুনিলেন, একটা শুশুক কি ঘড়েল ভুস করিয়া উঠিল, অমনি রাজার বাণ চলিল। সে বাণ অব্যর্থ।

শুশুককে মরিতেই হইবে। আর শীকারীরা যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে রাজার সাম্‌নে আনিয়া উপস্থিত করিবে। শুশুকের তেল বাতের বড় ঔষধ ছিল।

হাঙ্গর এক ভয়ানক জন্তু। দেখিতে বড় আড় মাছের মত, মুখের গোড়া থেকে ছ'খানা হাড় বাহির হইয়াছে, হাড় ছ'খানার ছ'ধারে ছ'সারি করিয়া দাঁত; উপর-নীচের চারি সারি দাত একত্র হইলে চারখানা করাতের কাজ করে। হাঙ্গরে কাটিলে তাই করাত-কাটার মত পরিষ্কার কাটা দেখা যায়। রাজাধিরাজের শব্দভেদী বাণে অনেক হাঙ্গর, আপন হাঙ্গর লীলা সংবরণ করিয়া, বহুসংখ্যক নিরীহ মনুষ্য ও জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকার কারণ হইয়াছিল।

নৌকায় বাচখেলা মহারাজের আর এক আমোদ ছিল। বড় বড় জাহাজ লইয়া বাচখেলা হইত। এ নৌকা পলাইতেছে, আর একখানা তাহার পিছন লইয়াছে। আর একখানা প্রথমখানাকে রক্ষা করার জন্য যাইতেছে। একখানা ঘুরিয়া মহাবেগে আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়খানার মধ্যে দাড়াইয়া প্রথমখানার পলাইবার পথ করিয়া দিতেছে। জল তোল পাড় হইয়া যাইতেছে। জলজন্তু সব ভয়ে পলাইতেছে ও ভাসিয়া যাইতেছে। জলজন্তুর পিছনে আবার ডিঙ্গী, পান্‌সী, বর্শা, বল্লম লইয়া ধাওয়া করিতেছে।

এই সব লইয়া মহারাজাধিরাজের দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। যে কেহ দেখা করিতে আসিত, তাহাকেই আপ্যায়িত করিতেন, তাহার কি বলিবার আছে, শুনিতেন; অনেক সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া সিপাহীদের কুচকাওয়াজ দেখিতেন। একদিন তারাপুকুরে মেরামত দেখিতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সর্ব্বদাই সাতগাঁয়ে অলিগুলী কুচ করিয়া যাইত। শুধু যে সৈন্যরাই যাইত, এমন

নহে। নৌকার মাঝিরা, খালাসীরাও সাজিয়া কুচ করিতে যাইত। যখন ভবদেব আসিতেন, মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেন।

মহারাজ রণশূর সর্ব্বদাই মহারাজাধিরাজের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি অতি বলিষ্ঠ, সুপুরুষ ও বেশ মিষ্টভাষী। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। শীকারে তিনিও খুব মজবুত; কিন্তু সে মজবুতি সাকরেদী- ওস্তাদী নয়। মহারাজাধিরাজ, রণশূরকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি কাছে থাকিলে খুসী থাকিতেন। দু'জনের বেশ ভাব হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ যেখানে যাইতেন, রণশূরও সেইখানেই যাইতেন। যে সব খেলার কথা বলা হইল, সর্ব্বত্রই দু'জনে থাকিতেন। জলে খেলা রণশূরের বড় একটা অভ্যাস ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি বেশ পাকিয়া উঠিলেন। তাঁহারও বাজ পাখী ছিল, শীকারী কুকুর ছিল। তিনিও তীর-ধনুক লইয়া শীকার খেলিতেন, বর্শা-বল্লম ব্যবহার করিতেন।

[২]

আর ভবদেব কি করেন? তিনি একখানি বড় বজরা লইয়া ত্রিবেণীর পাশে সপ্তর্ষিঘাটে বসিয়া থাকেন। বজরায় একটি আপিস; একজন বৃদ্ধ কায়স্থ, তাহার নীচেও অনেকগুলি কায়স্থ, সবাই নিরন্তর ঘাড় গুজিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ভবদেবের কাছে দিনরাত্রি লোক আসিতেছে। বিহারী প্রায়ই আসিতেছেন ও পরামর্শ করিতেছেন। গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোনও কাজেই ভবদেব বজরা হইতে নামেন না। কেবল একদিন নামিয়াছিলেন ব্রহ্মপুরীতে নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য, একদিন বিহারীর বাড়ী পায়ের ধূলা দিবার জন্য, আর একদিন মহাবিহারের ঠাকুর দেখিবার জন্য।

ভবদেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, হেরুক ও বজ্রবারাহীর মূর্ত্তি অত ভয়ানক, তাই স্বচক্ষে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিয়া "নগ্নদর্শন" অর্থাৎ নেংটা লোক দেখিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত করেন। স্মৃতিকারেরা বলেন, নগ্ন বলিতে বৌদ্ধও বুঝিতে হয়।

যাহার যাহা বলার আছে, সকলেই ভবদেবের কাছে বলিয়া যাইতেছে। ভবদেব সব কায়স্থের দ্বারা লিখাইয়া রাখিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বড়ই মুস্কিল। অধিকাংশ কায়স্থই বৌদ্ধ। অনেকেই বজ্রযান ও সহজ-যানের বই লিখিয়াছেন। সুতরাং নিজের কায়স্থ লইবার সময়ে ভবদেবকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের ব্রাহ্মণ গাঁঞীদের গ্রাম হইতে অতি গরীব কায়স্থ আনিয়া মুহুরী করিয়াছিলেন। যাহাদের অন্যরূপে জীবিকানির্ব্বাহের কোনওরূপ সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের একেবারে লয়েন নাই। ইহারাও প্রাণপণে তাঁহার কর্ম্ম করিয়াছে, কখনও গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই। উহাঁকে তাহারা আপনাদের হর্ত্তা কর্ত্তা-বিধাতা বলিয়া মনে করিত। উহাঁ হইতেই তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পায়, ভবদেব তাহাদের এরূপ অর্থ দিতেন না।

ভবদেবের কাছে ব্রাহ্মণেরা আসিতেন বৃত্তির জন্য দক্ষিণার জন্য, ভাটেরা আসিত ত্যাগ পাইবার জন্য, আচার্য্যেরা আসিতেন পূর্ণপাত্রের জন্য, বেণেরা আসিত ব্যবসার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, সৈন্যেরা আসিত জমী ও জায়গীরের জন্য, জুগী-জোলা-তাঁতিরা আসিত কাপড় বোনার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, তেলীরা আসিত ঘানির ব্যবস্থা করিবার জন্য, বৌদ্ধেরা আসিত তাহাদের উপর অত্যাচার না হয়—সেইটা প্রার্থনা করিবার জন্য। তিনি যাহার সঙ্গে যেমন করা উচিত, তেমনি ব্যবহার করিতেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইত যে, ভবদেব তাহাকে ভালবাসেন।

ভবদেবেরও দিনরাত অবসর ছিল না। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাই করিতেন। নইলে তাঁহার খাওয়া শোওয়ার অবসর ছিল না। যখন অন্য কেহ থাকিত না, তখন তিনি, কায়স্থেরা দিনভর কি লিখিয়াছে, তাহাই শুনিতেন ও তাহার উপর আপনার যা বলার ছিল, লিখাইয়া রাখিতেন।

বিহারীরও অবসর বড় কম। তাহার কাছেও ঢের লোক। তাহার পোষ্যপুত্র লওয়া হইতেছে না। আগামী খাস-দরবারের জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাহার একটা বেশী কাজ ছিল, তাহাকে ঘুরিয়া খবর যোগাড় করিতে হইত। কেন না, রাজা ও ভবদেব তাহার কথাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

[৩]

পচিশ ছাব্বিশ দিনের পর হরিবর্ম্মার বড় নৌকায় সভা বসিল। মহা-রাজাধিরাজ, মহারাজ, ভবদেব ও বিহারী এই চারিজনেই সভা। আর লোক আবশ্যকমত আসিতেছে, আপনার কাজ করিয়া দিয়া যাইতেছে। প্রথম উঠিল রাজ্য-ভাগের কথা। হরিবর্ম্মা বলিলেন, "রণশূরের সম্পোষ্য-মত দামোদরের ওপারের যত গ্রাম উনি চান, দিয়া দাও। কেমন হে ভায়া, তাতে তোমার মত হবে ত? রণশূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত গ্রাম আছে?" উত্তর হইল, "২৩৮ খানা, তাহার মধ্যে তোমাকে ১৫০ খানা গ্রাম দেওয়া যাইতেছে। কেবল কয়েকটা ঘাটী আগলাইয়া রাখিবার জন্য ৮৮ খানা গ্রাম আমি রাখিতেছি। তোমার সঙ্গে আবার ঘাটা কি? কিন্তু উত্তরে ১১টা ঘাটী আছে। ফি ঘাটীতে আটটা করিয়া ৮৮ খানা গ্রাম আমি রাখিলাম। নহিলে জানত, বিষ্ণুপুর আছে, মহীপাল আছে, এরা

যদি ঘাটী খোলা পায়, আমারও ক্ষতি করিবে, তোমারও ক্ষতি করিবে।" রণশূর ইহাতে বেশ খুসী হইয়া গেলেন। তাহার পর রূপা রাজার পরিবার বর্গের প্রতিপালন। সে একটি বই বিবাহ করে নাই, তাহারও সন্তান সন্ততি হয় নাই। রাজা তাহাকে হাজার টাকা মাসিক দিবেন, আর তাহাকে গঙ্গার ওপারে চাকদহের কাছে বাস করিতে দিবেন। সে সেখানে ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারে। ভবদেব বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে মহারাণী অধিরাণীর আপত্তি আছে। তিনি বলেন,—তিনি কোন বৌদ্ধক্ষেত্রে বাস করিবেন।" "বেশ ত তিনি নালন্দা, বিক্রমশীল, বুধগয়া, কুশীনগর, ঋষিপত্তন, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন।" "রাণী বলিয়াছেন, তিনি আপাততঃ হরিহরপুরে থাকিবেন। পরে সেখান হইতে পুরী যাইবেন।" "বেশ ত, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না।"

তাহার পর ব্রাহ্মণদের পুরস্কার। তাঁহারা সকলেই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন। অনেকেই যুদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে পরিশ্রম করিয়া ব্যূহরচনা, দুর্গসংস্কার প্রভৃতি শিখিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" "কত জন পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছ?" "একশত পনর জন।" "বেশ, এক একজনকে এক একখানি গ্রাম দাও।" "মহারাজ, তাহাতে ত আমার কোনই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি পাইলেন কি যে, এত দান করিবেন? দেখুন, দামোদরের ওপারে ৮৮ খানা গ্রাম রহিল, তাহাতেও ঘাটী আগলাইবার খরচ কুলাইবে না। আর এপারে যে সব গ্রাম, তাহার ত ৫০ খানি মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ মহাবিহারকেই দান করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক বিহারই ত ৫।৬ খানা গ্রাম ভোগ করে। আপনি তাহার উপর আবার ১১৫ খানা ছাড়িলে এক সাতগাঁ বন্দর ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।"

"তুমি কি বল ?"

"আমি বলি, যিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ১০ বিঘা হইতে ১০০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি দেওয়া হউক। আর যেখানেই ব্রাহ্মণের ভূমি দিবেন, তাহার একটা সীমানা যেন একটা বৌদ্ধবিহার বা তাহার জমীর সঙ্গে লাগাও থাকে, এরূপ করিলে ১১৫টা গ্রামের বদলে ১৫।২০টা দিলেই চলিবে। আর ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও সম্ভাবনা থাকিবে। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম এখন আর উঠ্‌তি-মুখে নাই, উহা ক্রমেই পড়িয়া যাইতেছে।"

"বুঝেছি,—তোমার মতলব বুঝেছি। বৌদ্ধদের জমীগুলা ব্রাহ্মণসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরাণে লিখেছে যে, দেবোত্তরের কাছে কাহাকেও ব্রহ্মোত্তর দিবে না।"

"সে মহারাজ, আমাদের দেবতাদের কথা। বিধর্ম্মীদের দেবতা আমরা দেবতা বলিয়া মানি না। এই সে দিন মহাবিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখিতে গিয়াছিলাম, কামশাস্ত্রের ছবিতেও অত অশ্লীল মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। এই মূর্ত্তি আমি ত দেবতা বলিয়া মানিতে পারি না। তবে যে ভাঙ্গি না, সে কেবল মিছে একটা গোলযোগ বাধান দরকার কি বলিয়া। নহিলে হেরুক-মূর্ত্তি দেখিয়া আমার সে দিন হইতেই রাগ হইয়াছিল।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি নাই, ক্রমেই অধোগতি হইবে ?"

"মহারাজ, এতদিন সমাজ হইতে ভিক্ষু সংগ্রহ হইত, সঙ্ঘ পূরিত, এখন উল্টা হইয়াছে। এখন সঙ্ঘ হইতে সমাজে লোক আসিতেছে ;— সমাজ তাহাদের লইতে পারিতেছে না। মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। যতদিন সঙ্ঘের আঁট ছিল,—সঙ্ঘে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে পারিত না,

ততদিন সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেণে, তেলি সঙ্ঘে গিয়াছে। সমাজ সঙ্ঘের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু এখন কি হইতেছে? সঙ্ঘে সকলেই শক্তি লইতেছে। বলে—শক্তি নহিলে সাধনা হয় না। সাধনা যত হউক না হউক, হইতেছে ছেলে-মেয়ে। প্রথম প্রথম সেগুলাকে দশশীল আও ড়াইয়া সঙ্ঘে লইত, এখন এত বেশী হইয়াছে যে, সঙ্ঘে আর ধরে না, সেগুলার জন্য নূতন বিহারও আর হইতেছে না। সুতরাং সেগুলা সমাজে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজে ত তাহাদের স্থান নাই। বৌদ্ধ-সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য নাই। সেখানে তাহারা স্থান পাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় কি হইবে? সকলেরই ত একটা একটা ব্যবসায় আছে। নূতন যাহারা আসিতেছে, তাহারা দাঁড়ায় কোথায়? তাই একজন বড় রাজা তাহাদের যুগী উপাধি দিয়া তাহাদের মোটা কাপড় বুনিতে দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, এখন আর সমাজ সঙ্ঘ পোষণ করে না। সঙ্ঘের লোক আসিয়া ভিড়িতেছে। এই ত ধ্বংসের অবস্থা। ভিক্ষুদের ভিক্ষা সমাজের লোকে দিতে চায় না। তাহাদের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেও কুলায় না। সুতরাং কাপড়ের ব্যবসা যদি জাঁকিয়া উঠে, সব সঙ্ঘের লোক সেই দিকে ছুটিবে, বিহার পড়িয়া থাকিবে। সে বিহার জঙ্গল হইয়া যাইবে। জঙ্গল না হইয়া যদি ব্রাহ্মণের ভোগে আসে, ক্ষতি কি তাহাতে?"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন,—"এ যুদ্ধ বেণেদের জন্য, জয়ও বেণেদের হইতে। বেণেরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে?"

কি পুরস্কার দেওয়া উচিত, বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"বেণেরা জমী—জমীদারী চায় না, ত্যাগ-দক্ষিণা চায় না। তাহারা চায় বাণিজ্যের একটু সুবিধা। তাহাও তাহারা ভূসী মালের ব্যবসা করে না,

দেশী মালেরও ব্যবসা করে না। বিদেশী মাল, বিশেষ সাগরপারের মাল, যাহাতে অবাধে বিনা মাশুলে সাতগাঁ পৌছিতে পারে, এইটুকু করিয়া দিলে বেণেদের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। সাতগাই এ সকল মালের প্রধান আড্ডা। এখানে যা মাশুল আদায় হয়, তাহার উপর ৩।৪টা মুনাফা চড়িয়া মাল মহার্ঘ্য করিয়া দেয়। যদি এ মাশুলটা এক টাকা কমে, তবে মালের দাম দুই টাকা কমিবে, সারা-বাঙ্গলার উপকার হইবে। সারাবাঙ্গলার অর্দ্ধেক ত মহারাজাধিরাজের, উহাঁর প্রজাদের অনেক সুবিধা হইবে।"

মহারাজাধিরাজ।—"তাহাতে রাজার যে বিস্তর লোক্‌সান হে! এত লোক্‌সান দিয়া রাজা রাজ্য চালাইবে কিরূপে?"

বিহারী।—"প্রজার দুই টাকা লোকসান করিয়া রাজার এক টাকা লাভ, —বড় ভাল কথা নয়। সে দু'টা টাকা প্রজার ঘরে থাকিলে প্রজাও দশের জন্য, দেশের জন্য দশ টাকা খরচ করিতে পারিবে। রাজাও দরকার হইলে নাঙ্গন-মাথট করিয়া যথেষ্ট আয় করিতে পারিবেন।"

সকলেই বিহারীর কথায় সায় দিল।

তাহার পরে কথা উঠিল কাপড়ের। ভবদেব বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা বাকলের অথবা রেশমের কাপড় পরেন, তূলার কাপড় অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, রাঁধাবাড়া করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, খাওয়া-দাওয়াও করেন রেশমের কাপড় পরিয়া। তবে অন্য সময়ে অনেকে তূলার কাপড় পরেন বটে; কিন্তু তাহাও পরা যায় না। কারণ, সব কাপড়েই ভাতের মাড়। নীচ জাতির এঁটো ছুঁয়ে অশুচি হইতে হয়। তাই আমরা রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের গ্রামে জাত-তাঁতি বসাইয়া কাপড়ে খই-এর মাড় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যুগীর কাপড় একেবারেই পরি না, স্পর্শও করি না। এখন ত হিন্দুর দেশ হইল। এখন এই কাপড়ের যাহাতে দেশে চলন হয়, তাহাই করিতে

হইবে। জাত-তাঁতির হাত খুব সাফ। তাহারা খুব সরু কাপড় বুনিতে পারে। সে কাপড়ে খই-এর মাড় যত পরিষ্কার দেখায়, ভাতের মাড় তেমনটা হইতেই পারে না।"

মহারাজাধিরাজ।—"আমি তাহার কি করিতে পারি? সে হাত আপনাদের আর সে হাত বিহারীর। আপনারা যদি মনে করেন, শুচি কাপড়ই চলিবে, অশুচি কাপড় চলিবে না, যাহারা সুগীর কাপড় পরিয়া জল আনিবে, তাহাদের জল আপনারা লইবেন না বা স্পর্শও করিবেন না, ইহাতেই তাঁতির কাপড় চলিয়া যাইবে।"

ভবদেব। -"ব্রাহ্মণেরা তেলের ব্যবহার খুবই কম করেন। অনেকে সরিষার তেল মাখেন। কিন্তু অধিকাংশই তৈলস্নান করেন না। যাঁহারা তেল মাখেন, তাঁহাদের বড়ই অসুবিধা। এখানে ঘানির মুখে চামড়া দেওয়া থাকে, চামড়ার ঠোঙ্গা বাহিয়া তেল একটি কলসীতে পড়ে। চামড়ার স্পর্শে সে তেল অশুচি হয়। সে তেল কিছুতেই মাখা উচিত নয়। আমরা ব্রাহ্মণের গ্রামে বন্দোবস্ত করিয়াছি, একটা কাঠের কেটকোর ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া ঘানিটি তাহাতে খুব আঁট করিয়া বসান হয়। ঘানি বহিয়া তেল কেটকোয় পড়ে; কেটকো ভরিয়া গেলে, নারিকেলের মালা করিয়া তেল একটি কলসীতে তুলিয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে পবিত্রভাবে তেল তৈয়ারি করিবে, আমরা তাহাদেরই জল-আচরণ করিব। চর্ম্ম-তৈলের ব্যবহার এইরূপে কমিয়া যাইবে।"

[৪]

ভবদেব বলিয়া যাইতেছেন:—"যাহারা ফুলের ব্যবসায় করে, তাহাদের আমরা সজ্জাতি বলিয়া লইতে পারি, তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারি,

তাহাদের কাছে ফুল লইয়া ঠাকুরদেবতাদের দিতে পারি; কিন্তু এই বৌদ্ধদেশে একটা বড়ই বিপদ্ দেখিতেছি। এখানকার মালীরা মালঞ্চে শুধু যে ফুলগাছ পোঁতে, তা নয়, মুরগীও পোষে, আর মুরগীর ডিমগুলাকে ফলের সঙ্গে ফুল বলিয়া বিক্রয় করে। বৌদ্ধদের পুষ্পপাত্রে যেমন সারচন্দনের বাটি, রক্তচন্দনের বাটি থাকে, তেমনই মুরগী-ফুলেরও একটি বাটি থাকে। এ ফুলও অন্য ফুলের সঙ্গে তাহারা ঠাকুরের উপর চড়ায় এবং অনেক সময় ডিম ভাঙ্গিয়া ভিতরকার তরল পদার্থ ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দেয়। এই সকল মালীদের আমরা অনাচরণীয় বলিয়া মনে করিব। উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই থাকিবে না। রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের যে সকল গ্রাম দেওয়া আছে, সেখানে আমরা মালীদের মুরগী পুষিতে দিই না,—মুরগীর ডিম ছুঁইতেই দিই না। আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করি, তাহাদের ফুল দেবতাদের অর্পণ করি। তাহারা বিবাহের টোপর ও ময়ূর তৈয়ার করে; ফুলের, শোলার ও তালপাতার গহনা তৈয়ার করে; ব্রাহ্মণীরা ও ব্রাহ্মণকন্যারা সেই গহনা পরিয়া থাকে।

সেকালে যে সকল নাপিত বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডে ক্ষৌরী করিত, বিবাহের সময় তাহারা নানা কাজ করিত। সে জাতি আর বাঙ্গলায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঢ়দেশের জঙ্গলে একদল ক্ষৌরী-করা লোক আছে, তাহাদের দ্বারাই বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা কাজ চালাইয়া লইয়া থাকে। ভিক্ষুরা চেষ্টা করে নিজে নিজে কামাইতে, কিন্তু সব সময়ে পারিয়া উঠে না। এই নাপিতেরা তাহাদেরও ক্ষৌরী করিয়া থাকে। কিন্তু এক বিষম সমস্যা আছে;—এই নাপিতেরা সকলেই কাকের মাংস খায়। সুতরাং উহাদের স্পর্শ করিতে নাই, জল আচরণ করিতে নাই, উহাদের হাতে কোন কাজ লওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয়; সুতরাং নাপিত আনাইতে হইয়াছে। এই

নাপিতের বংশ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে! সাতগাঁয় উহাদের জন্য একটা জায়গা দিতে হইবে। ক্রমে আমাদের নাপিতেরা যাহাতে বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা কাক-খাদক নাপিতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

বাঙ্গলায় বড় বড় গোঠ আছে। গরু চরাইবার এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের জমী আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এখানকার গোয়ালারা খুব প্রবল, দলেও খুব পুরু; কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়। অনেকেই গরু দাগে, দামড়া করে, নানারূপে গরুকে যন্ত্রণা দেয়, ফুকা দিয়া দুধ বাহির করে, গাই দিয়া লাঙ্গল টানায়। এই সকল কদাচারী গোয়ালার দুধ খাওয়াও নিষেধ। কারণ, তাহাদের স্বভাব এত খারাপ যে, তাহারা দুধে জল না দিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের জল আচরণ করা ব্রাহ্মণের কোনমতেই উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গ্রামে সেই জন্য আমরা সদ্‌গোপ নামে আর একটি গোপজাতির সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এ সকল কদাচার নাই। তাহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে শিখিয়াছে, ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার শিখিতেছে। অন্য গোয়ালারা যাহাতে এই দলে মিশে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গলা ত নদীর দেশ, জলের দেশ। মাছ ধরাই এখানকার অর্দ্ধেক লোকের জীবন। নানাজাতির লোক মাছ ধরে—যেমন কৈবর্ত্ত, তীওর, জেলে, মালা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই নামে বৌদ্ধ, বলে—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," কিন্তু কাজে কিছুই নয়। বৌদ্ধদের প্রথম শিক্ষা—"প্রাণিহিংসা করিও না।" তা ত ইহারা দিনরাত করে। সেই জন্য বৌদ্ধস্মৃতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি ইহারা জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করে, লাঙ্গল চালায় বা অন্য ব্যবসায় করে, তবে বৌদ্ধেরা উহাদিগকে শিক্ষা দিতে রাজী আছে। এইরূপে শিক্ষা

পাইয়া অনেক জেলে হেলে হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে আমাদের দলে লইয়া আসা কিছু কঠিন। কারণ, ইহাদের সঙ্গে কোনরূপ আচার ব্যবহারই আমাদের চলিবে না। কিন্তু বৌদ্ধদের হাত হইতে উহাদের উদ্ধার করিতে হইবে। নইলে বৌদ্ধেরা এই হেলেদের লইয়াই প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া বসিবে।”

মহারাজাধিরাজ তাঁহার সকল কথাতেই সায় দিলেন। ভবদেব বিহারীকে বলিয়া দিলেন, “তুমিও এইমত চলিবে।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

[১]

ভবদেব ভট্ট বারংবার মস্করীর কথা তুলিতেছেন। মস্করীকে কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে? মস্করী প্রায়ই উপস্থিত থাকিত। সে বলিত, "আমার কথা সকলের শেষে। আপনাদের সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কথা, আমার কথার পর আর কথা থাকিবে না।" মহারাজাধিরাজ ও ভবদেব তাহাতেই রাজি হইলেন। এইখানে মস্করীর একটুকু পরিচয় দিয়া রাখি।

রাঢীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা পাঁচ গোত্র। আদিশূর রাজা ৭৩২ খৃঃ অব্দে কনোজের রাজা যশোবর্ম্মার কাছে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কারণ, তাঁহার রাজবাড়ীর চূড়ায় বাজপাখী বসিয়াছিল। সেটা তখন বড় অলক্ষণ, উৎপাত বা অদ্ভুত বলিয়া লোকে মনে করিত। সুতরাং ঐ অলক্ষণের শান্তি না হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া আদিশূর রাজা যশোবর্ম্মার কাছে শান্তিযজ্ঞের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। অনেকে মনে করিতে পারেন, যজ্ঞে ত তিন জন ঋত্বিক্ হইলেই হয়। না হয়, একজন ব্রহ্মা বেশী থাকিলেন। পাঁচ জন কেন হইবে? এ সম্বন্ধে একটা ভারি কথা আছে। দক্ষিণদেশে এখনও তিন জনে যজ্ঞ হয়; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে যাজ্ঞবল্ক্য পাঁচ জন ঋত্বিক্ ভিন্ন কার্য্য হইবে না, ব্যবস্থা করিয়া যান। যজুর্ব্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ করিয়া দুই বেদ ধরিলে ও অথর্ব্ববেদকে বেদের মধ্যে ধরিলে পাঁচখানা বেদ হয়। পাঁচখানা বেদে পাঁচ জন ঋত্বিক্

লইয়া যজ্ঞ হইত। তাই আদিশূর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চান; যশোবর্ম্মাও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পাঠান। রাজারা এই পাঁচ জনের সন্তান-সন্ততিকে অনেক গ্রাম দেন। বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের একজন কাঞ্জিবিল্বী নামে একখানি গ্রাম পান। সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের বংশ বিস্তারও হয়, বিদ্যাবুদ্ধির যশও খুব হয়। আবার রাজারা সেই গ্রামের নিকটে নিকটে ঐ ব্রাহ্মণদের আরও চারি পাঁচখানি গ্রাম দেন। গ্রামগুলির নাম তালবাড়ী, চতুর্থ খণ্ড (চোটখণ্ড), পিশাচখণ্ড, রাণডলা ও হিজলবন। এই সকল গ্রামেই কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস হইয়াছিল। যিনি পিশাচখণ্ড পাইয়াছিলেন, তাহার দুই পুত্র হয়। এক পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন, আর একজনের পুত্র আমাদের মস্করী। মস্করী গ্রামের গ্রামীণ বা গাঞ্জী; সুতরাং তাঁহার অর্থের অসদ্ভাব নাই। গ্রামে কতক গুলি কুমার, গোয়ালা ও শুঁড়ীর বাড়ী। তাহাদের কুল্ কর্ত্তা মস্করী। মস্করীর পৈতৃক সম্পত্তি বেশ ছিল। আর একখানি গ্রাম তাঁহার নিজের। রাজাকে কর দিতে হয় না, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাজার। সমস্ত গ্রামের উপস্বত্বই মস্করীর। মস্করী পণ্ডিতও খুব ভাল, শাস্ত্র ও কাব্য দু'য়েতেই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। তাহার উপর নাচ-গান, এমন কি, চৌষট্টি কলায় তাঁহার মত নিপুণ লোক খুব কমই দেখা যাইত। তবে তিনি কিছু শ্রাদ্ধানন্দী। গ্রামের মধ্যে অথবা নিকটে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহাদের বড় আনন্দ। তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রাদ্ধের খোলায় উপস্থিত থাকেন; পরামর্শ দেওয়া, সাহায্য করা, খাটা-খাটনিতে তাঁহাদের বিশেষ আনন্দ। সেই জন্য লোকে তাঁহাদের শ্রাদ্ধানন্দী বলে। শব্দটার অর্থ ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। পরের কাজে, বিশেষ আমোদ-প্রমোদের কাজে যাহার আনন্দ, লোকে তাঁহাকেই শ্রাদ্ধানন্দী বলে। অতি প্রাচীনকালে বড় বড় সহরে নাগর বলিয়া একদল লোক থাকিত। তাহারা পৈতৃক-

সম্পত্তি ভোগ করিত, উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিত, নানা কলায় চতুর হইত, নাচ-গানের আসরে কর্তৃত্ব করিত; বৈঠকখানা সাজাইত। তবে নাগরেরা একটু স্ত্রীলোক-ঘেঁষা ছিল। তাই এখন নাগর বলিতে একটু লচ্‌পচে স্বভাবের লোক বুঝায়। মঙ্করীর কিন্তু সে দোষ একবারেই ছিল না। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও স্বদার-সন্তোষী। তাঁহার মেয়ে নাই, ছেলে নাই, ঢেঁকি নাই, কুলা নাই। তিনি পরের কাজ করিয়াই বেড়ান। যেখানে পাঁচজন, সেইখানেই আমাদের মঙ্করী।

সব কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজাধিরাজ মঙ্করীকে স্মরণ করিলেন। অমনি মঙ্করী উপস্থিত।

"মঙ্করী,—তুমি কি চাও?"

"মহারাজাধিরাজ, আমি এই চাই, আপনি রাজসভা করেন।"

"এখন ত আমরা রাজসভাই করিতেছি।"

"এ মন্ত্রিসভা—মন্ত্রণার সভা,—রাজকার্য্যের সভা—"

"তুমি আবার কিরূপ সভা চাও?"

"আমি চাই, মহারাজাধিরাজ সভাপতি হইয়া বসিবেন; দেশবিদেশ হইতে শাস্ত্রে ও কাব্যে পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি তাঁহাদের কাব্য এবং গ্রন্থ পরীক্ষা করিবেন ও তাঁহাদের পুরস্কার দিবেন পণ্ডিতদের সঙ্গে সঙ্গে কলাবতেরাও আসিবেন এবং নানা কলায় আপনাদের নিপুণতা দেখাইবেন, মহারাজাধিরাজ তাঁহাদের কারিগরী পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দিবেন।"

"সে ত আর এক দিনে হয় না।"

"না মহারাজাধিরাজ,—এক দিনে হয় না; অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবে আগামী বৎসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগয়ে,—এই চড়ার উপর রাজসভা হইবে। সমস্ত গুণিজন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মহা

রাজাধিরাজ সকলের কার্য্য দেখিয়া পুরস্কার দিবেন। "গুণিজন—খানা নামে এক নূতন খানা হইবে। তাহাতে নিঃস্ব গুণিজনের গ্রাসাচ্ছাদনে ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরীক্ষায়, মহারাজ, হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, আচারী, অনাচারী কোন প্রভেদই থাকিবে না ;—কেবল গুণের বিচার হইবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বড় বড় রাজারা এইরূপ রাজসভা করিতেন এইরূপ সভা হইতেই কালিদাস পুরস্কার পাইয়া বড় হইয়াছিলেন ; পাণিনি —পিঙ্গলও বড় হইয়াছিলেন। মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগেরও আপনার সভায় পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, "তথাস্তু।" ভবদেব বলিলেন, "পিশাচখণ্ডী তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণের মত দান চাহিয়াছ।"

•

| ২ |

বৌদ্ধদের অধঃপাতে গুরুপুত্রের বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। রূপারাজার মৃত্যুতে তিনি যেন আর একবার পিতৃহীন হইয়াছেন। মেঘা যখন সব সৈন্য লইয়া মহাবিহারে আশ্রয় লয়, তখন গুরুপুত্র প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। বড় বড় গোলা-ভরা ধান ছিল, সব মেঘাকে দিয়া দিয়াছিলেন ; নিজে যুদ্ধেও নামিয়াছিলেন। দুই মাস তাঁহার আহার-নিদ্রা ছিল না। কিন্তু যখন দেখিলেন, আর রক্ষা হয় না, তখন মেঘাকে বলিলেন, "তুমি পশ্চিমদ্বার দিয়া পলাও, আমি পূর্ব্বদ্বারে গিয়া হরিবর্ম্মার হাতে দুর্গ সমর্পণ করি।" দুর্গের চাবি পাইয়া হরিবর্ম্মা কি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। গুরুপুত্র এখন মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার বিশাল সাম্রাজ্যে মহাবিহারের অধিকারী। রাজা বিধর্ম্মী। তিনি বিহার রক্ষা করেন বটে, কিন্তু বিহারের উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই। একটি মুখের কথায় বিহারের ৩০ খানি গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন

সে ৩০ খানি গ্রামের জন্য মহারাজাধিরাজকে খাজনা কিছু দিতে হয় বটে, —সে কিন্তু নাম মাত্র। বিহারে আর তেমন গোলাভরা ধান থাকে না। ডাল-তরকারী, দুধ-মাখনের যে প্রচুর যোগাড় হইত, তাহাও আর হয় না। শিষ্যদের মধ্যে সকলেই শ্রীহীন হইয়াছে। বেণেরা একেবারেই তাঁহাদের হাতছাড়া। অন্যান্য জাতির ধনী মানী লোক সব ব্রাহ্মণদিগের দিকেই গড়াইয়া পড়িতেছে, বৌদ্ধদিগের দিকে আর বড় কেহ আসিতে চায় না। সুতরাং মহাবিহারের আয়ের পথ চারিদিক্ হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যয়ের ভাগ বরং বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুমাত্র কমে নাই। কেন না, বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বড় বড় দাতা ছিলেন, মহাবিহারও তার মধ্যে একজন, এখন মহাবিহারই একমাত্র দাতা, তাঁহাকে সকল দিক্ই দেখিতে হয়। যখন মহাবিহারের সম্মুখে মহাসভা হয়, তখন সেই প্রকাণ্ড পালের নীচে ব্রাহ্মণদের বামদিকে ব্রাহ্মণদের গালিচা হইতে তিন হাত তফাতে, ঘাসের ও পিঠে, বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বসিবার স্থান হয়। বলিতে হইবে না, সেখানে গুরুপুত্রের আসন সকলের আগে। তিনিও নিপুণ হইয়া সে দিনকার ব্যাপার সব দেখিতেছিলেন। যখন ভবদেব বলিলেন,—"মহা রাজাধিরাজ, রূপনারায়ণের রাজ্য লোপ হইয়া গেল", তখন গুরুপুত্রের মুখে যেন কালী মাড়িয়া দিল। যখন মহাবিহারের গ্রামগুলি হিন্দুর দখল করিয়া লইল, তখন রাগে, ক্ষোভে গুরুপুত্র অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাহার পর মায়া যখন মহাসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল, গুরুপুত্র তাহাকে দেখিলেন। তাহার মুখে পূর্ব্বে যে বিষাদের ছায়া দেখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা নাই। তাহার মুখ এখন আরও উজ্জ্বল, হাস্যময়, আনন্দ ময়। গুরুপুত্র এতদিন তাহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি মায়ার জন্য আবার চঞ্চল

হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের আরশীতে মায়ার যে ছবি ছিল, তিনি সে ছবিতে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এখন হইতে বিহারী দত্তের মেয়ে মায়া আবার তাঁহার জপমালা হইল। কিন্তু হায়, সেকাল আর একাল! তখন তিনি রাজার গুরুপুত্র, এমন কি, গুরু বলিলেও হয়। আর বিহারী একজন সামান্য প্রজা। বিহারীর মেয়ে তা'র চেয়েও সামান্য। এখন বিহারী রাজা, বিহারীর মেয়ে রাজকন্যা। আর তিনি—এক বিধর্ম্মী, ঘৃণিত, পদদলিত সম্প্রদায়ের গুরু। এখন তাঁহার পক্ষে মায়ার কামনা বামন হইয়া চাঁদে হাত। কিন্তু যৌবনের উদ্দাম বাসনার গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি জানেন, তিনি ভিক্ষু এবং এ সকল কামনা ভিক্ষুর উচিত নয়। "কিন্তু ভিক্ষু হইলেও এখন ত সকলেই শক্তি লয়। শক্তি ভিন্ন ত সাধনাই হয় না। সুতরাং আমারও শক্তি চাই, উপযুক্ত শক্তি চাই। বলপূর্ব্বক শক্তি লওয়া চাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে আসিবে, তাহাতে আমার শক্তির বিকাশ কই? পরকীয়া শক্তি ভিন্ন শক্তিই হয় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিয়া না আনিলে, সে শক্তির দ্বারা সাধনা হইবে কিরূপে?"

[৩]

মায়াদের গোলা গঙ্গার এক বাঁকের মাথায়। যে দরজা দিয়া গোলায় ঢুকিতে হয়, সেটা খুব উচা। লোকে হাতীর পিঠে গোলার ভিতর ঢুকিবে, এই মত করিয়া দরজা হইয়াছে। দরজার মাথার উপর দুই-তালা ঘর আছে। প্রথম তালার সামনে গঙ্গার দিকে একটি ঝরকা আছে। ঝরকাটি দেওয়ালের বাহিরে। সেখানে বসিলে তিন দিক্ দেখা যায়। মায়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া এইখানে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। আবার সন্ধ্যার সময়েও এইখানে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড নদী, সমুদ্রের একটা হাতের মত ডাঙ্গায় আসিয়া ঢুকিয়াছে। মায়া গোলায়

ফিরিয়া আসিয়া অবধি দু'বেলাই দেখিতেছে, এই প্রকাণ্ড সমুদ্রের খাড়ী নৌকায় ছাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মনে হইত, ডাঙ্গায় যেমন একটি প্রকাণ্ড নগর আছে, জলের মধ্যেও তেমনই এক প্রকাণ্ড নগর বসিয়াছে। সম্মুখে, বামে, ডাইনে যে দিকে দেখ, নৌকার সারি। নৌকায়ও অসংখ্য লোক, দিনরাত্রি কাজকর্ম্ম হইতেছে। রাজাদের নৌকা দু'খানি প্রায়ই মায়ার গোলার সামনে থাকিত।

এক দিন সকালে মায়া দেখিল, মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার নৌকা হইতে মহারাজা রণশূর আপন নৌকায় যাইতেছেন। দুই নৌকার মাঝখানে একটি সিঁড়ি পড়িয়াছে। মহারাজাধিরাজ কোলাকুলি করিয়া রণশূরকে তাঁহার নিজের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মাথায় কি একটা উজ্জ্বল জিনিষ পরাইয়া দিলেন। রণশূর পঞ্চাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজাধিরাজ তাঁহার হাত ধরিয়া কয়েকটি কথা কহিয়া আপন নৌকায় ফিরিলেন। সিঁড়ি খুলিয়া লওয়া হইল। রণশূরের নৌকা ছাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নৌকা খুলিয়া দিল। প্রকাণ্ড জলনগরে যেন চারি ভাগের একভাগ সরিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রণশূরের বাহিনী দক্ষিণদিকে গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। আর কিছুই দেখা যায় না। মায়ার চক্ষু ফিরিল। সে শুনিল, নানারূপ বাদ্য একযোগে বাজিতেছে।

ক্রমে হরিবর্ম্মার নৌকাগুলিও ছাড়িয়া দিল। কতক উত্তরমুখে যমুনায় প্রবেশ করিল, কতক দক্ষিণমুখে সমুদ্রে যাইতে লাগিল। হরিবর্ম্মার নিজের নৌকা ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে বিহারী দত্তের নৌকা গিয়া সেখানে লাগিল। বিহারী মহারাজাধিরাজের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সেই মস্করী। দুই নৌকাই চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া বিহারী ও মস্করী আপন নৌকায় উঠিল ও দুই নৌকায় ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহারী গোলার দিকে আসিতে লাগিল, আর মহারাজাধিরাজ দক্ষিণসমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

মায়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এই ত কিছু পূর্ব্বে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নগর দেখিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। এখন দেখি,—যে দিকেই দেখি, কেবল জল!—কেবল জল! ওপারের গাছপালার রেখামাত্র দেখা যাইতেছে। উপরে কেবল আকাশ, নীচে কেবল জল।"

মায়া এই চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে পিছনদিকে শিশু-কণ্ঠে কে ডাকিল—"মা!" মায়ার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, সে পিছন ফিরিয়া দেখে, তাহার সেই হবু ছেলে দু'হাত তুলিয়া তা'র কোলে উঠিবার জন্য ডাকিতেছে —"মা!" মায়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। দুই হাতে তাহাকে নাচাইতে লাগিল, আর বার বার চুমা খাইতে লাগিল। সে যত হাসে, মায়া তত চুমা খায়। তাহার হাসিরও বিরাম নাই, মায়ার চুমারও বিরাম নাই। এমন সময়ে নীচে হইতে জলদ-গম্ভীরস্বরে কে বলিয়া উঠিল—"মা কোথায় গো?" সে শব্দ কয়েক মাস ধরিয়া শুনিয়া শুনিয়া সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। মায়া ছেলেটিকে এক দাসীর কোলে দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

একটা নীচের তালায় একজনের সহিত দেখা হইল। মায়া তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি আমাদের মস্করী। তিনি বলিলেন, "মা, আজ বেলা বড় অধিক হইয়া গিয়াছে; বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। তোমায় কেবল একটি কথা বলিয়া যাই। আসছে বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় মহারাজাধিরাজ সাতগাঁয়ে বসিয়া শাস্ত্রে, কাব্যে ও শিল্প-কলার পরীক্ষা লইবেন। তোমাকে কাব্য পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি শীঘ্র সাতগাঁ ছাড়িয়া যাইব। সকল পণ্ডিত-সমাজেই আমাকে ঘুরিতে হইবে। আমি তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব।"

"সে কি বাবা! আমি কিসে পরীক্ষা দিব? আমি ত বাঙ্গালা বই আর কোন ভাষাই জানি না। শিল্পকলাতেও আমার তেমন অধিকার নাই।"

"তুই মা বাঙ্গালায় দু'টা গান লিখে রাখিস্। আর যা হয় কিছু শিল্পকার্য্য করিয়া রাখিস্। এত-বড় মহাসভা হবে, তুই সেখানে থাকিবি না, আমার তা ভাল লাগিবে না।"

"আপনার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইলাম। তবে কি আমার পোষ্য পুত্র লওয়ার সময় আপনি থাকিবেন না? এই যে আমার পোষ্যপুত্র লওয়া —সে ত আপনারই প্রসাদাৎ। আপনি না থাকিলে এ সব শিবহীন যজ্ঞের মত হইবে।"

"আসিব রে আসিব। যেখানেই থাকি, সে দিন ঠিক হাজির হইব। তোর কোলযোড়া ছেলে হবে, আমি দেখিব না ত দেখিবে কে?" বলিয়াই মস্করী মায়ার গোলা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিহারী বাহিরে মেয়ের গোলার কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন। মায়া আসিয়া সেখানে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন—"বেলা অনেক হইয়াছে মায়া, এখনও তোমার খাওয়া দাওয়া হয় নাই। যাও, তুমি এখন খাও গে।"

"বাবা, আজ ত বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। আপনি কেন আমার এইখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া যান না।"

"না রে, না পাগ্‌লী, দৌহিত্রের মুখ না দেখিলে কি মেয়ের বাড়ীতে খাইতে আছে? তুই যে দিন পোষাপুত্র নিবি, সেইদিন তোর বাড়ীতে খাইয়া যাইব।"

বিহারী চলিয়া গেল। মায়াও বাড়ীর ভিতর আসিলেন—আসিয়া দেখিলেন, সেই অল্পবয়সী ভিক্ষুণী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে।

[৪]

বেলা এক প্রহর হইয়াছে। গুরুপুত্র স্নানাহ্নিক সারিয়া পাঠে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতে একখানি তালপাতার পুঁথি, দেখিতে মাঝারি গোছের। তাহাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে। সবগুলিই সহজধর্ম্মের মূলগ্রন্থ। সব সংস্কৃতে লেখা, প্রায়ই অনুষ্টুপ্‌ছন্দে। গুরুপুত্র বাছিয়া বাছিয়া নিপুণ হইয়া একখানি গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন— তাহার নাম অদ্বয় সিদ্ধি। পুঁথিখানি এক রাজকন্যার লেখা। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি সহজধর্ম্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহারও লেখা পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বপ্রথম বজ্রবারাহীর পূজা প্রচার করেন। এ আমলের বৌদ্ধদের মধ্যে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছিল। আমাদের গুরুপুত্র তাঁহারই কন্যার বই পড়িতেছেন—তিনি পড়িতেছেন :—

"ন কষ্টকল্পনাং কুর্য্যাৎ নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
স্নানং শৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্ম্মবিবর্জ্জনম্॥
ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষাণমৃন্ময়ান্।
পূজামস্যৈব কায়স্য কুর্য্যাৎ নিত্যং সমাহিতঃ॥"

"কিছুতেই কষ্ট করিবে না, উপবাস করিবে না, ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার দরকার নাই, স্নান করিবে না, শৌচ করিবে না, 'গ্রাম্যধর্ম্ম' ত্যাগ করিবে না, কাঠ-পাথর-মাটীর দেবতাকে নমস্কার করিবে না। সর্ব্বদা নিপুণ হইয়া দেহেরই পূজা করিবে।"

তিনি আবার পড়িতেছেন :—

"সর্ব্বান্ সমরসীকৃত্য ভাবান্ নৈরাত্ম্যনিঃসৃতান্।
ভাবয়েৎ সততং মন্ত্রী দেহং প্রকৃতিনির্ম্মলম্॥"

"সকল ভাব পদার্থের মূলের অভাব, অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ভাবপদার্থই এক। তাহাদের রস একই প্রকার। সুতরাং সাধকের উচিত, স্বভাবতঃ নির্ম্মল যে দেহ, তাহারই ধ্যান করা।"

গুরুপুত্র চিন্তা করিতেছেন :—তাই যদি হ'ল, দেহ যদি স্বভাবতঃই নির্ম্মল, তবে আমরা যে ময়লার কথা ভাবি, পাপের কথা ভাবি, সেটা ত দেহের স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেটা উঠ্‌কা জিনিষ, আসিয়া জুটে। তা'কেই বলে 'বিকল্প।' সে ত আসল জিনিষ নয়। আসল জিনিষে ময়লা ধরিতে পারে না। সেই যে নির্ম্মল দেহ, তাহারই ধ্যান কর, তাহারই পূজা কর। সে পূজায় উপবাসাদি কিছুই করিবে না। যাহাতে কোনরূপ কষ্ট হয়, এমন কোন কার্য্যই করিবে না। কাঠ-মাটী-পাথর-দেবতা, এ উঠ্‌কা জিনিষ। আসল জিনিষ দেহ। তাহারই পূজা কর। এ পূজা, —এ ধ্যান কি প্রকার? যাহাতেই কায়ের ও মনের তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। তাহাতে বন্ধমুক্তির কথাই কি?

"যেন যেন হি বধ্যন্তে জন্তবো রৌদ্রকর্ম্মণা।
সোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ॥"

"যে সকল ভয়ঙ্কর কার্য্যের দ্বারা লোকে বদ্ধ হয়, কৌশলের সহিত সেই সকল কার্য্য করিলে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।" সে কৌশল কি?—গুরুর উপদেশ। গুরুর উপদেশ হইলে—

"রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥"

"যে আসক্তিতে লোকে বদ্ধ হয়, সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়; —এই যে বিপরীত ভাবনা, এই যে রাগের বিপরীত শক্তি, ইহা বুদ্ধ-তীর্থিকেরাও জানিতেন না।"

শ্রীসমাজে বলেন :—

"পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাদয়েদ্‌বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥"

"কামনার যে পাঁচটি বিষয় আছে, তাহার একটিকেও ছাড়িও না, তপস্যা করিয়া দেহকে পীড়ন করিবে না, সুখ ভোগ করিতে করিতেই যোগ ও তন্ত্রমতে 'বোধ' লাভ করা যায়।"

তবেই ত সুখ ছাড়া হবে না। সে সুখ আবার কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ নয়। এই দেহেরই সুখ। 'পঞ্চকামোপভোগে'র সুখ। পঞ্চ কামোপভোগের মধ্যে আবার স্ত্রীই সকলের প্রধান। কেন:না লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :—

"সৈব ভগবতী প্রজ্ঞা সম্বৃত্যা রূপমাশ্রিতা।"

"তিনিই আসল প্রজ্ঞা। অথবা আসল প্রজ্ঞাই তিনি। তাঁহারই এই যে রূপ দেখিতেছ, সেটা উঠ্‌কা জিনিষ—বিকল্প—মিথ্যা। ঐ রূপে ডুব দাও, আসল জিনিষ দেখিতে পাইবে।" তাই আবার লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :—

"সর্ব্ববর্ণসমুদ্ভূতা জুগুপ্স্যা নৈব যোষিতঃ।"

অর্থাৎ "কোন বর্ণের নারীকেই ঘৃণা করিও না।"

ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা আরও বলিতেছেন :—

"ন চাধ্যাসক্তিং কুর্ব্বীত একস্মিন্নপি যোগবিৎ।
সমতাচিত্তযোগেন ভাবনীয়ো ভবার্ণবঃ॥"

"কিছুতেই আসক্ত থাকিও না। ভবার্ণবে যত কিছু পদার্থ আছে, সব একাকার দেখিও, সমান ভাবিও, সকল পদার্থেই এক রসের আস্বাদ পাইবে।

"সকল ভাব পদার্থের মূলের অভাব, অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ভাবপদার্থই এক। তাহাদের রস একই প্রকার। সুতরাং সাধকের উচিত, স্বভাবতঃ নির্ম্মল যে দেহ, তাহারই ধ্যান করা।"

গুরুপুত্র চিন্তা করিতেছেন :—তাই যদি হ'ল, দেহ যদি স্বভাবতঃই নির্ম্মল, তবে আমরা যে ময়লার কথা ভাবি, পাপের কথা ভাবি, সেটা ত দেহের স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেটা উঠ্‌কা জিনিষ, আসিয়া জুটে। তা'কেই বলে 'বিকল্প।' সে ত আসল জিনিষ নয়। আসল জিনিষে ময়লা ধরিতে পারে না। সেই যে নির্ম্মল দেহ, তাহারই ধ্যান কর, তাহারই পূজা কর। সে পূজায় উপবাসাদি কিছুই করিবে না। যাহাতে কোনরূপ কষ্ট হয়, এমন কোন কার্য্যই করিবে না। কাঠ-মাটী-পাথর-দেবতা, এ উঠ্‌কা জিনিষ। আসল জিনিষ দেহ। তাহারই পূজা কর। এ পূজা, —এ ধ্যান কি প্রকার? যাহাতেই কায়ের ও মনের তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। তাহাতে বন্ধমুক্তির কথাই কি?

"যেন যেন হি বধ্যন্তে জন্তবো রৌদ্রকম্মণা।
সোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ॥"

"যে সকল ভয়ঙ্কর কার্য্যের দ্বারা লোকে বদ্ধ হয়, কৌশলের সহিত সেই সকল কার্য্য করিলে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।" সে কৌশল কি?—গুরুর উপদেশ। গুরুর উপদেশ হইলে—

"রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥"

"যে আসক্তিতে লোকে বদ্ধ হয়, সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়; —এই যে বিপরীত ভাবনা, এই যে রাগের বিপরীত শক্তি, ইহা বুদ্ধ-তীর্থিকেরাও জানিতেন না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীসমাজে বলেন :—

"পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাদয়েদ্‌বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥"

"কামনার যে পাঁচটি বিষয় আছে, তাহার একটিকেও ছাড়িও না, তপস্যা করিয়া দেহকে পীড়ন করিবে না, সুখ ভোগ করিতে করিতেই যোগ ও তন্ত্রমতে 'বোধ' লাভ করা যায়।"

তবেই ত সুখ ছাড়া হবে না। সে সুখ আবার কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ নয়। এই দেহেরই সুখ। 'পঞ্চকামোপভোগে'র সুখ। পঞ্চকামোপভোগের মধ্যে আবার স্ত্রীই সকলের প্রধান। কেন:না লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :—

"সৈব ভগবতী প্রজ্ঞা সম্বৃত্যা রূপমাশ্রিতা।"

"তিনিই আসল প্রজ্ঞা। অথবা আসল প্রজ্ঞাই তিনি। তাঁহারই এই যে রূপ দেখিতেছ, সেটা উঠ্‌কা জিনিষ—বিকল্প—মিথ্যা। ঐ রূপে ডুব দাও, আসল জিনিষ দেখিতে পাইবে।" তাই আবার লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :—

"সর্ব্ববর্ণসমুদ্ভূতা জুগুপ্স্যা নৈব যোষিতঃ।"

অর্থাৎ "কোন বর্ণের নারীকেই ঘৃণা করিও না।"

ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা আরও বলিতেছেন :—

"ন চাধ্যাসক্তিং কুর্ব্বীত একস্মিন্নপি যোগবিৎ।
সমতাচিত্তযোগেন ভাবনীয়ো ভবার্ণবঃ॥"

"কিছুতেই আসক্ত থাকিও না। ভবার্ণবে যত কিছু পদার্থ আছে, সব একাকার দেখিও, সমান ভাবিও, সকল পদার্থেই এক রসের আস্বাদ পাইবে।

"ভগবতী আমাদের ধর্ম্মটাকে কি সুখেরই করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বলিলেন, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই আসল আনন্দ। যোষিৎসম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই।"

[৫]

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এবং মনে মনে মায়ার রূপকল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বালক ভিক্ষু আসিয়া খবর দিল—মস্করী আসিতেছে। মস্করীর নাম শুনিয়াই গুরুপুত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—মস্করী?—আমার কাছে?—কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।" কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা বড়ই উৎকণ্ঠা হইল,—বড়ই ভয় হইল।

মস্করী সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইবামাত্র, গুরুপুত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুই জনে আসনে বসিলে মস্করী প্রথমেই আরম্ভ করিয়া দিলেন:—

"আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়, আস্‌ছে বছরে ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন রাজসভা হইবে। আমার অনুরোধ, আপনাকেও তাহাতে পরীক্ষা দিতে হইবে। আপনি অল্পবয়সেই যেরূপ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছেন, আপনার গুরুর মুখে আপনার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহাতে আপনি সাতগাঁতে থাকিয়াও যদি আমাদের সভাতে উপস্থিত না হ'ন, আমাদের সভা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

"আমি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিব?"

"কেন? আপনি অনেক ভাষা জানেন। আপনার যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি আছে। আপনার গুরু বলেন, সহজধর্ম্মে আপনি অতি প্রবীণ। অপনাদের নিজের ধর্ম্মের উপরই যাহা হয় কিছু লিখিবেন। আমি সকলকেই সভায় যাইবার জন্য, পরীক্ষা দিবার জন্য, অনুরোধ করিতেছি। আপনি আমার একটু উপকার করুন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যে সকল বড় বড় বাচক, বড় বড় পাঠক, বড় বড় পণ্ডিত আছেন, সেই সকল বিহারের ও সেই সকল পণ্ডিতের নাম দিলে, আমি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতে পারি।"

গুরুপুত্র, মস্করীর কোন কথাতেই 'না' বলিতে পারিলেন না; নিরীহ ভালমানুষটির মত মস্করীর সব কথাতেই সায় দিলেন। মস্করী যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি যে শুধু পুরুষদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহা নয়, অনেক স্ত্রীলোককেও নিমন্ত্রণ করিয়াছি। রাজকুমারী মায়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বাঙ্গলায় কবিতা লিখিয়া রাজসভায় উপস্থিত থাকিবেন। আচ্ছা, আপনাদের জ্ঞান-ডাকিনী-নিগু এখন কোথায়? আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাই। আপনাদের মধ্যে আর কে কে প্রতিভাশালিনী রমণী আছেন, জানিতে পারিলে, তাঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করি।"

গুরুপুত্র বলিলেন :—"আপনি যখন এ অধমের সাহায্য লইতে এত দূর আসিয়াছেন, তখন আমি আমাদের দল হইতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের লইয়া যাইব ও যাহাতে তাঁহারাও পরীক্ষা দেন, তাহা করিব।"

"আপনার জয় হউক"—বলিয়া মস্করী প্রস্থান করিলেন।

গুরুপুত্র পুথিখানি বাঁধিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

[১]

একদিন পিশাচপণ্ডী, জন দুই সাতশতী ব্রাহ্মণ ও সেই বিধুভূষণ ফরফরকে সঙ্গে লইয়া মায়ার গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ঠাকুরঘরে গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিবামাত্র মায়া তাঁহাদের পদধূলি লইল ও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সেই গালিচায় বসাইল, নিজে নীচে মেজের উপর বসিল।

মায়া বলিল, "আপনারা আসিয়াছেন; আমার দত্তকগ্রহণের একটি দিন করিয়া দিউন। বিশেষ, যখন বাবাঠাকুর আর বেশী দিন এখানে থাকিবেন না, তখন দিনটা কবে স্থির হইল, তাহা তাঁহার জানিয়া যাওয়া উচিত।" মঙ্করী, ফরফর মহাশয়কে বলিল—"আপনি দিনটা স্থির করুন।" ফরফর মহাশয় বলিলেন,—"দিন আর কি স্থির করিব? সংক্রান্তিতে হ'তে পারে, পূর্ণিমায় হ'তে পারে, আর যগাদ্যা তিথিতে হ'তে পারে। সংক্রান্তির মধ্যে আবার মহাবিষুবসংক্রান্তি প্রশস্ত। যগাদ্যার মধ্যে সত্যযুগের আদি তিথি অক্ষয়-তৃতীয়াই প্রশস্ত। আর পূর্ণিমার মধ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমাই প্রশস্ত। কেমন হে ভায়া—" বলিয়া তিনি হরেকৃষ্ণ মুল্লুককে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুল্লুক মহাশয় দুইবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—"কি জানেন দাদা মহাশয়, ক্রিয়াকর্ম্মটা করিতে গেলে আষাঢ় শ্রাবণ মোটেই ভাল নয়; বসন্ত কালটা বেশ। তা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বলি, মহাবিষুবসংক্রান্তিতেই দিন করুন। না হয়, আপনি যা বল্লেন,

অক্ষয়-তৃতীয়াতেই হউক। তা তুমি কোন্ দিনটা ভাল বল ধর্‌ধর্‌ মহাশয়?” তখন দ্বারিক ধর্‌ধর্‌ মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন,— “আমরা এই দুইটা দিনই স্থির করিয়া দিয়াই যাই। তার পর রাজা বিহারী এই দুইটা দিনের মধ্যে একটা দিন ঠিক করুন। তাঁদের উপরও ত একটা ভার থাকা উচিত। তাঁহাদেরও ত রাজকার্য্যের সুযোগ অসুযোগ দেখা চাই। বিশেষ, তাঁহাকেও ত দিনকতক পরে পোষ্যপুত্র লইতে হইবে।”

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক লম্বা খাটলি ঠাকুরবাড়ী ঢুকিল। বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গেই চোপদার, নিশানদার প্রভৃতি অনেক লোক ঢুকিল। খাটলি হইতে নামিয়া রাজা বিহারী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিল। মায়া দাড়াইয়া উঠিল, পরে পিতার চরণধূলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণেরা বসিয়াই আশীর্ব্বাদ করিল। মস্করী বলিলেন “আমরা ত মায়ার পোষ্যপুত্র গ্রহণের দুটি দিন করিতেছি ; একটি মহাবিষুবসংক্রান্তি, অপরটি অক্ষয় তৃতীয়া। এই দুইটি দিনের মধ্যে কোনটি আপনার পছন্দ বলুন,—কোনটিতেই বা আপনার সুবিধা বলুন। আর আপনারও ত পোষ্যপুত্র লইতেই হইবে, তা এর সঙ্গেই যদি লন ত ইহার একটি দিনে আপনি, আর একটি দিনে মায়া পোষ্যপুত্র লউন। এবারে ঐ দুই দিনে দশ পনর দিন তফাৎ বই নয়।” কিছু চিন্তা করিয়া রাজা বিহারী বলিলেন,—“সংকল্পিত অর্থে বিলম্ব ভাল নয় ; বিশেষ, যখন শুভ সংকল্প, আর ইহারই উপর দুইটি বংশ-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আপনারা যেমন অনুমতি করিতেছেন, আমরা ঐ দুই দিনেই দত্তক গ্রহণ করি, আমি মহাবিষুবসংক্রান্তির দিনে, আর মায়া অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে।” ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—“সাধু, সাধু।” তখন রাজা বিহারী বলিলেন,—“একটা গোলের কথা আছে। এ ক্ষেত্রে রাজার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এরূপ

কার্য্য হইতেই পারে না। তা তিনি ত সবে সে দিন এখান হইতে গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে আবার তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে আমি ত পারিব না।”

শঙ্করী বলিলেন—“ইহার জন্য আপনাকে আর ভাবিতে হইবে না। আমি আপনার জ্ঞাতির একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা—একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে না থাকিলে, আপনাদের জ্ঞাতির নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, যদি স্বয়ং না আসিতে পারেন, কোন জ্ঞাতির ছেলেকে পাঠাইবেন; অন্ততঃ ভবদেব ভট্টের উপর ভার দিবেন। আপনি বেশ কথা বলিয়াছেন, আপনি এখানকার রাজা, সকলে আপনার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের কার্য্যে ত তাহা হইতে পারে না, মায়ার কার্য্যেও তাহা হইতে পারে না।—সে যা হউক, আমি ত এখানে থাকিব না, আমাকে রাজসভার নিমন্ত্রণের জন্য যাইতে হইবে। আপনার জন্য, ভবদেব ভট্টের জন্য, আর মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের জন্য আমাকে ভাটের কার্য্য করিতে হইবে। আমি তাহাতে আমার লাঘব হয় বলিয়া মনে করি না, বরং গৌরব বলিয়াই মনে করি। আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য আমি এই তিন জন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছি। ইহাঁরা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও কর্ম্মঠ। ইহাঁদের শূদ্র যজমান আছে। ইহাঁদেরই উপর আপনাদের কার্য্যের সমস্ত ভার দিয়া গেলাম। ইহাঁরা যেমন বলেন, সেইমত আয়োজন করুন। যদি অন্য ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় ত ইহাঁরাই আনিয়া দিবেন। এই যে বিধুভূষণ ফর্‌ফর্ মহাশয়কে দেখিতেছেন, ইহাঁর বয়স ৯০ বৎসরেরও উপর। ইহাঁর যেমন ব্রহ্মবর্চ্চস, তেমনটি প্রায় দেখা যায় না। ইনিই জীবন ধনীর প্রতিমায় জীবনদান করিয়া তাঁহাকে কথা কহাইয়া মায়ার পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতি দেওয়াইয়াছিলেন। নচিলে

শাস্ত্রানুসারে মায়া ত পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীলোক পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না।"

এই কথা শুনিয়া রাজা বিহারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে লইলেন এবং ভক্তিগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—"আপনি আমার জামাইয়ের বংশরক্ষা করিয়া দিলেন। আপনাকে আর কি দিব? ফর্ফর্ গ্রামের পূর্ব্বদিকে হরিপুর গ্রামখানি আপনাকে দান করিলাম। মহারাজাধিরাজের স্বহস্তাঙ্কিত দানপত্র যথাসময়ে আপনাকে আনাইয়া দিব।" "মহারাজের জয় হউক"—বলিয়া ব্রাহ্মণ দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

[২]

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মায়ার গোলায় প্রকাণ্ড উঠানের উপর প্রকাণ্ড পা'ল টাঙান হইয়াছে। পা'লের নীচে সভার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সভারোহণের জন্য উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে ৫৬ গ্রামী ও সাতসইকা পরগণার চব্বিশগ্রামী সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বারেন্দ্র, বৈদিক-ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারা উঠানের উত্তরদিকে বসিয়াছেন। বেণে চার আশ্রমেরই আছেন, তাহার উপর শঙ্খবণিক্, কংসবণিক্ প্রভৃতিও আছেন। কায়স্থকুলও আসিয়াছেন। বৌদ্ধদের মধ্যেও মাথাল মাথাল লোক সব আসিয়াছেন। গুরুপুত্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অনেক ভিক্ষুণীও আসিয়াছেন। সমস্ত উঠানটা যেন জম্জম্ গম্গম্ করিতেছে। সকলের মধ্যস্থলে মহারাজাধিরাজের স্বর্ণসিংহাসন, দুই পাশে দুই রৌপ্য-সিংহাসন। রাজা বিহারী নিজে

থাকিয়াই সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন ও মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিতেছেন। উঠানের উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপে হোমের জায়গা হইয়াছে।

উঠানের চারিদিকে চারি দেউড়ীতেই বাজনার রোল উঠিয়াছে। কোন দেউড়ীতে ঢাক, ঢোল ও কাঁসি ; কোন দেউড়ীতে, দামামা, দগড় ও বাঁশী ; আর এক দেউড়ীতে দুন্দুভি, করতাল ও ঝাঁঝ ; আর এক দেউড়ীতে—মৃদঙ্গ, বীণা ও করতাল। যখন সব দেউড়ীতে একত্র বাজিতেছে, তখন শব্দের রোলে আকাশ ফাটিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপে পোষ্যপুত্র গ্রহণের জায়গা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে ঘটস্থাপন করিয়াছে। একটা কলসী, তাহাতে জল পোরা ; তাহার উপর আম্রপল্লব, তাহার উপর একটি ডাব ও কলসীর সম্মুখদিকে তিনটি সিন্দূরের রেখা। চণ্ডীমণ্ডপের ডানদিকে হোমের উদ্যোগ হইতেছে ও বাঁদিকে আভ্যুদয়িক হইতেছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা মণ্ডীমণ্ডপের কর্ত্তা। মুল্লুক মহাশয়, ধর্‌ধর্ মহাশয় ও ফর্‌ফর্ মহাশয় খুব ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ; চাকরদের খুব ধমক দিতেছেন ; মায়া সেখানে আছেন, তাঁহার উপরও খুব তম্বী হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, মিথিলা ও উৎকল প্রভৃতি নানা দেশের কর্ম্মকাণ্ডী পণ্ডিতেরা বসিয়া আছেন ও কি পদ্ধতিতে পোষ্যপুত্র লওয়া হয়, তাহা দেখিতেছেন। একজন দক্ষিণরাঢ়ী পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রীকর্ত্তৃক ক্রিয়ায় আভ্যুদয়িকের নিয়ম নাই ; এক্ষণে আভ্যুদয়িক কেন হইতেছে?" তখন উভয় পক্ষের পণ্ডিতের মধ্যে খুব বিচার বাধিয়া উঠিল। এক জন বলিয়া উঠিল,—"স্ত্রীর প্রেতশ্রাদ্ধেই অধিকার আছে ; অভ্যুদয়িকে তাহার আবার অধিকার কি ?" আর একজন বলিলেন,—"যদিই করিতে হয়, প্রতিনিধির দ্বারা করিতে হইবে।" এক জন বলিলেন,—"পুরোহিত প্রতিনিধি হইবেন।" আর এক জন বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি ? বেণের

প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ ? এক জন ধনীবংশেরই প্রতিনিধি হইবেন।" ক্রমে বিবাদ এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, মস্করী মহাশয় সমস্ত ব্যাপারটা ভবদেব ভট্টের নিকট বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এখনও বঙ্গ-ভূমির ব্রাহ্মণের জন্য পদ্ধতি লেখা হয় নাই। শূদ্র-পদ্ধতির ত কথাই নাই। সে যে কবে লেখা হইবে, তাহারও ঠিক নাই। আমি যখন ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, পদ্ধতিও লিখিয়া দিব। কিন্তু রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পারিয়া উঠি নাই; সুতরাং সাতশতীরা আবহমান যাহা করিতেছে, তাহাই করুক; তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।"

[৩]

আভ্যুদয়িক আরম্ভ হইয়া গেল। সাতশতীদের আভ্যুদয়িক নূতন রকমের। তাহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় সর্ব্বপ্রথমে যে ভোজ্য উৎসর্গ হয়, তাহা হইল না ও তাহার দক্ষিণান্তও হইল না; তাহার পর যে চারিটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়, গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বাস্তুপুরুষ ও ভূস্বামির পিতৃগণের নামে, সে চারিটি ভোজ্য উৎসর্গ হইল না। মায়া দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন, আচমন করিলেন, পুরোহিত তাঁহাকে দুইটি হস্ত-কুশ দিলেন। বলিলেন, "অনামিকা অঙ্গুলিতে পর।" সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডীরা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, "একে স্ত্রীলোক, তাহাতে শূদ্র, কুশে উহার অধিকার কি! দূর্ব্বা দিয়া উহার হস্ত-কুশ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" অনেক গোলমালের পর কুশই রহিয়া গেল। সঙ্কল্পের পর সাতখানি পাত্র সাজান হইল, যত কিছু উৎকৃষ্ট খাবার পাত্রে রাখা হইল। সাত জন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সকলেই পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্—সাত পাত্রে বসিয়া গেলেন। দেবপক্ষের দুইজন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিলেন; পিতৃপক্ষের তিনজন উত্তরাস্য হইয়া

বসিয়াছেন; আর মাতামহপক্ষের তিন জন সেই সারেই বসিলেন। আবার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভিতর গোল বাধিয়া গেল। অনেকে বলিলেন, "কলিতে পংক্তি-ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ মিলে না। সে জন্য দর্ভময় ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা প্রথা হইয়া গিয়াছে। সারা বাঙ্গলা, মিথিলা, সরযূপার, নেপাল, উড়িষ্যা সব জায়গায়ই দর্ভময় ব্রাহ্মণ দিয়া শ্রাদ্ধের ব্যাপার চলিয়া গিয়াছে। এখানে এ আবার কি?" তখন বিধুভূষণ ফর্‌ফর্ বলিয়া উঠিলেন,—"প্রতি হাতে এরূপ আপত্তি করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে যে? আমার নব্বই বৎসর বয়স হইতে চলিল, বরাবর শূদ্রদের যে ভাবে কার্য্য করাইয়া আসিয়াছি, এখনও সেই ভাবেই করাইব। তাহাতে ক্রুটী হয়,—ধর, ঘাড় পাতিয়া লইব। অন্য দেশে কি আছে না আছে, তাহা দেখিবার দরকার নাই। আমরা সাক্ষাৎ হুগড়াচার্য্যের শিষ্য, তিনিই বেদের প্রথম টীকা লেখেন। তিনিই আমাদের দেশে আগাগোড়া বেদ মুখস্থ করা বন্ধ করিয়া দিয়া যান। যে জাতির যেরূপে ক্রিয়া করিতে হইবে, তিনিই আমাদের শিখাইয়া যান।" হুগড়াচার্য্যের নামে ও ফর্‌ফরের রাগে অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডীরা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ক্রিয়া চলিতে লাগিল।

এই যে সাত জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন, ইহাঁদের নাম পংক্তি। পংক্তি এক জনে হয়, তিন জনে হয়, পাঁচ জনে হয় ও সাত জনে হয়। সাত জনের অধিক ব্রাহ্মণ দরকার হয় না। শ্রাদ্ধেই পংক্তির দরকার হয়; অন্য কিছুতে দরকার হয় না; বাছিয়া বাছিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া পংক্তিতে বসাইতে হয়। কাণা, খোঁড়া, কুরূপ, কুৎসিত, ধবলওয়ালা, কুষ্ঠওয়ালা, কুনখী, কুদন্তী পংক্তিতে লইতে নাই। পংক্তির ব্রাহ্মণ বড় বাছিয়া লইতে হয় বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে দর্ভময় ব্রাহ্মণ চলিতেছে। কিন্তু দক্ষিণে এখনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, সেজন্য তাঁহারা পংক্তি হন ও ব্রাহ্মণ-পংক্তিতে বসেন। মায়া পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া ব্রাহ্মণদিগের

পূজা করিলেন, তাঁহাদের সৌমনস্যবিধানের জন্য প্রচুর ধূপ-ধূনা পোড়াইলেন এবং গন্ধদ্রব্য তাঁহাদের উপর বৃষ্টি করিলেন। এইরূপ পূজায় যখন তাঁহাদের মন অমল প্রফুল্ল হইল, তখন মায়া তাঁহাদের হস্তে এক একটি ফল তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা সেই ফল খাইলেন ও পরে পাত্র হইতে অনেক ফল-মূল ও মিষ্টান্ন লইয়া ভোজন করিলেন। ভোজনে তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা পাত্র ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ভোজনের স্থান পরিষ্কার করা হইল। মায়া সেখানে বসিয়া পিণ্ডদান করিলেন ও দক্ষিণান্ত করিলেন। পংক্তির ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লইলেন ও বলিলেন,—"আমরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমাদের জাত-ভাই আমাদের সঙ্গে খাইবে না, সে জন্য আমাদের কিছু পয়সা দাও। সে জন্য তাঁহাদিগকে কিছু পয়সা দেওয়া হইল,—তাঁহারাও তাহা যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

[৪]

ওদিকে যে সকল ব্রাহ্মণেরা হোমের স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মায়ার একহাত-প্রমাণ চৌকা জমী মাপিয়া লইয়া তাহার উপর কয়েক সরা বালি ছড়াইয়া দিলেন, সেই বালির উপর এ দিকে দেড় আঙুল ও দিকে দেড় আঙুল বাদ দিয়া একটি ২১ আঙুল রেখা টানা হইল। ব্রাহ্মণেরা যে দিকে বসিয়াছিলেন। সেই দিকেই রেখা টানা হইল। সেই রেখার ডাইন ধার হইতে পূর্ব্বমুখে একটি রেখা সাত আঙুল পর্য্যন্ত টানা হইল। তাহার পর মূল-রেখার সাত আঙুল বাদ দিয়া আর একটি রেখা টানা হইল। যে অস্ত্র দ্বারা রেখা টানা হইল, তাহার নাম স্ফ্য। স্ফ্যখানি কাঠের তয়েরী—ছোরার মত। বাঁট আছে, আগাটি সরু, সামনের দিক্ ধার, পিছনের

দিক্ মোটা। আগাটি ঠিক মাঝে না হইয়া একটু পিছনের দিক আছে। পূর্ব্বাস্থ রেখাগুলি টানিতে যে বালিগুলি উঠিল, বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা সে গুলিকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর বহ্নিস্থাপন। তিনটি রেখা টানায় দুইটি ঘর হইয়াছে ও বামদিকের ঘরে কাঁসার পাত্রে বহ্নি আনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল।

বহ্নি কোথা হইতে আনিবে? এক—যারা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে ও সেই অগ্নি বরাবর রাখে, তাহাদের বাড়ী হইতে অগ্নি আনা যাইতে পারে, অথবা মন্থন করিয়া অগ্নি আনা যাইতে পারে। মায়া স্থির করিল, মন্থন করিয়া অগ্নি বাহির করিতে হইবে।

একখানি শুক্‌নো অশ্বত্থকাঠ আনাইয়া তাহার মাঝে একটি ছেঁদা করাইল। সেই ছেঁদার মধ্য দিয়া একটি শাঁইবাবলার মোটা গোল করিয়া কোঁদা কাঠ অশ্বত্থের সেই ছেঁদায় বসাইয়া দিল। (বাঙ্গালায় শমীবৃক্ষ নাই, সে জন্য শাঁইবাবলার গাছে শমীবৃক্ষের কার্য্য করে)। ব্রাহ্মণেরা সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই শাঁইবাবলার কাঠ ঘুরাইতে লাগিলেন। অগ্নি সমিন্ধনে ব্যবহার হয় বলিয়া এই মন্ত্রগুলির নাম হইয়াছে সামিধেনী। ক্রমে যখন ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেশ একটু সহল হইয়া আসিল, তখন দুই পাশে দুই দল ব্রাহ্মণ বসিয়া দড়ী দিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে সামিধেনী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। কাঠগুলি ক্রমে খুব গরম হইয়া উঠিল। তাহার পর ধোঁয়া বাহির হইল, তাহার পর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির একখানি আঙরা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বাকীটা কাঁসার পাত্রে করিয়া বালির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল। তখন পুরোহিত আগুনের কাছে বসিয়া, তিনি মহাব্যাহৃতি হোম করিলেন; অর্থাৎ গাওয়া ঘিয়ে চামচের আকার কাঠের স্রুক্ ডুবাইয়া অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিলেন,—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।

[৫]

পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ লইয়া, বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া, এইবার পোষ্যপুত্র লওয়া হইবে। হোমের স্থানেও আভ্যুদয়িকের স্থানের মাঝখানে খুব জাঁকাল বিছানা করা হইয়াছে,—মখমলের বিছানা, জরীর কাজ, উপরে চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার ঝালরে মুক্তা ঝুলিতেছে। মধ্যে বসিয়া আছে, সাধন ধনী—যিনি পুত্র দিবেন, তাঁহার স্ত্রী ও রাজা বিহারী দত্ত। বহ্নি-স্থাপন করিয়া এবার ব্রহ্মণেরা বলিলেন, "এইবার পোষ্য-পুত্র গ্রহণের অনুমতি লও।" তখন বিহারী ও মস্করী মায়াকে সঙ্গে করিয়া প্রথমতঃ রাজসিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মা আসেন নাই, তাঁহার ভায়ের পৌত্র শ্যামল বর্ম্মা আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিলে, তিনি যে স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণসিংহাসনে মহারাজাধিরাজের যে তরবারি ছিল, তাহা মায়ার অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দাড়াইয়া উঠিয়া বড় ঠাকুরদাদার নাম উচ্চারণ করিয়া অনুমতি দিলেন। মায়া উহাঁকে কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, একটি দশমণি সিধা তাঁহার বজরায় পঁহুছে। তাহার পর ভবদেব; তিনিও অনুমতি দিয়া কয়েক-খানা স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন এবং একটি বড় সিধা পাইলেন। তার পর প্রধান সেনাপতি—তিনিও একটি সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন। শ্যামল বর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সমারোহ কার্য্যের অধ্যক্ষ কে?" অধ্যক্ষ ত ভবদেব শর্ম্মা নিজে। বিহারীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই ভবদেব বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্যে ভবতারণ পিশাচখণ্ডী অধ্যক্ষ।" তখন শ্যামল বর্ম্মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাথায় এক শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর মস্করী ও মায়া এক দিকে অনুমতি লইতে গেলেন, আর এক

দিকে গেলেন রাজা বিহারী দত্ত নিজে। আর দুই দিকে অনুমতি লইতে গেলেন দত্তবাড়ীর প্রাচীনেরা ও ধনীবাড়ীর প্রাচীনেরা। মস্করী মায়াকে লইয়া রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল-ব্রাহ্মণদের অনুমতি লইয়া, যেখানে বৌদ্ধেরা বসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ গুরু-পুত্র। মায়া তাঁহার অনুমতি লইতে আসিতেছেন, সঙ্গে মস্করী,—দেখিয়াই গুরুপুত্র থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া গেল। মায়ার কিন্তু গলা একবারও কাঁপিল না। সে বলিল, "আচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাস্থবির, ভদন্ত, আমি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব, আপনারা প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন।" গুরুপুত্র মনে মনে বলিলেন, "কি শীকারই পলাইল!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমতি আছে। সাতগাঁয়ে একটি প্রধান ধনিবংশ রক্ষা হইয়া যাইবে, ইহাতে কে আপত্তি করিবে?" মায়া তাঁহার সম্মানের সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া গেলেন এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মঠাধিকারীদেরও সেইরূপ সম্মান করিয়া গেলেন।

যাঁহারা অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া সাধন ধনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনার এই নূতন (পঞ্চম) ছেলেটির আজও চূড়াকরণ হয় নাই। আপনি এইটিকে আমাকে দিন। আমি ইহাকে পোষ্যপুত্র লইব; ইহার দ্বারা আমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে।" সাধন ধনী ছেলেটিকে কোলে করিয়াছিল, সে ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিবার সময় বলিল, "আমি এই ছেলেটিকে তোমায় দিলাম, ইহার দ্বারা তোমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে। তুমি ইহাকে মায়ের মত প্রতিপালন করিবে।" সাধন ধনী মনে করিয়াছিল, সে বীরের মত পুত্রটিকে দান করিবে, কিন্তু তাহা পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর বদ্‌লাইয়া

গেল ; সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার মনকে স্থির করিল ও ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিল। চারিদিকে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সভাস্থ সকলে সাধু সাধু বলিতে লাগিল ; চারিদিকে চারি দেউড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল ; ঘোর রোলে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গানে ও বাজনায় আনন্দের ফোরারা উঠিতে লাগিল। এদিকে দশজন চাকর ছেলেটিকে সাজাইতে লাগিল,—নানারূপ রেশমের কাপড়ে ও হীরা-জহরতে গরীবের ছেলে এক দণ্ডের মধ্যে বড়মানুষের ছেলে হইয়া উঠিল। মায়া তাহাকে কোলে করিয়া হোমের স্থানে উপস্থিত হইলেন ; পুরোহিতেরা তাহাকে হোমের ঘি খাওয়াইয়া দিলেন। মায়াও যে গোত্রের, ছেলেটিও সেই গোত্রের ; অতএব গোত্রান্তর করিতে আর কোন বিশেষ ক্রিয়ার আবশ্যক হইল না।

মায়া ছেলে কোলে করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলে, সকলেই ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল। প্রথমে রাজা আসিলেন ; তিনি এক ছড়া মুক্তার মালা দিলেন। তাহার পর ভবদেব আসিলেন ; তিনি একখানি কেয়ূর দিলেন। ব্রাহ্মণেরা কেহ বা শুদ্ধ ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া কেহ বা কিছু সোণারূপা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। ধনী বেণে ও অন্যান্য জাতিরা বিস্তর উপহার দিল। ধান্য-দূর্ব্বাগুলিতে ছেলেটি চাপা পড়ার মত হইলে সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হীরা-জহরত এত জমিল যে, ছেলের চেয়ে উঁচু হইয়া উঠিল। এমন সময়ে যিনি হোম করিতেছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার হোম হইয়াছে, তোমরা ফোঁটা লও।" সকলের আগে ফোঁটা লইলেন ছেলে ; হোমের ঘিয়ে হোমের কয়লা ঘষিয়া প্রথম কপালে, পরে কণ্ঠায়, পরে দুই কাঁধে, পরে বুকে ফোঁটা লওয়া হইল। তাহার পর লইলেন মা ; তার পর লইলেন বিহারী দত্ত। তাহার পর যে আসিল, পুরোহিতেরা তাহাকেই ফোঁটা দিতে লাগিল।

ইহার পর শান্তি-জলের ব্যবস্থা। কিন্তু অনেকেই বলিয়া উঠিল, "আমরা এখনও ছেলে আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠিতে পারি নাই।" সুতরাং শান্তি-জল স্থগিত রহিল। যে সকল লোক আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধরাই বেশী,—প্রত্যেক মঠধারী আপন আপন মঠের পুষ্প-চন্দন আনিয়াছিলেন ও ছেলেকে কিছু না কিছু মহামূল্য উপহার দিলেন। গুরুপুত্র হেরুকের প্রসাদী এক ছড়া মালা দিলেন আর একটি হীরার মাছ দিলেন। যে আটটি মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে মাছই সকলের আগে। গুরুপুত্রের মাছটির দুই চোখে দুইটি হীরা, নানা রকম পাথরে এমন ভাবে গড়া যে, মাছটি যেন নড়িতেছে। তিনি মাছটি, একটি সোণার হারে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন ; ছেলের গলায় পরাইতে গিয়া তাঁহার দুইটি আঙুল মায়ার গায়ে লাগিল ; সহসা যেন গুরুপুত্রের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। গুরুপুত্র যেন হঠাৎ হতচেতন হইয়া গেলেন ; কিন্তু অল্পেই আত্মসংবরণ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। বৌদ্ধস্পর্শে মায়া যদিও একটু বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার মনে হইল যে, তিনি এক জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু, মহাবিহারের অধিকারী লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানে, তখন তাহার আর সে বিরক্তি রহিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার তাহার অবসর ছিল না ;—থাকিলেও সে কথাটা সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরিত না। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলে শান্তি-জল। সভাশুদ্ধ লোক পা ঢাকিয়া বসিল। বিধুভূষণ ফর্‌ফর্‌ মহাশয় নারিকেলটি সরাইয়া দিয়া আম্রপল্লব জলে ডুবাইয়া সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন ও মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার হাত এমন দুরন্ত ছিল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভার সমস্ত লোকের গায়ে শান্তিজল ছড়াইয়া দিলেন এবং সকলেই "শান্তি শান্তি শান্তি—হরি হরি" বলিয়া উঠিল।

[৬]

তাহার পর ভোজনের পালা। গোলার দোতালার বারান্দায় ব্রাহ্মণদের পাত হইয়াছে। প্রায় ৪।৫ শত ব্রাহ্মণের জায়গা হইয়াছে। সাতশতীরা ফলার করিবেন, অর্থাৎ লুচি, ছক্কা, মিষ্টান্ন খাইবেন। রাঢ়ীশ্রেণীরা কেহ কেহ খৈ ও দৈয়ের ফলার করিবেন, কেহ বা শুদ্ধ ফল ও সন্দেশ খাইবেন। অনেকেই শূদ্রের বাড়ী জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না। পাত প্রায় প্রস্তুত, এমন সময়ে গোল উঠিল, ধনীদের গোলা গঙ্গার তিন শত হস্তের মধ্যে,—উহা গঙ্গাতীর। এখানে খাওয়াও যাইতে পারে না, দান লওয়াও যাইতে পারে না। ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীর দিন যতদূর জল উঠে, ততদূর গঙ্গার গর্ভ; তাহার পর তিন শত হাত গঙ্গার তীর। তাহার পর গঙ্গার ক্ষেত্র। গর্ভ ও তীরে কাহারও ভোজন করিতে নাই, দানও লইতে নাই। তবে যে মায়া ব্রাহ্মণগণকে সিধা ও স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, সেটা অনুমতি দেওয়ার সম্মান। "অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত দ্রব্য নহে," সুতরাং দান নহে। গোলায় ত কিছুতেই খাওয়া হইতে পারে না। গোল উঠিলেই রাজা বিহারী গোলা হইতে একটু পশ্চিমে পালধি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নাটচালা ছিল, সেইখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার লোকবলের অভাব ছিল না, মুহূর্ত্তমধ্যে ৪।৫ শত ব্রাহ্মণের স্থান প্রস্তুত হইল, পরিবেশনও হইয়া গেল। অনেক ব্রাহ্মণ—যাঁহারা শূদ্রান্নং শূদ্র-বেশ্মনি খাইতে রাজী ছিলেন না, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উদ্যোগ হওয়ায় তাঁহারাও বসিয়া গেলেন।

গোলার বারান্দায় অন্যান্য জাতি বসিল। ইহারা, বিহারীর কাজ যে সবই ভাল হইবে, তাহা বেশ জানিত, তাই একটি কথাও কহিল না।

তিনি যেমন যেমন বলিলেন, ঠিক তেমনি তেমনি করিতে লাগিল। বৌদ্ধেরা একটা প্রবল সম্প্রদায়। তাহাতে অনেক জাতি, অনেক ব্যবসায়ী, অনেক গৃহস্থ, অনেক অর্দ্ধ-গৃহস্থ অনেক পূরা গৃহস্থ। বৌদ্ধদের বিকাল-ভোজন নিষেধ। বিকাল শব্দের অর্থ দ্বিকাল। তাহারা দিনে দুবার খাইবে না। সকালে ১২টার মধ্যেই খাইবে। না খাইলে সমস্ত দিন কেবল ফলরস বা দুধ খাইয়া থাকিবে। কোনও কঠিন জিনিস খাইতে পাইবে না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আর বিকাল-ভোজন নিষেধ মানে না;—দুই বেলা খায়;—অসময়েও খায়। দু'চার জন বিকাল-ভোজন করে না। তাহাদের মধ্যে প্রায় মঠের অধ্যক্ষেরা। আমাদের গুরুপুত্র বিকাল-ভোজন করেন না। কিন্তু মায়া তাঁহারই উপর সমস্ত বৌদ্ধদের খাওয়াইবার ভার দিয়া দিলেন। গুরুপুত্রও কোমর বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। রাজার ভাণ্ডার, ফুরাইবার নহে; সকলেই পরম তৃপ্ত হইয়া ভোজন করিয়া গেল। তখন মস্করী ও মায়া গুরুপুত্রকে ধরিয়া বসিল, আপনাকে কিছু ফলরস পান করিতে হইবে। যে কয়জন মঠাধিকারী ভোজন করেন নাই, মায়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে আনারস, তরমুজ, ফলসার সরবৎ, দুধ, ঘোল প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া দিলেন। তাঁহারাও তৃপ্ত হইয়া গেলেন।

যত লোক আসিয়াছিলেন, সকলেই বেশ তৃপ্ত হইয়া গেলেন। কেবল দু'জনের মুখ ভার। একজন সাধন ধনী;—পাঁচটি ছেলে থাকিলেও একটি ত আজ থেকে তাঁহার পর হইয়া গেল। তাঁহার মনটা ঠিক প্রফুল্ল নয়। আর গুরুপুত্র আজ যাহা দেখিলেন, সবই অদ্ভুত। এমন মেয়ে ত তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একদিকে বজ্রাদপি কঠোর, আবার আর একদিকে কত নরম,—যেন মাটীর মানুষ। তাঁহার মনের কথা সব জানি না; তবে তিনি বড়ই বিচলিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

[৭]

সমস্ত নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া গেলে ছেলের কথা মায়ার মনে পড়িল। সে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল, দেখিল বিছানার উপর ছেলে খেলা করিতেছে। ৪।৫ জন চাকর-চাকরাণী তাহাকে খেলা দিতেছে। মায়া গিয়াই ছেলেটিকে কোলে করিল ও মুখে চুমা খাইল; বলিল,—"আমি তোমার কে বল দেখি?" সে বলিল, "নূতন মা।" "তোমার নূতন বাবা দেখিবে?" ছেলে বলিল,—"নূতন মা, নূতন বাবা, দেখিব বই কি—কই?" মায়া বলিল,—"চল দেখাই গে।" ছেলে কোলে করিয়া সে একলা গঙ্গার ধারেই যে এক সারি ঘর আছে, সেই দিকে গেল। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরের ভিতর দিয়া আর এক ঘরে গেল। গঙ্গার ধারের বড় জানালা খুলিয়া দিল, আলো আসিলে জীবন ধনীর পিশাচখণ্ডের সেই প্রতিমাখানি দেখা গেল। সে প্রতিমা এখনও ঠিক তেমনি আছে। কেন না, পিশাচখণ্ডের একজন কুমার আসিয়া প্রতি সপ্তাহে রং চটিলে রং দিয়া যায়, মাটী চটিলে মাটী দিয়া যায়।

প্রতিমার সম্মুখে মায়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল, ছেলেকেও বলিল—"নম কর।" ছেলেও মাটীতে মাথা ছোঁয়াইয়া নমস্কার করিল। সে ঘরে ধূপ-ধূনা, ফুল-চন্দন, দূর্ব্বা, আলো চাউল, অগুরু-গুগ্গুল সর্ব্বদা তৈয়ারি থাকে। মায়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধূনা দিয়া প্রতিমা পূজা করিল, খানিক কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিল, তার পর হাত জোড় করিয়া বলিল—"তোমারই হুকুমে তোমারই নাম ও গোত্র রক্ষার জন্য তোমারই জ্ঞাতি সাধন ধনীর এই ছেলেকে আমি পোষ্যপুত্র লইয়াছি। এখন ইহার মঙ্গলামঙ্গল তুমি দেখিবে। ইহাকে তোমারই হাতে অর্পণ করিলাম।" মায়া স্তম্ভিত হইয়া শুনিল, কে যেন বলিল,—"পমায়ু বাযুক।" প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া দেখিল, প্রতিমার ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে।

স্বামীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া মায়ার মহা আহ্লাদ হইল। সে ছেলেকে আবার বলিল, "নম কর।" ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল, "এ কে?" "তোমার নূতন বাবা।" ছেলে বলিল, "পুতুল বাবা,—মাটীর বাবা।" মায়া ছেলে কোলে করিয়া আর একটি ঘর খুলিল ও গঙ্গার দিকে যে জানালা ছিল, তাহা খুলিয়া দিল। সে ঘরে জীবন ধনীর সাঁজোয়া, পাগড়ি, আঙরাখা, তীর, ধনুক, তূণ, জুতা, কাপড় সব সাজান ছিল। মায়া প্রত্যেকটির কাছে গিয়া নমস্কার করিল ও ছেলেটিকে 'নম' করাইল বলিল,—"এ সব তোমার নূতন বাবার।" ছেলে বলিল, "মাটীর বাবার?—পুতুল বাবার?"

ছেলে কোলে করিয়া মায়া দূরে একটি উঠানে গিয়া পড়িল;—সে ত উঠান নয়, একটি কারখানা। কামার ও সেকরাদের অনেক যন্ত্রপাতি ছড়ান রহিয়াছে, পাশে একটা বারান্দায় অষ্টধাতুর একটি প্রতিমা তৈয়ার রহিয়াছে। মায়া সে প্রতিমার সম্মুখে গড় করিল, ছেলেকেও 'নম' করিতে বলিল। ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল, "এ কি বাবা?" মায়া হাসিয়া বলিল, "এ অষ্ট ধাতুর বাবা।" ছেলে বলিয়া উঠিল, "অট্ট ধাতুর বাবা?" মায়ার সব সাধের সামগ্রীগুলি ছেলেকে দেখাইল, ছেলের মঙ্গলামঙ্গল স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিল। তাহার পর ছেলে কোলে করিয়া যেমন বাহিরে আসিল, ছেলে বলিয়া উঠিল, "মা, ক্ষিধে পেয়েছে।" মায়ার চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "তাই ত, ছেলেটা দানের পর অবধি এখনও পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই।" আরও চমক ভাঙ্গিল যে, নিজেরও আজ সমস্ত দিন এক বিন্দু জলও পেটে পড়ে নাই। সুতরাং তাহাকে খাবারের চেষ্টায় যাইতে হইল। ছেলেকে একটু দুধ ও মিষ্ট খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে শাঁখ বাজিল। সন্ধ্যা হইয়াছে, আর খাওয়া হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

[১]

পিশাচখণ্ডী ভবদেব ভট্টকে বলিলেন, "রাজা বিহারী ও তাঁহার মেয়ে দুই জনেরই ত পোষ্যপুত্র লওয়া হইয়া গেল। এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, অনেকগুলি লোক আসিয়াছেন, অনেক কলাবৎ আসিয়াছেন, অনেক শিল্পী আসিয়াছেন, ইহাঁদের সকলকেই আস্‌চে বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাজসভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সকলেই আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সকলেই আসিবেন। আপনি উহাঁদের কিছু উপদেশ দিয়া দিন। রাজসভায় কিরূপ জিনিষ আনা উচিত, আর কিরূপ জিনিষ আনা উচিত নয়, কিরূপ জিনিসের পারিতোষিক দেওয়া উচিত, আর কিরূপ জিনিসের ধিক্কার হওয়া উচিত, তাহা আপনি বুঝাইয়া দিন। আমি উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, কামরূপ, শ্রীহট্ট, সমতট, বঙ্গ—এমন কি, সমস্ত বাঙ্গলা দেশ নিমন্ত্রণ করিয়া অঙ্গ-রাজ্য, চম্পানগরও নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার

আরও কিছু দূর উত্তরে বিক্রমশিলা বিহারে যাইয়া দেখি, সেখানকার পণ্ডিতেরা কালচক্রের আলোচনা করিতেছেন। এ কালচক্র তন্ত্র নহে—জ্যোতিষ। আমি তাঁহাদের গণনায় জানিলাম, অক্ষয় তৃতীয়ার আর পাঁচ দিন আছে। সুতরাং মায়ার পোষ্যপুত্র গ্রহণে আমাকে ত থাকিতে হইবে, আমি একখানি ছিপ ভাড়া করিলাম। আমি তিন দিনের মধ্যে সাতগাঁয়ে আসিলাম; আসিয়া দেখিলাম, এই এক মহা সুযোগ।

আপনিও উপস্থিত আছেন। বাঙ্গালার সবগুলি লোক এখানে উপস্থিত আছেন। এখন যদি পাকা মাঝী সাজিয়া ইহাদিগকে ঠিক পথে চালাইয়া দিতে পারেন, তবে রাজসভায় আপনারই কার্য্যের লাঘব হইবে। অনেক সময় বাঁচিয়া যাইবে, অনেক বাজে কাজ করিতে হইবে না।"

ভবদেব ভট্ট বলিলেন—"বেশ ত। কথাটা তুমি ভালই বলিয়াছ, বিদায়ের দিনে সকলে ত একত্র হইবেন, সেই দিন যাহা হয় করা যাইবে।"

[২]

তিন চার দিন পরে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। রাজা ও সেনাপতি চলিয়া গিয়াছিলেন, কারবারী বেণেরাও অনেকেই চলিয়া গিয়াছিল; বিষয়ী লোকও প্রায়ই চলিয়া গিয়াছিল; ছিলেন কেবল পণ্ডিত, কলাবৎ, কারিকর, শিল্পী ও অন্যান্য গুণিজন। পিশাচখণ্ডীও ইহাঁদেরই চান। বিদায়ের দিন আহারান্তে সকলে উপস্থিত হইলে ভবদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয়, ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া থাকিবেন, পরম ভট্টারক—পরমেশ্বর—মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী ১০৮ হরিবর্ম্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁএর চড়ায় রাজসভা করিয়া কাব্যশাস্ত্র, কলা, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই গুণিগণের সমাদর করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবেন, দুঃস্থ গুণিগণের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এজন্য মহারাজ যে সমস্ত সাতগাঁএরই এক বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিবেন, এমন নহে, তাঁহার বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্যের এক বৎসরের রাজস্বই এই একই কার্য্যে ব্যয় করিবেন; তাহাতেও যদি সঙ্কুলান না হয়, তবে তাঁহার বহুকাল-সঞ্চিত রত্নরাশিতেও হস্তক্ষেপ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে হিন্দু সম্রাট্‌গণ পাঁচ বৎসর অন্তর এইরূপ রাজসভা করিতেন এবং গুণিজনের পুরস্কার দিতে দিতে আপন শিরস্ত্রাণ, এমন কি, অঙ্গের মহার্হ পরিচ্ছদ পর্য্যন্তও দান করিয়া একবস্ত্রে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের অদেয় থাকিত কেবল দুইটি জিনিষ,—রাজচিহ্ন ও যুদ্ধের উপকরণ। মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার অনুচরবর্গ ও তাঁহার সদস্য-বর্গ আমরা সকলে প্রাণপণ যত্নে, যাহাতে এই ব্যাপার মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করিব। আমাদের বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমরা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এরূপ মহাসভা কোথাও দেখি নাই। আমাদিগকে পুরাতন কাগজপত্র ও পুস্তকাদি দেখিয়া কার্য্যপ্রণালী অবধারণ করিতে হইবে। তাহাতে যদি কোন ত্রুটি হয়, আপনারা নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

গুণিজনের এই পুরস্কার-ব্যাপারে আমরা সম্প্রদায় বাছিব না, বংশ দেখিব না, জাতি দেখিব না;—দেখিব কেবল কে কেমন কবি, কে কেমন শিল্পী, কে কেমন শাস্ত্রজ্ঞ, কে কেমন কলাবিৎ। আমরা ভাষার বিচার করিব না; সংস্কৃত, বাঙ্গালা, মাগধী, শৌরসেনী যে কোন ভাষাতেই পরীক্ষা গ্রহণ করিব। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদেরও এক বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। আপনারা সকলেই গুণিজন;—গুণহীন, অসার, অপদার্থ কিছুই আমাদের সম্মুখে আনিবেন না। যাহা কিছু আনিবেন, তাহার প্রথম পরীক্ষা আপনাদেরই কাছে। আপনারা ভাল জিনিস না হইলে, কিছুতেই আনিবেন না। কেন না, এরূপ মহাসভায় পুরস্কৃত হইলে আপনাদের যশ যেমন দিগ্‌দিগন্তে বিশ্রুত হইবে, তেমনি তিরস্কৃত হইলে আপনাদের অপযশের আর সীমা থাকিবে না। গুণিজনের পুরস্কার করিতে আমাদের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনই তিরস্কার করিতে হইলেও আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। অতএব আপনারা

বিধিমতে চেষ্টা করিবেন, যেন তিরস্কারের মত কিছু মহাসভায় উপস্থিত না হয়।

[৩]

আরও কয়েকটা কথা আপনাদিগকে আমি বলিয়া দিব। এমন যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন,—তিনি কত গুণিজনকে কত লক্ষ লক্ষ দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু—তাঁহারও কলঙ্ক আছে। তিনি আপনার সমক্ষে আপনার স্তুতিবাদ না শুনিয়া দান করিতেন না। শ্রীহর্ষেরও সে কলঙ্ক আছে। আমাদের মহারাজ, সম্মুখে আত্মস্তুতি, বিষবৎ পরিহার করিয়া থাকেন। আপনারা কেহ তাঁহাকে অশোক, বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করিবেন না; তাঁহাকে সরস্বতীর বা বৃহস্পতির অবতার বলিয়া সরস্বতীর ও বৃহস্পতির অবমাননা করিবেন না। আপনারা নাটক লিখিয়া তাঁহার যশোগান করিবেন না বা তাঁহার নামে কাব্য নাটকাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি একজন খাঁটি মানুষ, তিনি চান খাঁটি জিনিস, ভেঁজাল দেখিতে পারেন না। আপনারা ভেঁজাল জিনিস চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। গুণের আদর ভিন্ন এত ব্যয়ে এত সমারোহে তাঁহার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। আপনারা মনে করিবেন না, তিনি তোষামোদে তুষ্ট হইয়া কাহাকেও পুরস্কার করিবেন। পরম শত্রুরও গুণ দেখিলে তিনি তাঁহাকে আদর করিবেন।

সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস। সনাতন ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানই তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, সনাতন ধর্ম্ম অপেক্ষাও আর এক উচ্চতর রাজধর্ম্ম আছে,—তাহার নাম গুণের আদর। একটা নির্গুণ পুরুষকে গুণের আদর দিতে

তাহার দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হয়, শত শত চোর-ডাকাতেও দেশের তত অনিষ্ট করিতে পারে না। নির্গুণকে গুণীর আদর দেওয়া তিনি পঞ্চমহাপাতকেরও উপর মহাপাতক বলিয়া মনে করেন। একজন নির্গুণ পুরুষকে গুণীর পদে বসাইলে, সে যত দিন বাঁচিবে, সমস্ত গুণিজনের অবমান করিবে। দেশ হইতে একটা গুণই হয় ত লোপ হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেও তিনি বৌদ্ধ ও জৈন কবির যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ চিত্রকর, বৌদ্ধ সূত্রধর, বৌদ্ধ স্বর্ণকার তাঁহার বড় আদরের পাত্র। জ্যোতিষীরা ত শাকদ্বীপী; কিন্তু মহারাজ তাঁহাদের কতই না আদর করিয়া থাকেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র এখন ত বৌদ্ধ-মঠে ও জৈন-উপাশ্রয়েই আশ্রয় পাইয়াছে। তথাপি সেখানেও একটা নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে, মহারাজের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না।

সুতরাং আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, পবিত্র গুণরাশি লইয়া আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সভারোহণ করিবেন।”

[৪]

ভবদেবের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই ‘সাধু—সাধু’ বলিতে লাগিলেন। দুই একজনে আবার ভবদেবেরই ভাষ্যভূত দুই একটা বক্তৃতাও করিলেন। পিশাচখণ্ডী বারংবার বলিতে লাগিলেন,—“আপনারা বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিবেন।” হঠাৎ গুরুপুত্র

দাঁড়াইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—মস্করী মহাশয় ভারতবর্ষের যাবতীয় বৌদ্ধ গুণিগণকে এই সভায় একত্র করিবার ভার আমার উপর দিয়াছেন; আমিও আনন্দের সহিত সে ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং কয়েক মাস ধরিয়া এই চেষ্টাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি; বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরাই দেশভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা দেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। একজন জৈন-পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, "যে কবি ছয় ভাষায় সমান কবিতা লিখিতে না পারে, সে কবিই নহে। মহামহো- পাধ্যায় ভবদেব ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৈদ্যশাস্ত্র বৌদ্ধমঠ ও জৈন-উপাশ্রয়কেই আশ্রয় করিয়াছে; শুধু বৈদ্যশাস্ত্র কেন?—সমস্ত শিল্প ও কলা আজিও বৌদ্ধগণের করায়ত্ত। কার্পাস-বস্ত্রই বলুন, ক্ষৌম-বস্ত্রই বলুন, পত্রোর্ণাই বলুন, চিত্রকার্য্যই বলুন, ভাস্করকার্য্যই বলুন, শিলালিপিই বলুন, দেব- প্রতিমাই বলুন, মনুষ্যপ্রতিমাই বলুন, গীতবাদিত্রই বলুন, সবই এখন বৌদ্ধদের হাতে। ইহাঁরা যাহাতে আপন আপন উত্তম উত্তম শিল্পকার্য্য রাজসভায় উপস্থিত করিতে পারেন, আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি নিজে রাজসভায় উপস্থিত থাকিব,—পরীক্ষা দিব; প্রয়োজন হইলে রাজার আদেশে পরীক্ষকের আসনও গ্রহণ করিব। শুনিয়াছি, অনেক কুলবালা পরীক্ষা দিতে আসিবেন। আমিও বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আনাইবার চেষ্টা করিব। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা আপন আপন ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া কবিতা লিখিবেন। মহারাজাধিরাজ যেন বিধর্ম্মীর মত বলিয়া সেগুলি উপেক্ষা না করেন। আহা, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা এই সময়ে জীবিত থাকিলে তাঁহার আনন্দ আর ধরিত না। তিনি কলিযুগ-পাবনাবতার মহারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি যেমন বিদুষী ও পণ্ডিতা, তেমনই কবি ও সাধিকা। তিনি অল্প দিন হইল দেহ রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যার ভিতরে অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন। আমি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ

করিবার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ফাল্গুনী পূর্ণিমার অপেক্ষা করিব ও সাধ্যমত মহাসভার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব।"

গুরুপুত্রের বক্তৃতায় সকলেই জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল।

[৫]

রাজা বিহারী দত্তের কর্ম্মচারীরা প্রচুর অর্থ লইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে বসাইল এবং তাঁহারই হাত দিয়া গুণিজনের পাথেয় ও বিদায় দিতে লাগিল। পাথেয়ের হিসাব করিতে এই কর্ম্মচারীরা দক্ষ—বৃহস্পতি। কারণ, তাহারা যাবজ্জীবন ধরিয়া বেণেদের ঠকাইয়া বিস্তর পাথেয় লইয়াছে, সুতরাং তাহার জন্য আর ভবদেবকে অধিক বকাবকি করিতে হইল না। কিন্তু বিদায় লইয়া অনেকে অনেক রকম গোল বাঁধাইল। কিন্তু পিশাচখণ্ডী হাত একটু দরাজ করিয়া দিয়া সব গোল থামাইয়া দিলেন। তাঁহার সৌজন্যে, সদালাপে ও মিষ্ট কথায় বাঙ্গলা-শুদ্ধ লোক যেন বশ হইয়া গেল। বৌদ্ধেরা কেহ কোনরূপ গোল তুলিলে গুরুপুত্র তখনই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন,—'গোল করিও না।' বিদায় লইয়া সকলে 'জয়োঽস্তু' 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সাতগাঁ আবার ৭।৮ মাসের জন্য যে ভোঁ ভোঁ—সেই ভোঁ ভোঁ হইয়া রহিল।

[৬]

গুরুপুত্র ইতিমধ্যে অনেক কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা দেবীর দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া জনকয়েক

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি অনেক অন্বেষণের পর দক্ষিণ-রাঢ়ের এক কোণে এক নিভৃত স্থানে নাঢ়পণ্ডিতের খোঁজ পাইলেন। নাঢ়ী আবার সেখান হইতে দশ ক্রোশ তফাতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে বার বার লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে সদলবলে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শেষ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এক মহাবিহার হইতে খবর পাই-লেন যে, তিনি বহুসংখ্যক কীর্ত্তনীয়া লইয়া ভোটদেশে গিয়াছেন। তিনি আরও খবর পাইলেন যে, গুরুদেব শীতের পূর্ব্বেই নেপালে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তথাকার রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি নেপালে ললিতপত্তনে লোক বসাইয়া রাখিলেন,—গুরুদেব যেন শিবচতুর্দ্দশীর পরই যাত্রা করিয়া সাতগাঁ চলিয়া আসেন।

ভাস্কর-কার্য্যে বৌদ্ধদিগের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। সে খ্যাতি বজায় থাকে, গুরুপুত্রের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। যেখানে যে পাথরের ভাল মূর্ত্তিটী প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তা বৌদ্ধদেরই হউক বা হিন্দুদেরই হউক, আনাইয়া রাখিলেন। সোণার গহনা বৌদ্ধবিহারে ভাল হইত। বিহারের উপর বিশ্বাস করিয়া সকলেই বিহারের সেক্‌রার হাতে সোণা দিত। কি নকাসির কাজে, কি পালিসে, কি হীরা কাটায়, কি ক্ষোদকারীতে বিহারের সেক্‌রারা সিদ্ধ-হস্ত ছিল। অনেক ভাল ভাল গহনা গুরুপুত্রের খাতিরে তাহারা তৈয়ারি করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহারই কাছে রাখিয়া গেল। কাঠের উপর নক্সাও বৌদ্ধেরা খুব করিত। ভাল ভাল নক্সা-করা কাঠের জিনিস মহাবিহারে আসিতে লাগিল।

কিন্তু গুরুপুত্রের ঝোঁক—তিনি কাব্য, লিখিয়া পুরস্কার পাইবেন। তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত। বহুসংখ্যক প্রাকৃতভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন; কিন্তু সে সকলের দিকে তাঁহার ঝোক নাই, তাঁহার

ঝোঁক বাঙ্গালার দিকে। অল্পের মধ্যে একটী বা দুইটী পদে রস ফুটান তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। যখনই সময় পাইতেন, চক্ষু উপরে তুলিয়া কলম হাতে লইয়া কি ভাবিতেন। দুই মাস তাঁহার ভাবিতে গেল, তাহার পর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখেন আর ছিঁড়িয়া ফেলেন। কত তালপাতাই যে ছিঁড়িলেন, তাহার ঠিকানা নাই; তথাপি তাঁহার মনের মত কবিতা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

[১]

সাতগাঁয়ের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পিশাচখণ্ডী নিমন্ত্রণে বাহির হই-লেন। বিক্রমশীল পর্য্যন্ত তিনি ত পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন, এবার সেখান হইতে আরও পশ্চিমে চলিলেন। বিক্রমশীল হইতে কয়েক ক্রোশ গিয়াই গঙ্গাতীরে মুদ্‌-গগিরি (মুঙ্গের), অঙ্গ ও মগধের সীমা। গঙ্গার ধার হইতেই পাহাড় উঠিয়া অনেক দূর মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর দুর্গ,—চারিদিকে মুর্চ্চা বাঁধা। নিকটেই কষ্টহারিণীর ঘাট। সেখান হইতে কিছু দূরে সীতাকুণ্ড। মস্করী সকল জায়গায় তীর্থের কাজ করিলেন, দুর্গাধিপতির সহিত দেখা করিলেন, শিল্পীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, আবার পশ্চিমদিকে নৌকা করিয়া চলিলেন।

এখন যেখানে বক্তিয়ারপুর হইয়াছে, সেখানকার ঘাটে নৌকা লাগিল। মাঝীদিগকে পাটনায় গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মস্করী জনকয়েকমাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিল। এইখানটাই মগধের প্রধান জায়গা—বড় বড় মাঠ, বড় বড় গ্রাম, বড় বড় গোচর—প্রচুর ফসল হয়, প্রচুর দই দুধ পাওয়া যায়, প্রচুর চিঁড়া, প্রচুর মুড়কি, প্রচুর মিষ্টান্ন, প্রচুর খোয়া-ক্ষীর, প্রচুর খাজা। মস্করী সন্ধ্যার পরই কোন গোয়ালার গোয়ালে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খান। তাঁহার সঙ্গীরা বাজারের মিষ্টান্ন খাইয়া ও চিঁড়া-মুড়কির ফলাহার করিয়া দিন কাটান। এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই বৌদ্ধপ্লাবিত দেশে ভাল ব্রাহ্মণ একেবারেই পাওয়া যাইত না। জ্যোতিষব্যবসায়ী ঘরকতক আচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিল।

তাহাদের আচার-ব্যবহারে বৌদ্ধদের চেয়ে কোনমতেই ভাল নয়। ভুঁইয়ার জাতির এখনও বোলবোলা হয় নাই। কিন্তু জাতিটা গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা বিহারের জমী ছাপাইয়া খাইতেছে, তাই উহাদের নাম হইয়াছে ভুঁইহার বা ভুমিগ্রাহক। উহারা এখনও বৌদ্ধই আছে, কিন্তু 'বাভন' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মস্করী তাহাদের বাড়ীতে অতিথি হইতে রাজী নন।

মস্করীর পা খুব চলে। তিনি সকালে বার ক্রোশ গিয়া কোথাও আড্ডা লয়েন, বৈকালেও ৫।৪ ক্রোশ হাঁটেন। দুই দিনের পর তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, একটা কি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তিনি সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিলেন,—"বল দেখি ওটা কি ?" কেহ বলিল স্তূপ, কেহ বলিল মন্দিরের চূড়া। একজন বলিল,—"না ওটা গোপুর। দেখিতেছেন না, উহার মাথায় দুইটা চূড়া? মন্দির বা স্তূপ হইলে এরূপ হইত না। বোধ হয়, ওড়্'টা কোটের দুয়ার পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মগধের রাজধানী ওদন্তপুরী অতি নিকট। ওড়্'টা ওদন্তপুরী বিহারের এক দিকের দরজা। মস্করী আগে-ভাগেই ওদন্তপুরীর রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া দিলেন।

দূত গিয়া অল্প চেষ্টাতেই রাজার দর্শন পাইল। দূত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রীতিমত শিষ্টাচারের পর বলিল,—"বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিয়া কাব্যে, শাস্ত্রে ও শিল্পে গুণিজনের পুরস্কার করিবেন এই জন্য তিনি রাঢ়দেশের ব্রাহ্মণ ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে আপনার দেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ আপনার দেশের সমস্ত গুণিজকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পিশাচখণ্ডীকে আপনি সাহায্য করেন, যেন একটীও বাদ না যায়,—ইহাই তাঁহার একান্ত অনুরোধ।

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিশাচখণ্ডী মহাশয় কোথায় ?"

"তিনি নিকটেই আছেন।"

রাজা তাঁহার পাত্র-মিত্রগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষকে বলিলেন,— "তুমি গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।"

[২]

পিশাচখণ্ডী উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার সহিত সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক উঠিয়া দাড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পিশাচখণ্ডীও তাঁহাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং রাজা তাঁহাকে যে আসন দেখাইয়া দিলেন, সেই আসনে বসিলেন। তিনি কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজা বলিলেন :—

"বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেব যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা অতি সাধু। তিনি যে দেশভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ বিচার না করিয়াই গুণিজনের পুরস্কার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা আরও সাধু। মগধ এককালে গুণিজনের খনি ছিল বলিলেই হয় ; কিন্তু এখন মগধের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রী ৺ শ্রীনগর পাটলিপুত্র এখন প্রায় গঙ্গার গর্ভে। আমরা একরূপ মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছি বলিলেই হয়। এখানে যাহা কিছু আছে, আপনি অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারেন। এখানে বিহারে বিহারে এখনও কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পাওয়া যায়। এখনও এখানে পাথরের কাজ খুব ভাল হয়, সোণারূপার কাজ খুব ভাল হয়, মিষ্টান্নও খুব ভাল হয়। যত রকম শিল্পী আপনার ইচ্ছা হয়, লইয়া যাইতে পারেন। এমন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহারা

যদি পরীক্ষা দিয়া পারিতোষিক পায়, তবে ত সে আমারই গৌরব,—আমার রাজ্যেরই গৌরব।” তাহার পর পাত্র-মিত্রবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“আপনারা সকলেই যথাসাধ্য পিশাচখণ্ডীর সাহায্য করুন।”

রাজার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পিশাচখণ্ডী অনেকক্ষণ তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং সময় সংক্ষেপ, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যটা সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য রাজাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা, পিশাচখণ্ডী যে কয়দিন ওদন্তপুরীতে থাকিবেন, তত দিনের জন্য তাঁহার থাকার ও চাকর-বাকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি মগধদেশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, সেজন্য তাঁহার যান বাহনের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কথা হইল, পিশাচখণ্ডীকে পাটনার ঘাটে উঠাইয়া দিয়া যান-বাহন ফিরিয়া আসিবে। সেইদিনই পিশাচখণ্ডী রাজার প্রধান পাত্র বুদ্ধরক্ষিতের সহিত ওদন্তপুরী দেখিতে গেলেন।

নগরের সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলেন কষ্টি-পাথরের থাম;—থামে কত রকম মালা, কত রকম হার, কত রকম গহনা ঝুলিতেছে; থামের মাথায় প্রায়ই পদ্ম,—কোনটা কুঁড়ী, কোনটী ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোন স্থানে থামটাই মানুষের মূর্ত্তি,—মাথায় বালক। নানা রকম কষ্টি-পাথরের নানা মূর্ত্তি;—বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, কত কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি। ক্রমে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে গেলেন। এই বিহারের দুয়ারই তিনি বহু ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুয়ারটী আছে বটে, কিন্তু কখনও বন্ধ হয় না।

ভিতরে গিয়া দেখেন, দুই-তালায় দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর থাকিবার স্থান; জায়গায় জায়গায় ভাণ্ডার, বহুতর খাবার জিনিষ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ রহিয়াছে; কোন কোন জায়গায় বা যাত্রার সব সরঞ্জাম, কত কত আসা, কত কত সোঁটা, কত কত নিশান, কত কত খুন্তি, কত কত

অর্দ্ধচন্দ্র, রূপার সোণার রাশি রাশি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি;—কাহারও হীরার চোখ, কাহারও পান্নার চোখ, কাহারও নীলার চোখ। যে সময়ের কথা হইতেছে, মহম্মদীয়া বাক্তিয়ার তাহার ২০০ বৎসর পরে এই বিহারই লুট করিয়া এত সোণা-রূপা-হীরার বৌদ্ধমূর্ত্তি পাইয়াছিল যে, সেগুলি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য সত্তরটা অশ্বতর লাগিয়াছিল। এই বিহারের ভাণ্ডারে রাশি রাশি তালপাতার পুথি ছিল, সিন্দুক-ভরা কারচুপিকরা রেসমের কাপড় ছিল, শত শত চামর ছিল, আর ধূপদান ও দানপত্র যে কত রকমের কত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। তিনি সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং যাহা যাহা বাঙ্গালায় পাঠাইবার সমস্ত চিহ্ন করিয়া দিলেন; রাজপাত্র স্বীকার করিলেন, সেগুলি যথাসময়ে সাতগাঁএ পাঠাইয়া দিবেন।

ওদন্তপুরীর বাজারে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী দেখিলেন, নানারূপ মিষ্টান্নের দোকান। এখানকার লোক প্রায়ই সব বৌদ্ধ। তাহাদের বাজারের জিনিস খাইতে আপত্তি নাই। অনেকে তাই খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুতরাং বিচিত্র বিচিত্র খাবারের জিনিস তৈয়ারী হইতেছে। খাবারের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট—খাজা, আর সিলাবের চিঁড়া—যেমন ছোট, তেমনি মিষ্ট, আর তেমনি সুগন্ধ। দুধের জিনিস সকল রকমই পাওয়া যায়—দই, দুধ, ক্ষীর, ননী, মাখন, খোয়া—বোধ হয়, দ্বাপরের বৃন্দাবন যেন এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। ওদন্তপুরীতে দিন-কয়েক থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহাকে পরদিন প্রত্যূষেই চলিয়া যাইতে হইল; কেন না, সময় সংক্ষেপ, কাজ বেশী।

তিনি নালান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধরক্ষিত। সে বলিল—“বুদ্ধদেবের প্রথম প্রধান ব্রাহ্মণ-শিষ্য শারীপুত্রের জন্মস্থান—নালান্দায়। তাঁহার মা সশরী জমিদারের মেয়ে। শারীপুত্র পীড়িত হইয়া

মায়ের কোলে আসিয়াই মরিলেন। মাও আপনার সমস্ত সম্পত্তি সঙ্ঘে দিয়া যান। সেই সম্পত্তি হইতেই নালন্দাবিহারের উৎপত্তি ও উন্নতি। ৫০০।৬০০ বৎসর হইতে এখানে পণ্ডিতের কিছু বেশী সমাগম হইতেছে। গুপ্তরাজেরা এখানে বড় বড় বিহার দিয়া গিয়াছেন। চলুন দেখিবেন, এখন তাহাদের আর সে শ্রী নাই। মহারাজ যে বলিয়াছেন, তিনি মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছেন, সে কথাটা ঠিক।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে দূরে একটা বটগাছ দেখা গেল। বুদ্ধ রক্ষিত বলিলেন, "ঐ বটগ্রাম। ওখানে সূর্য্যের একটা কুণ্ড আছে, সূর্য্যের একটা প্রতিমা আছে, তাঁহার পূজা হয়, কয়েকঘর ব্রাহ্মণও আছেন। চলুন, তাঁহাদের বাটীতে বিশ্রাম করিয়া আপনি নালান্দায় যাইবেন। নালান্দায় যদিও এখন সে গৌরব নাই, তবু আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন—কত বড় বড় বাড়ী, কত বড় বড় বিহার, কত বড় বড় স্তূপ, কত ভাল ভাল মূর্ত্তি, কত কত পণ্ডিত, কত কত ছাত্র: আর দেখিবেন—রাশি রাশি পুথি।"

নালান্দায় একটা বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার একধারে বড় বড় বিহার—একটার পর একটা, তার পর একটা, দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,—আর একধারে কেবল স্তূপ; বড়টা ২০০।২৫০ ফুট উঁচা; আর মাঝারি, ছোট যে কত আছে, তার ঠিকানা নাই। এখন বৌদ্ধধর্ম্মের হীনাবস্থায় বাড়ী বা স্তূপ ভাঙ্গিলে আর মেরামত হয় না। কিন্তু এখনও লোকের ধর্ম্মের উপর এতদূর শ্রদ্ধা যে, জায়গাটী তাহারা এতই পরিষ্কার রাখিয়াছে;—সর্ব্বদাই ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ করে। বিহারগুলি ও স্তূপগুলির ওপাশে পড়ুয়াদিগের কুটী—একটা একটা কুটী পাঁচিশের বদ্ধ ঘর,—সামনে দাওয়া। ইহারই মধ্যে পড়ুয়ার খাইবার, থাকিবার, বসিবার ও পড়িবার যায়গা। সবই তাহাকে নিজ হাতে

করিতে হয়। মাঝে মাঝে বড় বড় আটচালা,—সেইখানে বসিয়া তাহারা পরস্পর আলাপ করে, শাস্ত্রচর্চ্চা করে, তর্ক-বিতর্ক করে, পড়া লয়, পড়া দেয়। কোন বিদেশী পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে এইখানেই সংবর্দ্ধনা করে। মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালা—বিদেশী লোকের থাকিবার স্থান তাহারও উঠানে আটচালা—গল্প-গুজব-আমোদ-প্রমোদের জায়গা। নালান্দার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রকাণ্ড এক উঠানের মাঝখানে এইরূপ এক আটচালায় বোধিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে শান্তিদেব, মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে শান্তিধামে চলিয়া যান।

রাস্তার ধারে যে সকল বিহার ছিল, তাহার ঠিক মাঝখানে বালাদিত্য-বিহার—চারি-তালা উচা। এখনকার লাট সাহেবের বাড়ীতে যেমন বাহির দিয়া প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি দু-তালা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহারও ঐরূপ এক সিঁড়ি একেবারে রাস্তা হইতে দু-তালা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দু-তালার উপর সিঁড়ির সাম্‌নেই একটা খোলা চাতাল, তাহার বাহিরে বারন্দোটি চারিদিক্ ঘুরিয়া গিয়াছে। বারান্দার ওপাশে সারি সারি ঘর। বারান্দার নীচে একতালায় এক প্রকাণ্ড উঠান, তাহার এক কোণে একটা প্রকাণ্ড ও গভীর কূয়া। কিন্তু বারান্দার নীচে নীরেট পাচীল, একটিও দুয়ার বা জানালা নাই। উঠানে নামিবার বা কূয়া ব্যবহার করিবার একমাত্র উপায় একটা সিঁড়ি দিয়া নামা। দু-তালার বারন্দার উপর তিনতালার বারান্দা, তাহারও চারিদিকে ঘর। এইরূপ চার-তালায়ও বারান্দা ও ঘর। সিঁড়ির সাম্‌নে দু-তালায় যেখানে খোলা চাতাল আছে, তাহার উপরে তে-তালা ও চৌ-তালায় অধ্যক্ষের থাকিবার স্থান।

অধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত, খুব লম্বা-চওড়া, বেশ সুপুরুষ; এখন পঁচাশী বছর বয়স হইয়াছে, তথাপি দেহের ও মনের বেশ জুৎ আছে। বিহারের নিয়মমত তাঁহার বার জন চাকর আছে। পালা করিয়া তিন জন তিন জন

দিন-রাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। প্রত্যহ সকালে তিনি একবার নামিয়া আসেন, নালান্দার বড় রাস্তায় খানিক পাইচারি করেন, তাহার পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া নালান্দার বড় দীঘীতে স্নান করিয়া উপরে উঠেন, উঠিয়াই আহার করেন। আহারান্তে বসিয়া বসিয়া খানিক বিশ্রাম করেন। দিবানিদ্রা ত একেবারেই নাই, রাত্রিতেও "শয়নং যোগনিদ্রয়া।" বিশ্রামের পরই কার্য্য আরম্ভ। তিনি যে কেবল বালাদিত্য বিহারের কর্ত্তা, শুধু তাই নয়, নালান্দার সমস্ত বিহারই তাঁহার কথায় চলে। বিদ্যার্থী বা পড়ুয়াদের যে সন্দেহ, তাহা আর কেহই মিটাইতে পারিত না, তাঁহার কাছে আসিলেই সে সন্দেহ মিটিয়া যাইত। তিনি পুরাদস্তুর মহাযানপন্থী ছিলেন। মহাযানের মূলগ্রন্থগুলি টীকা টিপ্পনীর সহিত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

একদিন বিশ্রামের পর বুদ্ধরক্ষিত পিশাচখণ্ডীকে লইয়া সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচখণ্ডী চারি-তলা হইতে নালান্দার শোভা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সারি সারি বিহার ও সারি সারি স্তূপের পর—যে দিকে চাহেন,—কেবল পড়ুয়াদের কুটী। বিহারগুলি যদিও কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও বেমেরামত আছে, কিন্তু পড়ুয়াদের কুটীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়ুয়ারাও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহাদের অধিকাংশই পাঠে তন্ময়। সমস্ত জায়গাটিই যেন সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র। পিশাচখণ্ডী নিজে ব্রাহ্মণ ও ঘোরতর বৌদ্ধদ্বেষী। তিনি উহাদিগকে অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, নাস্তিক, অতিপাষণ্ড বলিয়াই জানেন। কিন্তু এখানে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন তাঁহার মনের ভাব বদল হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতকে বলিলেন:—

"ভবন্ত, আমি বঙ্গাধিপতি শ্রীহরিবর্ম্মদেবের দূত হইয়া আসিয়াছি। তিনি আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সাতগাঁয়ে রাজসভা করিবেন। সেখানে কাব্যে, শাস্ত্রে, শিল্পে ও কলায় পারদর্শী লোকগণকে পুরস্কার দিবেন।

আপনি নালান্দা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন পণ্ডিতকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন।”

সর্ব্বজ্ঞ-পণ্ডিত।—“মহারাজাধিরাজের সঙ্কল্প অতি উত্তম। আমাদের এখানে বজ্রদত্ত একজন মহাকবি। তিনি ছয় ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। তাঁহার লোকেশ্বর-শতক বৌদ্ধদেব বড় আদরের জিনিস। তিনি যাইবেনই। শিল্পীও জনকতক পাঠাইব। বিশেষতঃ কয়েকজন ভাস্কর যাইবে,—কতকগুলি কষ্টিপাথরের কাগজ লইয়া যাইবে। তবে শাস্ত্রে প্রবীণ লোক লইয়া খুবই গোল। কারণ, আমরা নালন্দায় তন্ত্রটাকে শাস্ত্র বলিতেই রাজী নই; বজ্রযান, সহজযান, আমরা একটা যান বলিয়াই মনে করি না; আমরা বড় জোর মন্ত্রযান পর্য্যন্ত মানিতে পারি। তবে আমার বোধ হয়, প্রজ্ঞাকরমতি এখন এখানেই আছেন। তিনি যদিও নালন্দার পড়ুয়া নহেন, কিন্তু অনেক সময়েই নালন্দাতেই থাকেন। বিশেষ, তিনি যে বোধিচর্য্যাবতারের টীকা লিখিতেছেন, তাহার জন্য যে সকল পুথি-পাঁজীর দরকার, সে সকল ত কেবল এখানেই আছে, অন্যত্র পাওয়া যায় না; তাই তাঁহাকে এই খানেই থাকিতে হইয়াছে। মহাযান-শাস্ত্রে তিনি একজন পণ্ডিত বটেন। আমরা তাঁহাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।”

“সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত এই কথা বলিতে না বলিতেই একজন বেঁটেখেঁটে ভিক্ষু, দুই জন পড়ুয়া সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত,—তিনি আসিবামাত্র সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন,—“এই যে—অনেক দিন বাঁচিবে, তোমারই নাম হইতেছে।”

“আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, আচার্য্য ভদন্ত মহাপণ্ডিত পিণ্ডপাতিক মহোপাধ্যায় সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের স্মৃতিপথে উদিত হইব?”

“তোমার মত পুণ্যবান্ আর কে আছে? যে বোধিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে আচার্য্য শান্তিদেব, এই নালান্দা হইতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন,

তুমি সেই বোধিচর্য্যাবতারের ব্যাখ্যা করিতেছ,—টীকা লিখিতেছ। তুমি দেশসুদ্ধ লোকের স্বর্গের পথ খুলিয়া দিতেছ।"

প্রজ্ঞাকর।—আমিও আজ সেই বোধিচর্য্যা লইয়া আসিয়াছি।—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি॥

এ স্থলে 'নিরালম্ব' কথাটার অর্থ কি? ভাবও নাই অভাবও নাই। তাহা হইলে ত কিছুই রহিল না। তবে 'নিরালম্ব' কে হইল?

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত। ও সকল অতি গুহ্যকথা। সে গুহ্যভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া 'নিরালম্ব' বা যাহা'ক এমনি একটা কথা দ্বারা তাহার কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিভৃতে আর এক সময় আসিও বুঝাইয়া দিব। এখন তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে। তোমাকে একবার সাতগাঁয়ে যাইতে হইবে।"

প্রজ্ঞা।—আমার প্রতি হঠাৎ এ নির্ব্বাসনদণ্ড কেন?

সর্ব্বজ্ঞ।—এ যেমন তেমন নির্ব্বাসন নয় হে—অনেক ভাগ্যে এইরূপ নির্ব্বাসন ঘটে। এই যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরটিকে দেখিতেছ—ইনি সুপণ্ডিত, সুবক্তা, ইনি বঙ্গাধিপের নিকট হইতে আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ কাব্যে ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার করিবেন। তাই আমার ইচ্ছা, তুমিই যাও।

প্রজ্ঞা।—আমরা ত ভিখারী। পুরস্কার লইয়া কি করিব।

সর্ব্বজ্ঞ।—ও কথা বলিও না। পুরস্কার অকিঞ্চিৎকর জানি, কিন্তু উহাতে বিদ্যার যে গৌরব, তা'ত অকিঞ্চিৎকর নয়। সেইটার আদর করা উচিত। না করিলে দোষ আছে।

প্রজ্ঞা।—প্রভু আদেশ করেন ত যাইতেই হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ।—শুধু তুমি একেলা গেলে হইবে না। এখানে যে যে পণ্ডিত ও কবি আছেন, সকলকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত পিশাচখণ্ডীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন :—

"আপনি যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ ভার লইলাম। যথাসময়ে আমাদের লোক-জন আপনাদের ওখানে পৌঁছিবে। আপনার যদি সময় থাকে, আমার অনুরোধ, একবার নালন্দাটা বিশেষ করিয়া দেখিয়া যান।"

পিশাচখণ্ডীও বুদ্ধপালিতকে বলিলেন, "আপনি, আমাকে নালন্দায় দেখিবার যাহা কিছু আছে, সব দেখান।"

রীতিমত শিষ্টাচারের পর চৌতালা হইতে নামিয়া উভয়ে নালন্দা নগরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নালন্দা দেখিয়া পরদিন প্রত্যূষে উভয়ে সিলাও যাত্রা করিলেন এবং তথা হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

[১৪]

রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধরক্ষিত সরস্বতী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

"এই যে চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে একটু সমান জমি দেখিতেছেন—এই রাজগৃহ। ইহার আর এক নাম গিরিব্রজ। এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত স্থান পৃথিবীতে দুর্লভ। ইহাই জরাসন্ধের রাজধানী। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, এই গিরিব্রজের তোরণদ্বার।"

"তোরণের ভিতর দিয়া নদী আসিতেছে।"

"না আসিলে এই সমতলভূমির জল কোথা দিয়া বাহির হইবে? আর কোন দিকেই ত পথ নাই। ঐ ক্ষুদ্র নদীটি সরস্বতী। কিন্তু উহার জলে হাত দিয়া দেখুন উহা বেশ গরম। তোরণের দুইধারে অনেকগুলি গরম জলের ফোয়ারা আছে। সরস্বতী ঐ গরম জলের

সহিত মিশিয়া ক্রমে চওড়া হইতেছে। উচ্চে তোরণের দুই ধারে ঐ দেখুন, চৌকা করিয়া পাথরে বাঁধান দুইটি বসিবার জায়গা—উহার নাম "জরসন্ধকা বৈঠক।" লোকে বলে, জরাসন্ধ নাকি ঐখানে বসিয়া শত্রুদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। চলুন—এই রাজগৃহের এক কোণে মনিয়ার নামে এক মঠ আছে। সেখানে এক আশ্চর্য্য কূয়া আছে, উহার উপরে গম্বুজ বাঁধান। মঠে ভিক্ষুও অনেকগুলি আছে।"

সেখানে উপস্থিত হইয়া পিশাচথণ্ডী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সেখানে অনেকগুলি ভিক্ষু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এমন ধ্যানে মগ্ন যে, বাহিরের কোন সংবাদই রাখেন না। দুই জন লোক যে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অনেক ডাকাডাকি করিল, তাহা তাঁহাদের উদ্বোধই হইল না।

সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রিয়ভূমি গৃধ্রকূটে গেলেন। অনেক দূর উঠিতে হইল। একে ত রাস্তা বড়ই চড়াই, তাহার উপর বেমেরামত—অনেক জায়গাই ধসিয়া গিয়াছে। প্রাণ হাতে করিয়া সেখানে যাইতে হয়। সেখানে গিয়াও দেখিলেন, একই ভাব। অনেকগুলি ভিক্ষু আছেন—সকলেই ধ্যানমগ্ন। ইহাঁরা দিনের মধ্যে একবার উঠেন, কিন্তু কখন্—কেহই জানে না।

গিরিব্রজ ছাড়িয়া তাঁহারা দুই জনে নূতন রাজগৃহে আসিলেন। বেশ ডাগর সহর, এখন কিন্তু সবই ভাঙ্গা—সহরের প্রাচীর ভাঙ্গা, বাড়ীগুলা ভাঙ্গা, রাস্তায় যাতায়াত কঠিন। কেবল একটী বিহার আছে, তাহাও বৌদ্ধদের হাতে নয়। শৈব যোগীরা সেটি মেরামত করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা হঠযোগ করে, গুরু-পাদুকা পূজা করে, ভস্ম মাখে, জটা রাখে, গেরুয়া-কাপড় ও রুদ্রাক্ষ পরে, আর

খুব গাঁজা খায়। তাহারা পিশাচখণ্ডীকে বলিয়া দিল, নাথযোগীদের কেহ কেহ সাতগাঁয়ের রাজসভায় যাইবেন।

সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে 'গিরি-এক' নামে একটি পাহাড় প্রায় হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছে। তাহার উপরে বড় বড় ইটে তৈয়ারি একটা প্রকাণ্ড অশোকের স্তূপ, 'গিরি-একে'র প্রায় মাথা হইতে একটা পথ দিয়া আর একটা পাহাড়ে যাওয়া যায়। সেখানেও একটা বড় বিহার আছে। অতি প্রাচীন স্থবিরেরা এইখানে বাস করেন। তাঁহারা সংসারের কোন সম্পর্কই রাখেন না। 'গিরি-এক' হইতে কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে একটি বাড়ী এখন অত্যন্ত বেমেরামত—কিন্তু অনেক যাত্রী সেখানে যায়। এইখানে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার নাম পাবাপুরী।

মস্করী জৈনদের নামই শুনিয়াছিলেন, জীয়ন্ত জৈন কোন দিন দেখেন নাই। তিনি যাত্রীদের সহিত মিশিয়া গেলেন, বুদ্ধরক্ষিত তাহাতে চটিলেন ও একটু তফাতে থাকিতে লাগিলেন। মস্করী কিন্তু জৈনদের সাথে মিশিয়া—কোথায় কোন্ জৈন মঠ আছে, কোথায় কোন্ পণ্ডিত বা কবি আছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার অনেক কাজের খবর যোগাড় করিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় বুঝিতে পারিলেন—মালব, গুজরাট, শাকম্ভরী, মরুদেশ, জঝৌটি, চেদি দেশ—এই সব জায়গায় জৈনদেরই প্রাদুর্ভাব বেশী; বৌদ্ধ নাই বলিলেই হয়। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—"এই সব দেশ না ঘুরিয়া দেশে ফিরিব না।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

[১]

যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তিনি বাসায় বুদ্ধরক্ষিতের সঙ্গে মিলিলেন ও সেখান হইতে গয়ায় যাত্রা করিলেন। দুই দিনে গয়ায় পৌঁছিয়া দুইজনে মহাগোলে পড়িয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিত গয়ায় যাইতে রাজী নহেন। পিশাচখণ্ডী বোধগয়ায় যাইতে রাজী নহেন। পিশাচখণ্ডী বিষ্ণুপদ দেখিতে গেলেন একা। দেখিলেন, ফল্গু নদী হইতে গয়ার পাহাড়ে উঠিতে মাঝে একটি ছোটখাট মন্দির ও পাহাড়ের উপর কয়েকখানি সামান্য গোছের বাড়ী। বাড়ীগুলি গয়ালীদের। গয়ার মাহাত্ম্য এতদিন বেশী লোকে জানিত না। এখন ক্রমে প্রচার হইতেছে, অনেক অনেক গয়ামাহাত্ম্যের বই লেখা হইতেছে। গয়ায় অনেক যাত্রী আসিতেছে। গয়ালীদের প্রতাপ ও প্রভাব বাড়িতেছে। গয়া ছোট হইলেও দেখিলেই বোধ হয়, উন্নতি সহর। দণ্ডপাণি দত্ত উহার সামন্ত রাজা। সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর। এই সময়েরই কিছু দিন পরে সামন্ত বজ্রপাণি দত্ত একখানা শিলাপত্রে জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গয়াকে সামান্য গ্রাম দেখিয়াছিলাম, এখন আমি উহাকে অমরাবতী করিয়া দিয়া গেলাম। সকলই মহারাজধিরাজ নয়পালের প্রতাপের ফল।" মঙ্গরী সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, দুই জন গয়ালী পুরাণশাস্ত্রে বড়ই প্রবীণ, বিশেষ গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহারা দক্ষ বৃহস্পতি। একজনের নাম

মুরারি সেন, আর একজনের নাম শ্রীহর্ষ নাকফোঁকা। তাহারা বলিল, "আমরা তীর্থস্বামী। আমরা তীর্থ ছাড়িয়া কোথাও যাই না।" মস্করী গোলে পড়িলেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর। তিনি বলিলেন, "এরূপ মহাসভায় গেলে ও আদর পাইলে আপনাদের তীর্থেরই ত গৌরব হইবে। তীর্থস্বামীর কার্যাক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে।"

গয়ার কাজ সারিয়া মস্করী ভাবিলেন—বোধগয়ায় না যাওয়া ভাল নয়। পৃথিবীর একটা বড় তীর্থস্থান। সভার উপযুক্ত অনেক জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। তাই ভাবিয়া বুদ্ধরক্ষিতকে লইয়া বোধগয়ায় গেলেন। বোধগয়ার মন্দির তখন বড়ই বেমেরামত, যে অশ্বত্থগাছের তলায় বুদ্ধদেব বোধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ কাটা পড়ে শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্তের সময়, সে প্রায় চারি শত বৎসর। এই চারি শত বৎসরে গাছটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিকড়ে বোদ্ধগয়ার মন্দির ফাটিয়া গিয়াছে। সেই মন্দিরের পিছনে তাহারই বারান্দার মধ্যে অশ্বত্থগাছ। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি। যেন গাছতলায় বুদ্ধদেব ধ্যান করিতেছেন। মন্দিরটা রৌদ্রবৃষ্টি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। মন্দিরের হাতার চারিদিকে পাথরের রেলিং, তাহাতে কতই চিত্রবিচিত্র কারিগিরি। কিন্তু ফল্গু নদীর বালী পড়ায় হাতাটা প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরের দরজায় উঠিতে এখন আর পৈঠার দরকার হয় না। চারিদিকে বিহার, সেখানে নানাদেশের ভিক্ষু বাস করে ও তীর্থ করিতে আসে। মস্করী দুই তিন জন নেপালী, দুই তিন জন ভুটিয়া ও দুই তিন জন সিংহলীকে সভায় যাইবার জন্য জেদ করিয়া গেলেন; তাহারাও যাইবে স্বীকার করিল। সেখানে আরও অনেক দেশবিদেশের পণ্ডিত পাওয়া গেল। দু'জন পারসী বৌদ্ধেরও নিমন্ত্রণ হইল। নীলা নদীর উত্তরে দু'জন রোমদেশের লোকেরও নিমন্ত্রণ হইল।

[২]

তখন দু'জনে পাটনা চলিলেন। গয়া হইতে পাটনা যাওয়ার রাস্তা ধরিলেন। রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে খোদা দেবদেবীর প্রতিমা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। কাউআ-ডোল পাহাড়ে কাক বসিলে দুলিতে থাকে। তাহার একটু পরেই "খলতিক পর্ব্বত" অর্থাৎ পর্ব্বতে চড়িলেই পা হড়কাইয়া যায়। সেই পর্ব্বতে উঠাই মুস্কিল, নামা ত আরও মুস্কিল। পর্ব্বতের উপর গুহা। গুহার ভিতর এমন মাজা, এত পালিস যে, মুখ দেখা যায়। সাদা, কাল, নীল রঙ, আর সুন্দর পালিস। গুহায় ঢুকিলেই মানুষের ছায়া পড়ে। একটা গুহায় এক জন তপস্বী আছেন, তিনি যে কত কাল চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন, বলা যায় না। বীরাসনে বসিয়া আছেন, শরীর অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, রগ টিপিয়া গিয়াছে, নাকের হাড় নড়-নড় করিতেছে। মস্করী তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে খলতিক পর্ব্বত হইতে নামিলেন।

পাটলীপুত্র এখন প্রায় জনশূন্য। সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মহাভূমিকম্পে সমস্ত নগর বসিয়া যায়। শোণ নদী পাটলীপুত্রের পশ্চিমসীমা ছিল, সে সরিয়া দশক্রোশ তফাতে গিয়া পড়ে। এখনও দু একখান নৌকা পুরাণ পথে সময়ে সময়ে বর্ষাকালে যায়। কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের জলরাশি শোণ দিয়াই গঙ্গা নদীতে পড়ে। বসা নগরের উপর ক্রমাগত পলিমাটী পড়িয়া নগরকে যে কত নীচে নামাইয়া দিয়াছে, কে বলিতে পারে? তবে মাঝে মাঝে স্তূপের, জয়স্তম্ভের ও আকাশভেদী রাজবাড়ীর আগা দেখা যায়। এক জায়গায় অনেক-গুলি থামের মাথা জাগিয়াছিল, ক্রমে সেগুলাও জীর্ণ হইয়া পড়ি-

তেছে। পাটলীপুত্রের তিন শত্রু বলিয়া বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে ;—"জল, আগুন আর ঝগড়া।" কাঠের নগর কয়েকবার আগুনে পোড়াইয়া দিয়া যায়। তাহার উপর জলপ্লাবনে অঙ্গার পর্য্যন্ত ধুইয়া যায়, ঝগড়ায় নগরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। কিন্তু পাটলীপুত্র একবার আবার উঠিত, আবার বড় হইত। কিন্তু বৌদ্ধেরা মনেও করিতে পারে নাই যে, উহার আর এক প্রবল শত্রু ছিল, ভূমিকম্প। সমস্ত নগরটা ১০।১২।১৫ হাত বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। পাটলীপুত্রের নাম "নগর"। মগধ-শুদ্ধ লোক উহাকে নগরই বলিত। ইদানীং ভাঙ্গা নগরের নাম শ্রীনগর হইয়াছিল।

[৩]

কাশী এ সময়ে দুটি ছোট ছোট নগর। একটি মৃগদাব আর একটি অবিমুক্ত ক্ষেত্র। দু'জায়গায়ই লোকজন অনেক ; এক জায়গায় হিন্দু আর এক জায়গায় বৌদ্ধ।

হিন্দু নগরটি একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারিধারে। জলাশয়টি জ্ঞানবাপী। তাহার একদিকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আর এক দিকে অন্নপূর্ণার মন্দির। সে বিশ্বেশ্বরের মন্দির এখন আদিবিশ্বেশ্বর হইয়াছে। অন্নপূর্ণার মন্দির যেখানকার সেইখানেই আছে। মধ্যে একটা হ্রদ, তাহারই নাম জ্ঞানবাপী। উহারই চারিদিকে সন্ন্যাসীদের বাস ও ব্রাহ্মণদের বাস। হ্রদ ক্রমে মজিয়া গিয়া তথায় নগরপত্তন হইয়াছে। জ্ঞানবাপী ক্রমে ছোট হইতে হইতে এখন একটি বাউড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাউড়ী মানে সিঁড়িওয়ালা কূয়া। তখনকার প্রধান দেবতা অবিমুক্তেশ্বর, তিনি এখনকার জ্ঞানবাপীর উপরেই বিরাজ করিতেছেন।

মৃগদাবের একদিকে দুইটি স্তূপ,—দুইটিই প্রকাণ্ড। একটির এখন চিহ্নমাত্র নাই। কেবল সে দিন খুঁড়িয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদক্ষিণ ও তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটি সিঁড়ি বাহির হইয়াছে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইহা ১৬০ ফুট উঁচা ছিল, ব্যাস ৪০ ফুটের উপর। গায়ে উজ্জ্বল পলস্থা করা। মাথায় বড় সোণার ছাতি। যেখানে ছাতি আরম্ভ সেখানে একটি কিউবের চারিদিকে চারি জোড়া চোখ, আধ বুজন্ত ভাবে ধ্যানমগ্ন, স্তূপগুলি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ছোট প্রতিমা। সমস্ত বিশ্বই যেন ধ্যানমগ্ন। এই স্তূপের পাশে ধর্ম্মরাজিকা, এখন ধামেক-বলে। প্রকাণ্ড স্তূপ, ছাতা নাই, গা-ময় কঠিন পাথরের উপর নানা রকমের কাজ করা। এখন মাথাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মেরামত না করিলে শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মৃগদাবে বড় বড় বিহার। সব বেমেরামত—সাপ, বেজী ও ব্যাঙের আড্ডা। ইন্দুর ছুঁচাও ঢের। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনা যায়, ভিক্ষু সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। একটা পুরাণ বিহারের ঢিবির উপর একটা নূতন বিহার হইল, পুরাণ সব জিনিস ঢাকা পড়িল। মানুষের চক্ষেই ঢাকা পড়িল, সাপের চক্ষে ত নয়। সাপ তাহার ভিতরে বসিয়া বেশ বংশ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নূতন বিহারের যে পাঁচীলটা পুরাণ বিহারের পাচীলের উপর পড়িল, সেখানটা বেশ রহিল, তাহার এ-পাশ ও-পাশ গোড়া হইতেই বসিতে লাগিল, অল্পদিনেই পাচীল ফাটিল, ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেরামত করে কে? দেশে ক্রমেই হিন্দুর প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধ মন্দির মেরামতের সময় টাকা জুটে না।

এই দুই নগরেই মন্ত্রী অনেকগুলি ভাল ভাল লোক নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে বেদান্তী চিৎসুখাচার্য্য। উদয়নাচার্য্য বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনিও যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু

তাঁহার পরিচর্য্যার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীহীর পণ্ডিত কাশীতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও কাশীতে ছিলেন। ইহাঁরা দু'জনেই নিমন্ত্রণ পাইলেন।

মৃগদাব ও অবিমুক্তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে রাজবাড়ী। রাজা স্বাধীন নন, কান্যকুব্জেশ্বরের সামন্ত। কিন্তু তিনি থাকেন স্বাধীন রাজার ন্যায়। হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের রাজা বলিয়া তাঁহার যে একটা বিশেষ সম্মানও ছিল, তাহা আর কাহারও ছিল না। তিনি সকল দেশের পণ্ডিতের সম্মান করিতেন এবং সকল দেশের লোককেই কাশীবাসের সুবিধা করিয়া দিতেন। মস্করী প্রথম হইতেই রাজার সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রাজার সাহায্যও সকল বিষয়েই পাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই মস্করীর এক মহা বিপদ্ উপস্থিত হইল। পঞ্জাব হইতে একজন রাজদূত কাশীর রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মস্করীর প্রধান শত্রু হইলেন। দুজনেই আসিয়াছেন লোক নিমন্ত্রণ করিতে। একজন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া পূবে লইয়া যাইবেন আর পুরস্কার দিবেন। আর একজন সিপাহী লইয়া যাইবেন, আর যুদ্ধ করাইবেন। দুই জনের অনেকবার রাজসভায় বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পঞ্জাবের রাজদূত বলেন,—"রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার এ সময় নয়। তিনি বলেন,—প্রবল শত্রু হিন্দুদিগের সীমান্তে হানা দিতেছে। পূর্ব্বেও অনেকবার এরূপ হানা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা দিয়াছে, তাহারা ঠাকুর মানিত, দেবতা মানিত, ব্রাহ্মণ মানিত, আচার মানিত, প্রতিমাপূজা করিত, আগুনপূজা করিত, সূর্য্যপূজা করিত, জলপূজা করিত, মাটীপূজা করিত, অনেক বিষয়েই আমাদের মতই ছিল। কিন্তু এ এক বিচিত্র জাতি আসিয়াছে। ইহাদের ধর্ম্মও বিচিত্র। ইহাঁদের মতে দেবতা-মানা মহাপাপ। প্রতিমাভাঙ্গা মহাপুণ্য। জল, মাটী, সূর্য্য জড়পদার্থ;—দেবতা

নহে, মানুষ নহে, জীবও নহে। ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের জাতি নাশ ক'রে, পইতা ছিঁড়ে দেয়। আচার মানে না, বিচার মানে না। পঞ্জাব ইহাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত। ইহারা বরাবর পঞ্জাব লুঠ করিয়াছে, কাশ্মীর লুঠ করিয়াছে, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে উৎসন্ন দিয়াছে। অনেকে প্রাণ লইয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীহরি পণ্ডিত দেশত্যাগী, তাঁহার পুত্র দেশত্যাগী, কত কত পণ্ডিত যে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অমন যে আমাদের তীর্থ জ্বালামুখী, তাহা লুঠিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যে নগরকোটের ব্রাহ্মণেরা আভিজাত্যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অগ্রগণ্য, যাহাদের হাতে ভাত খাইতে কেহই আপত্তি করিতে পারেন না, সেই নগরকোট এখন শ্মশান হইয়াছে। এই কি সময় রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার ? এ সময় যদি সকলে প্রাণপণে আত্মরক্ষা না করেন, তবে ২।৫ বছরের মধ্যে আপনারাই কোথায় থাকিবেন, তাহার ঠিকানা নাই,—আবার আপনাদের গুণ? এখন কেবল সাজসজ্জা, কেবল রণসজ্জা। আমি অনহিল গিয়াছিলাম, শাকম্ভরী গিয়াছিলাম, ধারায় গিয়াছিলাম, ত্রিপুরী গিয়াছিলাম, খাজুরাহা গিয়াছিলাম, দিল্লী গিয়াছিলাম, কনৌজ গিয়াছিলাম, মাণ্ডোর গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বড় একটা বকাবকী করিতে হয় নাই। পঞ্জাব হইতে, কাশ্মীর হইতে, নাগরকোট হইতে, থানেশ্বর হইতে পলাতক সর্ব্বস্বান্ত লোকজন আসিয়া আমার সব কাজ করিয়া দিয়াছে। দু'এক জায়গায় আমার বাঙ্‌নিষ্পত্ত করিতে হয় নাই। ইহারাই আমার কাজ সারিয়া রাখিয়াছিল। ওদিকে আপনি আর গাইবেন না, সমস্ত দেশের লোক এক-হাড় এক-প্রাণ হইয়াছে। দেখুন, রাজপুতেরা যদি রক্ষা না করিত, কাসিমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধু জয় করিয়া ঐ পথে বরাবর অনেক দূর আসিয়া পড়িত? তাহারা তিন শত বৎসর ধরিয়া এক প্রান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার আর এক প্রান্তে বিপদ্

উপস্থিত। এ সময়ে কেবল যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, বিপক্ষ-দমন ও বিপক্ষ-নাশন। এটা বারোয়ারির সময় নয়। বঙ্গাধীপ সাতগাঁ রাজ্য জয় করিয়াছেন—বেশই করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সামর্থ্য, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করুন। সশস্ত্রে সমস্ত প্রজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নহিলে এ সময়ে উৎসব, আনন্দ, দান-ধ্যান আরম্ভ করিলে সব লোপ হইয়া যাইবে, আর উৎসব করিতে হইবে না, আর দান করিতে হইবে না, আর ধ্যান করিতে হইবে না। আপনি দেশে ফিরিয়া যান, বঙ্গাধিপতিকে সব কথা বুঝাইয়া বলুন। রাজসভা ছাড়িয়া দিতে বলুন। যুদ্ধের সজ্জা করিতে বলুন। আমিও সত্বর তাঁহার সভায় উপস্থিত হইব।"

[৪]

মস্করী শুনিলেন। রাজদূতের ভাষায় ও ভঙ্গীতে বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে যে কি, তাঁহার ধারণা হইল না, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। কাশীর লোকেও যে বড় বুঝিল, তাহা নহে। তাহারাও বুঝিল দূরে—কত দূরে তাহার ঠিকানা নাই—একটা বিপদ্ উপস্থিত; কিন্তু তাহাতে আমাদের কি? আমরা কেন এখন তাহার জন্য মাথা ঘামাই, এই ভাবের একটা যেন আধ-সত্য একটা বিপদের ধারণা হইল। তাহারা মাতিল না। দুচার জন ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিল, এই মাত্র।

মস্করী কাশীর কাজ সারিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া কনৌজ যাত্রা করিলেন। মাঝে প্রয়াগ, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানদান করিয়া গঙ্গা বাহিয়া কনৌজ গেলেন। নৌকা লাগিল ডাঙ্গায় নহে, প্রায় ওপারে একখানা নৌকার গায়ে। সমস্ত গঙ্গাটা নৌকায় ভরা। ওপার ভিন্ন আসা

যাওয়ার পথ নাই। মস্করী নৌকার ছৈয়ের উপর দিয়া কনৌজের ঘাটে পা দিলেন। সহরটি তিন ক্রোশ দীর্ঘে, গঙ্গার ধারে, এবং প্রস্থেও প্রায় তিন ক্রোশ। ঠিক মধ্যস্থলে রাজবাড়ী। রাজপুত-প্রতিহার বংশের মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল রাজা। তাঁহার রাজত্ব শতদ্রু নদী হইতে বিহারদেশ পর্য্যন্ত। কাশী, মথুরা, দিল্লী তাঁহার সামন্তরাজা। তাঁহাদের রাজত্ব আরও বিস্তৃত ছিল। যমুনার দক্ষিণধারটা এখন স্বাধীন হইয়াছে। আর প্রতিহারদেব আদি ভূমি রাজপুতানা ও সেখানকার প্রতিহারেরা কনৌজের অধীন নহে, স্বাধীন হইয়াছে।

মস্করী এত বড় সহর কখনও দেখেন নাই। কনৌজ, একাধারে রাজধানী, বন্দর, ব্যবসায়ের স্থান, বিদ্যার স্থান ও সেনানিবাস। সুতরাং সহর যে বড় হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সহরে আসিয়া মস্করী দেখিলেন, সকলের মুখেই ঐ এক কথা;—মুসলমান আসিতেছে। সকলেই সাজিতেছে, নিতান্ত শিশু ও বৃদ্ধ, নিতান্ত কাণা, খোড়া, আতুর ও অন্ধ ছাড়া সকলেই সাজিতেছে। জাতিভেদও মানিতেছে না। ব্রাহ্মণও সাজিতেছে, ক্ষত্রিয়ও সাজিতেছে, বৈশ্যও সাজিতেছে, শূদ্রও সাজিতেছে, পাহাড়ীও সাজিতেছে। শুনিলেন, পানওয়ালীরা যাহা উপায় করিয়াছিল, যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, সব দিয়া দিয়াছে। তাহাতে প্রায় এক কোটি টাকা হইয়াছে। কনৌজের পান খুব বিখ্যাত। প্রায় এক হাজার পানওয়ালী ছিল; তাহারা যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছে। রাজমহিষী বাপের দেওয়া এক জোড়া হীরার বালামাত্র আইওতের চিহ্ন রাখিয়া বাকী সব গহনা দিয়া দিয়াছেন। রাজা এক বৎসরের রাজস্ব—যাহার নাম রাজার সর্ব্বস্ব, দিয়া দিয়াছেন। ব্যবসাদারেরা ছয় মাসের মুনাফা দিয়া দিয়াছে। শিল্পীরা এক বৎসরের আয় দিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগ উপকরণ রাশি রাশি প্রস্তুত হইতেছে, সংগ্রহ হইতেছে, জমা হইতেছে ও ছালাবন্দী

হইতেছে। পঞ্জাবরাজের খবর আসিলেই রওয়ানা হইয়া যাইবে। মস্করীর রাজসভার কথা কেহই শুনিতে চাহে না। শুনিবে কি? পঞ্জাব ধ্বংস করিতে পারিলেই কনৌজ, মাঝে আর কিছুই নাই। অনঙ্গপাল তাই কনৌজে অনেক লোক পাঠাইয়াছেন। তাহারা কনৌজের লোককে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছে যে, বিপদ আসন্ন। তাই সবাই মাতিয়াছে। আহা! এমন সোনার কনৌজ ছারখারে যাবে গো? এ কথা যাহারই মনে হয়, সেই সর্ব্বস্ব পণ করে, প্রাণ পণ করে। মস্করীর কথা কেহ শুনে না। শুনিবে কি? তিনি অনেকবার ভাবেন, "ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিব, না বলিলেই ভাল হইত। আমিও সাজিতে পারিতাম। আমার আর কে আছে? সনাতনধর্ম্মের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত দিতামই, প্রাণটাও দিতাম। এমন বিপদ্ উপস্থিত জানিলে কি এমন কার্য্য করি? আমাদের দেশে এত কাণ্ডের কোনই খবর নাই, মগধেও ত নাই। এখন করি কি? আরও যাইব কি? যাইয়া ফল নাই, সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিব। নানা দেশ দেখিবার, নানা তীর্থ করিবার কত বাঞ্ছা ছিল; কিন্তু যদি নিমন্ত্রণই না করিতে পারি, বৃথা অর্থব্যয়েরই বা দরকার কি? বৃথা পরিশ্রমেরই বা কারণ কি? তবে এখান হইতেই ফিরিব কি? এখনও ত দিন আছে? ফিরিব কি?" আবার ভাবিলেন:—"দেখিলাম ত কনৌজই এখন ভারতের প্রাণ। এইখানে বসিয়াই ভারতের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লই। তাহার পর যাহা বিবেচনা হয়, করিব।

মস্করী মাসখানেক কনৌজে রহিলেন, অনেক দেশের অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কহিলেন; কিন্তু সব বৃথা হইল। সকলেই বলিল, রাজসভার এ সময় নয়। পরম শত্রু দরজায় ঘা দিতেছে। ইহারা আসিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ হইয়া যাইবে। এখন একমনে একপ্রাণে যাহাতে উহাদের হটাইতে পারি, তাহারই চেষ্টা

করিতে হইবে। মস্করী করেন কি? মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে ফিরিলেন। রাজসভাটা যে বিশেষ জমিবে না, এই তাঁহার দুঃখ। কিন্তু রাজসভার পর বাঙ্গলাকেও দেশরক্ষায় মাতাইতে হইবে। হয় ত নিজেও যুদ্ধে যাইতে হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

[১]

আজ পূর্ণিমা। দুপরের পর হইতেই নৌকা আসিয়া চড়ায় লাগিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চড়ার দক্ষিণ দিক ছাড়া তিনদিকে নৌকা লাগিল। দেখাইতে লাগিল, যেন চড়ার দাড়ী উঠিয়াছে। লোকে বালীর চড়ায় নামিয়া বালীর উপর দিয়া মাটীতে উঠিতেছে, সেখানে ঘাসের উপর দিয়া সভার কাছে পঁহুছিতেছে। সেখানে পা ধুইয়া সভায় গিয়া বসিতেছে, এখন যেমন জুতা হারাণর ভয়ে লোক অস্থির হয়, সে ভয় তখন একেবারে ছিল না। ক্রমে প্রকাণ্ড সভায় লোক থৈ থৈ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা বিহারীর এমনি বন্দোবস্ত, সবাই আপনার আপনার স্থান খুঁজিয়া পাইল এবং তাহাতে কেহই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন ভিন্ন আসন করা হইয়াছে। দুই স্থানের মাঝখান দিয়া রাস্তা, যে দিকে ইচ্ছা যাও।

বেলা এক প্রহর থাকিতে সভার দুই পার্শ্বে মেলা আরম্ভ হইল। কেনা-বেচা হাস্য-পরিহাস গান-গল্প চলিতে লাগিল। আর দোল—দুটা দাড়া কড়ির উপর একটা কড়িকাঠ আড় করিয়া দিয়া তাহাতে আংটা লাগাইয়া দড়ি ঝুলাইয়া তলায় একজন দুজন তিনজন চারিজনের পর্য্যন্ত বসিবার জন্য তক্তা লাগান হইল। আর দোলা দুলিতে লাগিল। দুই দিকে ২৫ ডিগ্রী ২৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল। দোলায় বসিয়া লোক নানারূপ ভঙ্গী করিতে লাগিল। বাক্‌চাতুরী

করিতে লাগিল। যাহারা মাটিতে ছিল, তাহাদের ঠাট্টা-বট্‌কেরা করিতে লাগিল। আর এক দোল—নাগর দোলা, চারি মুড়ায় চারিটা বাক্স, এক এক বাক্সে চারিজন করিয়া লোক বসিয়া আছে, আর নাগর-দোলা উঠিতেছে নামিতেছে—এই মাথার উপর, আবার তখনই মাটির কাছে, এই ডাহিনে, এই আবার বামে। নাগর-দোলায় স্ত্রীও আছে পুরুষও আছে। আবার জায়গায় জায়গায় এক নাগর-দোলাতেই স্ত্রী-পুরুষ দুই আছে। এদিন আর বড় লজ্জা সরম থাকে না। তবে এবার একটু ভয়, রাজা কাছেই আছেন। নাগর-দোলাগুলো এক একটা ৩০।৪০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিতেছে। একজন কবি বলিয়াছেন, বাঙ্গলার মেয়েরা অপ্সরাদের চেয়েও সুন্দরী, তাহারা অনেক সময় অপ্সরাদের সঙ্গে রূপের টক্কর দিবার মনঃস্থ করে; তাই তারা নাগর-দোলায় চড়িয়া স্বর্গ কতদূর দেখার চেষ্টা করে; একবার নামিয়া ও একবার উঠিয়া উপরে উঠা অভ্যাস করে। কিন্তু যত বেচাল ঐ দক্ষিণদিকে। উত্তরদিকে ব্রাহ্মণদের ও হিন্দুদের মধ্যে এ সব বেচাল হইতে পারে না, তাহারা একটু সমীহ করিয়া চলে।

লোক সব ভাল কাপড় পড়িয়া আসিয়াছে। ভাল কাপড় মানে, ঘোরাল রঙের,—ঘোরাল লাল, ঘোরাল কাল, ঘোরাল নীল, ঘোরাল হলদে। সব ঘোরাল। সাদা কাপড় কেবল ব্রাহ্মণদের, বিশেষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের। তাঁহারাত তুলার কাপড় বড় একটা পরেন না, পাটের কাপড় পরেন। গরদ ক্ষীরোদ পরেন, তাহার রঙ ঘোরাল নয় বটে, কিন্তু দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

স্থির হইয়াছিল যে, মহারাজা যখন সভায় আসিবেন, তখন রণবাদ্য বাজিবে না। তাঁহার নৌকা হইতে সভা পর্য্যন্ত লুইসিদ্ধার কীর্ত্তনীয়া-দল রাস্তার দুইধারে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিবে। ময়ূরপঙ্খী হইতে সভা

পর্য্যন্ত রাঙ্গা বনাত পাতা হইল, বনাতের দুই ধারে কীর্ত্তনীয়ারা প্রস্তুত হইয়া রহিল, ক্রমে ময়ূরপঙ্খীর সিঁড়ি পড়িল। ভাট ও চারণেরা যশোগান আরম্ভ করিল, কীর্ত্তনীয়ারা খোলে চাটি দিল, তাহারা কেবল ধরিল—

রাঅ রাঅা রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপএ দারিক দাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

[২]

রাজা দাঁড়াইয়া কীর্ত্তনের গান শুনিলেন, কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং ইঙ্গিত করিলেন—তাহারা পুরস্কারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কীর্ত্তনীয়ারা রাজার মুখে প্রশংসা শুনিয়া উৎফুল্ল হইল, তাহাদের বাজনা আরও জমিতে লাগিল। রাজা ধীরে ধীরে তাহাদের বাজনা শুনিতে শুনিতে, তাহাদের যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে, সভার কাছে আসিলেন। সেখানে কয়েকটী পাকা ইটের ধাপ ছিল, সেই ধাপে উঠিয়া সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সভাস্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। দাঁড়াইলেন না কেবল ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা। রাজা নিকটে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেহ জয়োস্তু, কেহ কল্যাণমস্তু, কেহ বা দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া উঠিলেন। সভার ঠিক মাঝখান দিয়া রাজা পশ্চিম মুখে গিয়া, সভার পশ্চিম সীমায় তাঁহার জন্য যে সিংহাসন ছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন:—

"প্রায় একশত বৎসর হইল কনোজে রাজসভা হইয়াছিল। তাহার পর আর কোথাও রাজসভা হওয়ার কথা শুনা যায় না। আমাদের পূজনীয় ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের কথায় আমরা গত বৎসর এই

দিনে এইখানে রাজসভা করিব স্বীকার করিয়াছিলাম এবং তিনিই স্মরা আর্য্যাবর্ত্ত নিমন্ত্রণের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম ভারতে মহা-অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়, তিনি কনোজের ওদিকে যাইতে পারেন নাই। তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। কারণ ইহা অপেক্ষা বড় সভা হইলে, আমি ত সামলাইতেই পারিতাম না। আর গুণিজনের উপযুক্তরূপ আদর না হইলে তাঁহাদের ক্ষোভ হইত, তাহাতে গুণের উৎকর্ষ না হইয়া অপকর্ষই ফল হইত। যাহা হউক, যাহা হয়, ভালর জন্যই হয়, মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বলিয়া, যাহা হইয়াছে, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া মাথা পাতিয়া লইলাম। এখন আপনারা এই নিয়মে পারিতোষিক দিন। প্রথম শাস্ত্রে, তাহার পর শিল্পে ও কলায়, তাহার পর কাব্যে। বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট মহাশয় শাস্ত্রে প্রবীণ আচার্য্য মহাশয়দের আমার নিকটে উপস্থিত করুন।”

তখন ভবদেব উঠিয়া তাঁহার জন্য যে আসন ছিল, তাহাতে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন :—“মহারাজাধিরাজ শাস্ত্রে-প্রবীণ যত পণ্ডিত এক্ষণে ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে গেলেই আচার্য্য উদয়নের নাম করিতে হয়। তিনি নিমন্ত্রণের সময় কাশীতে ছিলেন। মস্করী তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া এখানে আনিয়াছেন। তিনি এ সভায় উপস্থিত। আচার্য্য উদয়নের মত প্রবল পণ্ডিত এ সভায় যে উপস্থিত হইয়াছেন, সে মহারাজ ও মহারাজের পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত পুণ্যের ফলে। যাঁহাকে দেখিলে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা উদয়নকে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।” এই বলিয়া তিনি নিজে উদয়নের নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মহারাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দণ্ডবৎ হইয়া উদয়নাচার্য্যকে

প্রণাম করিলেন, সভাশুদ্ধ লোক তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল। মহারাজা বলিলেন :—"আচার্য্য, আপনি শাস্ত্র-গগনে আদিত্যস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। আমরা খদ্যোত, আপনাকে কি আলোক দিব জানি না। আপনার পাণ্ডিত্যে সারা ভারত মুগ্ধ, আপনি সাগর সমান সমস্ত দর্শন অগস্ত্যের মত এক চুমুকে পান করিয়াছেন, আপনি যে এ সভায় আসিয়াছেন, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ—সভা কৃতার্থ, সারা বাঙ্গালা কৃতার্থ। এ সভাই যে দণ্ডবৎ করিয়া কৃতার্থ হইল এমন নহে, ইহাতে সারা বাঙ্গলা—এমন কি, সারা ভারতবর্ষও কৃতার্থ হইল। আমরা যখন আপনার আগমনেই কৃতার্থ, তখন আমরা আপনার কি সম্মান করিতে পারি! তথাপি আপনি আমাদের এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।" বলিয়া রাজা তাঁহার মাথায় মহামূল্য মুকুট ও গলায় মহামূল্য হার পরাইয়া দিলেন।

উদয়নাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আপনি অষ্ট-দিক্‌পালের অংশে নির্ম্মিত। ধরাধামে আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। যে ঈশ্বর-প্রতিপাদনের জন্য বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ঋষিগণ, মুনিগণ, আচার্য্যগণ চেষ্টা করিতেছেন, আপনি সেই ঈশ্বরের চলৎ প্রতিমা। আমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ছিল, তাই আপনি আমায় এরূপ সময়ে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। আর আপনি যে আমায় এতটা আপ্যায়িত করিলেন, তাহার বিশেষ কোনও কারণ দেখি না। কারণ, এইরূপ রাজসভায় পরীক্ষা দিয়াই পাণিনি, ব্যাড়ি, পিঙ্গল, কাত্যায়ন, বররুচি, বর্ষ, উপবর্ষ, কালিদাস মঙ্খ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও কাব্যকারেরা খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তুলনায় আমি ত কোন্ ছার! আমার সম্মান করিয়া আপনি আপনারই উদার হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। আমার গুণপনা বড়ই অল্প।"

উদয়ন গিয়া বসিলেন, বাজনা বাজিয়া উঠিল। ডাক হইল রত্নাকর শান্তির। ডাক হইবামাত্র গুরুপুত্র নিজ আসন ত্যাগ করিয়া রত্নাকর শান্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন; "মহারাজাধিরাজ ইনি রত্নাকর শান্তি, বিক্রমশীল বিহারের দ্বাররক্ষক। ইঁহার নিকট বিদ্যার পরিচয় না দিয়া কেহ সে বিহারে প্রবেশ করিতে পারে না। ইনি দার্শনিক, ইনি নৈয়ায়িক, ইনি সিদ্ধপুরুষ, ইনি বোধিসত্ত্ব। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধু ন্যায় শাস্ত্রের যে সকল জটিল অংশ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই, সেগুলি ইনি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ইনি বাঙ্গলা ভাষায় একজন অতি সুকবি।"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, "আচার্য্য, ভদন্ত, পিণ্ডপাতিক, আপনার নাম আমি বহুদিন হইতে শুনিতেছি। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ হইল। আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন।" বলিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি গণপতি, এই সারা বাঙ্গলার গণের আপনি মুখপাত্র। আপনার মুখে আমার দেশ আমায় ভাল বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় মানুষের, বিশেষ আমার মত ভিক্ষুর, কি হইতে পারে!"—বলিয়া তিনি আপন জায়গায় গিয়া বসিলেন। আবার বাজনা বাজিল।

তাহার পর ডাক হইল শ্রীধরের, তাহার পর প্রজ্ঞাকর মতির, এইরূপে একজন হিন্দু ও তাহার পর একজন বৌদ্ধের ডাক হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষের দশবার করিয়া ডাক হইবার পর হরিবর্ম্মা অবশিষ্ট পণ্ডিতগণের সেবার ভার ভবদেব ও গুরুপুত্রের হাতে

দিয়া মস্করীকে সঙ্গে লইয়া সভার আর এক অংশে যেথানে শিল্পকলার বিশেষ নিদর্শনগুলি সাজান ছিল, সেইখানে গেলেন, এবং যাহার শিল্প পছন্দ হইল, তাহাকে পুরস্কার দিতে লাগিলেন।

[৩]

রাজা প্রথম দেখিলেন—একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি তামার তৈয়ারি, তাহার উপর সোণার পাত মোড়া। এই মূর্ত্তি দেশের লোক সোণার মূর্ত্তিই বলে। মূর্ত্তি গরুড়ের উপর বসিয়া আছেন, গরুড় পাথরের। তাহার ঠোঁটটি লাল টুকটুকে পাথরের, পাখাগুলি পাখির পাখার মত সবুজ পাথরের, চোখ দুটি পান্নার, চোখের কালটুকু নীলার, সাদাটুক আগেটের, মূর্ত্তিটীর ভাবভঙ্গী চমৎকার, যেন সমস্ত জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন;—সকলের উপর স্নেহ ছড়াইয়া দিতেছেন। রাজা মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবে গদগদ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। শিল্পীকে ডাকাইলেন, তাহার নাম শাক্যসিংহ সেগরা। রাজা তাহার মাথায় ফেটা বাঁধিয়া দিলেন ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন। সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া রাজার, মস্করীর ও আর আর সকলের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল।

তাহার পর একটী লোকেশ্বর মূর্ত্তি, সমস্তটাই শাদা পাথরের—মার্ব্বেলের চেয়েও শাদা, আর খুব পালিশ করা, খুব মাজা। চোখ দুটী কাল পাথরের, তাহার মধ্যে হীরা। দাঁড়ামূর্ত্তি, গলায় পৈতা, দুই হাত, দুই পা। দুদিক দিয়া দুটা পদ্ম উঠিয়া ডাইনে ও বামে কাণের কাছে ফুটিয়া আছে। দুই ভুরুর মাঝখানে একটী অমিতাভের মূর্ত্তি; অমিতাভ লোকেশ্বরের গুরু। মূর্ত্তিটীর ঠোঁট দেখিলেই বোধ হয়, যেন

হাসিতেছেন। রাজা দেখিয়া বড় খুসী হইলেন। ভাস্করকে ডাকাইলেন। তাহার নাম লোকনাথ চাকি, বাড়ী বরেন্দ্রভূমি। বৃদ্ধ ভাস্করের কাজ করিয়া পাকিয়া গিয়াছে। রাজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন। সে পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল।

তাহার পর শিবের সেই জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তিটী। মস্করী এই মূর্ত্তি মহা-বিহারে দেখিয়াছিলেন। মহারাজ দেখিয়াই মূর্ত্তিটী পাইবার জন্য বার বার জিদ করিতে লাগিলেন। শিল্পী বলিল, "সে দিতে অপারগ। কাশীর এক বেনিয়ার আদেশে সে ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়াছে। কেবল গুরুপুত্রের জিদে সে দেখাইবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর একটা এইরূপ শিবলিঙ্গ তৈয়ার করিতে কত দিন লাগিবে?" সে বলিল "দু'বৎসর।" তিনি বলিলেন "তবে একটি আমার জন্য করিয়া দিবে?" এই বলিয়া শিল্পীকে পুরস্কার দিলেন এব তাহার গুণের অনেক গরিমা করিলেন।

তাহার পর গহনা। একখানি তাড়,—সোণার। তাড়ের উপর দশ অবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বুদ্ধ (জগন্নাথ), বামন, রাম, রাম রাম ও কল্কি। রাজা বিশেষ ঠাওর করিয়া দেখিলেন, বলিলেন "বুদ্ধের স্থান ত নবম হওয়া উচিত।" মস্করী হাসিয়া বলিলেন, "বুদ্ধকে দশের মধ্যে লওয়াই হইয়াছে অল্পদিন। কিন্তু উঁহার স্থান এখনও ঠিক হয় নাই; যাহারা বুদ্ধকে মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদের কাছে উনি নবম, আর যাহারা উহার আকার-প্রকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে করে না, তাহারা বামনের পূর্ব্বেই উঁহার জায়গা করে, অর্থাৎ এখনও উনি মানুষ হয়েন নাই। উঁহার হাত পা এখনও ঠিক হয় নাই।" শিল্পীকে পুরস্কার দিয়া রাজা অন্যত্র গেলেন।

দেখিলেন—একটা হাতীর দাঁতের মুখ। ঠোঁট দুটা ফাঁক হইয়া

রহিয়াছে। তাহার মধ্যে দুই পাটীতে অনেকগুলি দাঁত দেখা যাইতেছে। দাঁতগুলির উপর কাল রঙের খুব কাজ করা। প্রথম সব দাঁতেই কাল থিলান, থিলানের মধ্যে কোথাও একটা ফুল, কোথাও একটা ফল, কোথাও একটা তারা, কোথাও একটা ঘটী, কোথাও একটা বাটী। দেখিয়াই রাজা বলিলেন—"একি ?" মস্করী বলিলেন—"উহার নাম দন্ত-অঙ্গরাগ। সেকালে মেয়েরা দাঁতে মিশি দিয়া এইরূপ করিয়া কারিকরী করিত। এখনও করে, তবে সকলে জানে না বলিয়া আমি ফরমাস দিয়া হাতীর দাঁতের উপর অঙ্গরাগ করাইয়া রাখিয়াছি।" রাজা বলিলেন—"বেশ।" রাজা শিল্পীকে পুরস্কার দিলেন।

তারপর একখানি মন্দিরের শিলাপত্র। মার্ব্বেলের ফুলকাটা ধারি, ফুলগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট, সবগুলি পদ্ম। ছোটর মধ্যে কেমন পরিষ্কার করিয়া আঁকা, তাহার মধ্যে পত্র। উপরে হরি বর্ম্মার মুদ্রা। তাহার পর রাজার নাম ও উপাধি ও বিরুদাবলি, তাহার পর দাতার নাম, তাহার পর মন্দিরের দেবতার নাম। তাহার পর মন্দিরের সম্বিদ, দুটী কি তিনটী ধারা। তাহার পর তারিখ, তাহার পর খোদকারের নাম। সমস্তটা যেন একখানি গালিচা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিল্পী কে ?" উত্তর "বরেন্দ্রের ভাস্কর।" রাজা তাহাকে পুরস্কার দিলেন।

তাহার পর বিধুভূষণ ফরফরের হরিপুর গ্রামের দানপত্র। তামার পাতা, কাণা উঁচা করা ও তাহার উপর সরু কাজ করা। রাজা বিহারী খুব ভাল করিয়াই খোদাই করাইয়াছেন। মাথার উপর একখানা সিংহাসনে রাজা হরিবর্ম্ম দেব, নিজে। তাহার নীচে স্বহস্তোহয়ং শ্রীশ্রীহরিবর্ম্ম দেবস্য। তার পর, পত্র। গোড়ায়ই স্বস্তি, তাহার পর যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণের নমস্কার। তাঁহারই বংশে হরিবর্ম্ম দেবের পিতামহ, তাঁহার পিতা, হরিবর্ম্ম দেব ও তাহার বিরুদাবলী, তাহার পর "কুশলী"। তাহার পর রাজ-কর্ম্মচারীদিগের

নাম করিয়া ইঁহাদিগকে "মানয়তি পূজয়তি সম্মানয়তি আজ্ঞাপয়তি চ।" আমি অমুকগোত্রের সপ্তসতী-প্রদেশবিনির্গত বিধুভূষণ ফরফরকে হরিপুর গ্রাম দান করিলাম, তোমরা ইহার অধিকার মানিয়া চলিবে। তাহার পর তারিখ, তাহার পর দূতকের নাম ও তাহার পর খোদকারের নাম। রাজা একটু হাসিলেন, খোদকারকে পুরস্কার দিলেন।

এবার ছবি। ছবি আঁকা সেকালে একটা বাতিক ছিল। সবাই ছবি আঁকিত। ছোট লোকে অন্ততঃ ঘরের দেওয়ালে দুটা ময়ূরও আঁকিয়া রাখিত। বেণেদের বাড়ীর দুপাশে দুটা টাকার থলি আঁকা থাকিত। আর তাহার সঙ্গে এক পাশে একটা শাঁখ ও আর এক পাশে একটা পদ্ম আঁকা থাকিত। লোককে বলিয়া দিত, এ বেণের এক শঙ্খ ও এক পদ্ম টাকা আছে। যে দুখানি ছবি রাজাকে দেখান হইল, তাহার একখানিতে নারায়ণ অনন্ত শয়নে শুইয়া আছেন, আর একখানিতে দুই শালগাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন। দুইটাই শোয়া-মূর্ত্তি। দুইটাই ডানপাশে শুইয়া আছেন; ডান হাতটা গালে। বাঁ হাতটা, আজানুলম্বিত, উরথের উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে। রাজা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইজন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। দুই জনের ডাক হইল, এক জনই দুইবার আসিল ও দুইটা পুরস্কার লইয়া গেল। রাজা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

দুখানি পুঁথি দেখান হইল। একখানি তালপাতায় লেখা, আর এক-খানি মোটা কয়গদের উপর কাল রঙ করিয়া তাহার উপর সোণার জলে লেখা। অক্ষরগুলি "সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ"; সূতা চালাইবার জন্য মাঝখানে একটা ছোট চৌকা ফাঁক। ডাইন ধারে কিনারায় অক্ষর দিয়া পত্রাঙ্ক লেখা। আর বাঁধারে অঙ্ক দিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া। মাঝে মাঝে ছবি দেওয়া। ছবিগুলি ছোট পরিষ্কার, আর তার রঙ খুব উজ্জ্বল।

একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, আর একখানি চক্রসম্বর তন্ত্র। রাজা দেখিলেন, আর দুজনকেই পুরস্কার দিলেন।

[৪]

তারপর গান-বাজনা। রাজা পূর্ব্বেই কীর্ত্তনিয়াদের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন তাহারা সকলে শিরোপা লইয়া গেল। একদল জলের উপর কাটি বাজাইয়া, তাহাতে অনেক বোল ফুটাইতে লাগিল। ইহার নাম উদকঘাত ও উদকবাদ্য। একদল বাঁশী বাজাইল। একদল তারে বাজাইল। একদল চামড়ায় ঘা দিয়া বাজাইল। আর একদল ধাতুতে ঘা দিয়া বাজাইল। সবাই সিদ্ধহস্ত। রাজা ও একজন প্রধান সমজদার, তিনি খুব খুসী হইলেন ও সকলকেই পারিতোষিক দিলেন।

নাচ আসিল। সেকালে সবাই নাচিতে জানিত। ছেলেও জানিত, মেয়েও জানিত। যুবাও জানিত, বুড়াও জানিত। নাচায় দোষ মনে করিত না; বরং গুণ মনে করিত। এখন অনেকে আশ্চর্য্য হন—পুরাতন যাত্রার দলে সবাই নাচে। কৃষ্ণও নাচেন, রাধাও নাচেন, নন্দও নাচেন, যশোদাও নাচেন, বিদ্যাও নাচেন, সুন্দরও নাচেন, রাজাও নাচেন, রাণীও নাচেন। এখনকার লোক মনে করেন, এটা অসভ্য। কিন্তু সেকালে কেহ এরূপ মনে করিত না। নাচের কায়দা—বড় কায়দা। মনের ভাব প্রকাশের জন্য হাত-পা নাড়া আর অঙ্গভঙ্গি করার নাম অঙ্গহার। এইরূপ তিন চারি অঙ্গহার এক করিয়া মনের গভীর ভাব প্রকাশ করার নাম করণ। করণ হইতে যে গভীর ভাব প্রকাশ হয়, তাহার নাম ভাব। যে সব লইয়া ভাব, তাহার নাম বিভাব। ভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলে। এইগুলি সব ফুটিয়া উঠিলে রস হয়, রসের আস্বাদ হইলে নৃত্যে তাহা প্রকাশ হয়;

সেই জন্য নৃত্যের এত আদর। ভারতে স্ত্রী-মূর্ত্তি কোথাও অঙ্গহারভি
দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি যেমন খাড়া-দাঁড়া—ধীর-গভীর
স্ত্রী-মূর্ত্তি সেরূপ দেখিতেই পাইবে না। তাহার সঙ্গে একটা না একটা
অঙ্গহার আছেই আছে। রাজা দু'চারি জায়গায় নৃত্য দেখিলেন ও পুরস্কার
দিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর খেলা। মেড়ার লড়াই, কুকুড়ার লড়াই, পাখীর লড়াই
দেখিলেন। কুস্তী দেখিলেন, কত রকম কসলৎ দেখিলেন, লাঠী খেলা
দেখিলেন, তলোয়ার খেলা দেখিলেন, তীর-ধনুকের টিফ দেখিলেন। কত
রকম ইন্দ্রজাল দেখিলেন, আগুণের উপর চলিতে দেখিলেন। আতস
বাজী দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ণচন্দ্র লাল্‌চে-আভা ত্যাগ করিয়া
একেবারে শাদা হইয়া গেলেন; আর আকাশের পূর্ব্বপ্রান্ত ত্যাগ করিয়া
উপরে উঠিতে লাগিলেন। নদীতে যেমন হাঁস চলিয়া যায়, চলাচল
কিছুই দেখা যায় না, বোধ হয় যেন ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ হাঁস মহাশয়
ভিতরে ভিতরে বেশ পা নাড়িতেছেন, আর স্রোতের বিরুদ্ধেই যাইতেছেন—
নদীতে হাঁস যেমন চলিয়া যায়, চাঁদ তেমনি আকাশে উঠিতেছেন। কিছু
দূর উঠিলে সুধাভাণ্ড হইতে যেমন সুধা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি
একটি চাঁদ হইতে শত শত ধারা বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরপরিপূর্ণ
করিয়া উঠিতেছে। চাঁদের আলো গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গার শাদা জলের সঙ্গে
মেশামিশি করিয়া এক অদ্ভুত শাদা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর বালি
শাদা, এ ত সমুদ্রের বালি নয় বা দামোদরের বালিও নয় যে, হল্‌দে হ'বে বা
রাঙ্গা হ'বে। এ যে গঙ্গার বালি, তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে;
সেও এক বিচিত্র বোধ হইতেছে—যেন পঙ্কের কাজ করা মেঝেতে দুধ
ঢালিয়া রাখিয়াছে। চড়ায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে, ঘাসের উপর চাঁদের
আলো খেলিতেছে; আর যত লোক ছিল, সকলের কাপড়ের রঙ বদলাইয়া

দিতেছে। ঘোরাল লালের উপর শাদা পড়িতেছে, ঘোরাল কালর উপর ঘন শাদা পড়িতেছে, ঘোরাল নীলের উপর ঘন শাদা পড়িতেছে, জরদার উপর ঘন শাদা পড়িতেছে। একটা বিচিত্র শোভা হইয়াছে, একটা বিচিত্র আনন্দ, একটা বিচিত্র সুখ হইয়াছে। তাহার উপর সকলেই পারিতোষিক পাইয়াছে, বাহবা পাইয়াছে, সকলেই প্রফুল্ল- উৎফুল্ল। দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। বাতাসের দাত নাই। বরং একটু একটু মিঠে মিঠে ঘাম হইতেছে।

রাজা বলিলেন, এইবার কাব্যের পরীক্ষা।

শ্রীহীর পণ্ডিত উদয়নের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুজনের বেশ রেষারেষি চলিত। উদয়নের প্রথমেই পূজা হওয়ায় এবং সমস্ত সভাশুদ্ধ লোক দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করায় ও আপনাকে পাঁচ কি ছ'য়ের পর ডাকায় হীর পণ্ডিত বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মস্করী অত্যন্ত জিদ করায় তিনি আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কুকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মস্করী এ কথা জানিতেন, ভবদেবও এ কথা জানিতেন। তাই কাব্য পরীক্ষার প্রথমেই শ্রীহীর পণ্ডিতের পুত্র শ্রীহর্ষের ডাক হইল। শ্রীহর্ষ তখন যুবা পুরুষ। কিন্তু কাব্যে ও দর্শনে গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছে। কনোজের রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া সভামধ্যে দুইটি পান ও একখানি আসন দিয়াছিলেন। তিনি চিন্তামণি-মন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। স্থির গম্ভীর পদক্ষেপে তিনি আসিলেন, অথচ কোন দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার সুন্দর গৌর বর্ণ, চক্ষু ও মুখের জ্যোতিঃ, তাঁহার নম্রভাব দেখিয়া সভাসুদ্ধ লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি আসিলে রাজা তাঁহাকে নিজের একটী কবিতা পড়িতে বলিলেন। তিনি পড়িলেন—

নিলীয়তে হ্রীবিজিতঃ স জৈত্রং
শ্রুত্বা বিধুস্তস্য মুখং মুখান্নঃ।

স্বরে সমুদ্রস্য কদাপি পূরে
কদাচিদভ্রভ্রমদভ্রগর্ভে।

শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"কি পাণ্ডিত্য! কি শব্দের লালিত্য! কি অনুপ্রাসের ছটা! আপনি আমার রাজত্বের একখানা কাব্য লিখিয়া দিবেন?" শ্রীহর্ষ বলিলেন,—"আমি গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি নামে একখানি কাব্যের পত্তন করিয়াছি। ঐ কাব্যে মহারাজাই নায়ক হইবেন।" রাজা বলিলেন, "আমি বলার আগেই পত্তন করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, মহারাজ।" রাজা তাঁহার মস্তকে মুকুট ও গলায় হার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন; আর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।"

তারপর আর্য্য ক্ষেমীশ্বর। ইনি পাল-রাজাদের কবি। ইনি হিন্দু কি বৌদ্ধ, বুঝা যায় না। ইনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর বিবাহ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এরূপ করিতেন, তাঁহাদের লোকে আর্য্য বলিত। যাঁহারা বিবাহ না করিয়া ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের অনার্য্য বলিত। অনার্য্যেরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না। ক্ষেমীশ্বরের কবিত্ব-খ্যাতি খুব ছিল। তিনি আসিলে রাজা তাঁহাকে নিজের একটি কবিতা পড়িতে বলিলেন। রাজা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট ও গলায় হার পরাইয়া দিলেন। তাহার পর আসিলেন বজ্রদত্ত। তিনি লোকেশ্বরের স্তব পাঠ করিলেন। তাঁহার উচ্চারণের অনেক দোষ ছিল। তিনি 'ড়'কে 'র' ও 'র'কে 'ড়' করিতে লাগিলেন, 'স্ত'কে 'ষ্ট' ও 'ষ্ট'কে 'স্ত' করিতে লাগিলেন। 'দৃঢ়' 'দিহ' হইয়া গেল, অচৈতীৎ 'অচৈতি' হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার গলার স্বর, পাঠের ভঙ্গী ও ভক্তিগদ্গদ্ভাব সভাস্থ লোককে মুগ্ধ করিয়া দিল। রাজা তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন।

পরে আসিলেন—ধপল হুহু, তিনি এক কবিতা পড়িলেন, তিনি কোন্ দেশের লোক, জানা যায় না; তবে তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে কিছুই বিরক্ত হইলেন না, বলিলেন, "আমরা বিদেশাবাসী—দেবাবাণী আমাদেরা মুখা হতে পারে না।

তাঁহার পর আসিলেন জয়ভদ্র, বাড়ী সিংহলদ্বীপ, বহুকাল বাঙ্গলায় বাস করিতেছেন, দু'চারিখানা তন্ত্রের টীকাও লিখিয়াছেন, সংস্কৃত জানেন বলিয়া অভিমানও করিয়া থাকেন। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা হাসিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা গদ্‌গদ হইয়া গেলেন। তিনি একটু চটিয়া বলিলেন, "ভগবান্ 'সর্ব্বরুতানুকারিণী' ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা ব্রাহ্মণদের মত 'সুশব্দবাদী' নই। কিন্তু আমাদের যা আছে, তোমাদের তা নাই। অস্মাকানাং সৌগতানাং অর্থাৎ তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা। আমাদের 'অর্থশরণতা' তোমাদের নাই।"

সংস্কৃত কবিতা শেষ হইয়া গেলে প্রাকৃত কবিতা আরম্ভ হইল। প্রাকৃত ত একটি ভাষা নয়। তা'র ভিতরে মাগধী আছে, অর্দ্ধমাগধী আছে, শৌরসেনী আছে, মহারাষ্ট্রী আছে, পৈশাচী আছে, ঢক্কী আছে, ঢক্করী আছে, তাহার উপর অপভ্রংশ আছে, মিশ্রভাষা আছে। একজন দুলিয়া দুলিয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ—

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তর রূপ সুরূপ সুশোভনকো
বশবর্ত্তি সুলক্ষণ বিচিত্রতকো॥

বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেবনরাণ বসম্ভতিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥

সেকালে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ছয়টা ভাষায় কবিতা লিখিতে না পারিলে, সে মহাকবি হইতেই পারে না। তাই যাহারা শুধু বাঙ্গলাতেই কবিতা লিখিত, তাহাদের কবি না বলিয়া 'পদকর্ত্তা' বলা হইত।

পদকর্ত্তাদের মধ্যে প্রথমে আসিলেন চাটিলপাদ,—আসিয়া অতি মধুর স্বরে পড়িতে লাগিলেন :—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

*　　*　　*　　*

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥

সভাশুদ্ধ লোক 'ধন্য ধন্য' করিয়া উঠিল। তখন বীণাপাদ আসিয়া মৃদুমধুর সুরে তালে তালে পড়িলেন :—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকী কিঅত অবধূতী॥

পরে আসিলেন—ধপল হুছ, তিনি এক কবিতা পড়িলেন, তিনি কান্ দেশের লোক, জানা যায় না; তবে তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণে :কলেই হাসিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে কিছুই বিরক্ত হইলেন া, বলিলেন, "আমরা বিদেশাবাসী—দেবাবাণী আমাদেরা মুখা হতে ারে না।

তাঁহার পর আসিলেন জয়ভদ্র, বাড়ী সিংহলদ্বীপ, বহুকাল বাঙ্গলায় াস করিতেছেন, দু'চারিখানা তন্ত্রের টীকাও লিখিয়াছেন, সংস্কৃত জানেন লিয়া অভিমানও করিয়া থাকেন। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা শুনিয়া াহ্মণ পণ্ডিতেরা হাসিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা গদ্গদ হইয়া গলেন। তিনি একটু চটিয়া বলিলেন, "ভগবান্ 'সর্ব্বরুতানুকারিণী' ভাষায় ্যাখ্যা করিতেন। আমরা ব্রাহ্মণদের মত 'সুশব্দবাদী' নই। কিন্তু মামাদের যা আছে, তোমাদের তা নাই। অস্মাকানাং সৌগতানাং মর্থাৎ তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা। আমাদের 'অর্থশরণতা' তোমাদের াই।"

সংস্কৃত কবিতা শেব হইয়া গেলে প্রাকৃত কবিতা আরম্ভ হইল। প্রাকৃত ত একটি ভাষা নয়। তা'র ভিতরে মাগধী আছে, অর্দ্ধমাগধী মাছে, শৌরসেনী আছে, মহারাষ্ট্রী আছে, পৈশাচী আছে, ঢক্কী আছে, ঢক্করী আছে, তাহার উপর অপভ্রংশ আছে, মিশ্রভাষা আছে। একজন লিয়া দুলিয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ—

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তর রূপ সুরূপ সুশোভনকো
বশবত্তি সুলক্ষণ বিচিত্রতকো॥

বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেবনরাণ বসন্ততিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্ল্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥

সেকালে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ছয়টা ভাষায় কবিতা লিখিতে না পারিলে, সে মহাকবি হইতেই পারে না। তাই যাহারা শুধু বাঙ্গলাতেই কবিতা লিখিত, তাহাদের কবি না বলিয়া 'পদকর্ত্তা' বলা হইত।

পদকর্ত্তাদের মধ্যে প্রথমে আসিলেন চাটিলপাদ,—আসিয়া অতি মধুর স্বরে পড়িতে লাগিলেন :—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

*　　*　　*　　*

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥

সভাশুদ্ধ লোক 'ধন্য ধন্য' করিয়া উঠিল। তখন বীণাপাদ আসিয়া মৃদুমধুর সুরে তালে তালে পড়িলেন :—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকী কিঅত অবধূতী॥

বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥
নাচিল বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥

তিনি বসিয়া পড়িলেন। জয় জয় শব্দে সভাস্থল ভরিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন সরহপাদ। অতি গম্ভীর মূর্ত্তি, উদাস দৃষ্টি, ধীরে ধীরে অতি-গভীর-স্বরে পড়িলেন :—

আপনে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা
মিছেঁ লোএ বন্ধাবএ অপনা ॥
অম্হে ন জনঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।
জইসো জাম, মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষো ॥

সভা নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার কবিতা শুনিতে লাগিল।

মস্করী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, মায়া ও গুরুপুত্র সকলের শেষে আসিবেন। মায়া আসিলেন। তিনি এখন রাজকুমারী। যদিও শাদা সাটী মাত্র পরা, মাথা একরূপ মুড়ানই ; কিন্তু এখন তাঁহার মুখে স্বর্গের জ্যোতি,—বিষাদের চিহ্নও নাই। বোধ হয় যেন কি এক স্বর্গীয় বস্তু লাভ করিয়া তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সভামধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার রূপে সভা আলো হইয়া গেল। তাঁহার দৃষ্টি নিজের পায়ের উপর। তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিয়া, দুই হাত তুলিয়া কাহাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রমণীর কমকণ্ঠে বেশ চড়া সুরে পদ ধরিলেন :—

হিণ্ডই জগমাঝ সবরী সবরা রে
সবরা পলাএল ন জানমি কঁহি গই পইঠা রে।
ঢুণ্ডিল চউদ্দ ভুবণ সবরী সবরা রে
সবরা পলাএল ভইল সবরী বিআউলা রে॥

মিলনক নহি আসা সবরী নাম লই রহিলা রে
রূপ ধিয়াণে অহনিশি মগণা গুঁডাইলা রে।
নাম সোঙরি, নাম হিঅ ধরি, রূপ ধিয়ানি রে
সবরার নাম রূপ ধরি সবরি মাতেলা রে॥

সুজ সসি জগ তারা নামরূপে ডুবিলা রে
বাম দাহিণ উচ নীচ সামন পিছাই রে।
সব ভরিল রূপ ধিয়ানে তাহে নাম মিলিলারে
নামরূপ ধিয়ানে সবরী ভইল ণঠারে॥

মেরু সিহরবর এক ভই ডুহু মিলিলা রে
লোণ জল জিম ডুহু মিলিলা রে।
এক হোই বারমতি মাঝই ডুহু মিলিলা রে॥

সভা নিস্তব্ধ। মায়ার কথা সভার সকল লোকই জানিত, তিনি যে আপনার স্বামীর উদ্দেশে শবরী সাজিয়াছেন, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি যে শবরকে খুঁজিতেছেন, তাহাও কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি যে সুমেরু-শিখরে অর্থাৎ সপ্তস্বর্গের উপরে শবরের সহিত মিলিয়া অনন্তে মিশিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। শবর কাছে নাই, তিনি তাঁহার নামরূপ ধ্যান করিতে করিতে অনন্তে নিলীন হইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে শবরের সহিত এক হওয়া চাই। তাঁহার দৃষ্টিতে

ক্রমে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা-পৃথিবী সব লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল শবরের নামরূপ আর তিনি। ক্রমে নামও রূপে ডুবিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে তিনিও সেই রূপে ডুবিলেন। সে রূপ ক্রমে অনন্ত হইয়া অনন্ত ভরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, সকলেরই কাণে তখনও মায়ার সুর লাগিয়া আছে। ক্রমে সুরের মোহ যেমন কাটিতে লাগিল, তেমনি তাহারা ভাবের মোহে ডুবিতে লাগিল। যখন সে মোহও কাটিয়া গেল, তখন সকলে এক স্বরে মায়ার জয়জয়কার করিয়া উঠিল। এ জয়জয়কার দু'পক্ষ হইতেই উঠিল। হিন্দুরাও যেমন জয়জয়কার করিল, বৌদ্ধেরাও তেমনি জয়জয়কার করিল।

সকলের শেষে গুরুপুত্র। গুরুপুত্রের চেহারা ত রাজপুত্রেরই মত। তাহার উপর পরিপাটী করিয়া আজ বেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরই মত কাপড় পরিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সব রেশমের তৈয়ারি। তাহার আঁচলায় ও পাড়ে সল্‌মাচুম্‌কীর কাজ করা। তিনি ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলেন এবং গুন্ গুন্ স্বরে তথাগতস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার পর একটি পদ ধরিলেন। তাঁহার সুর মেয়ে মানুষের মত চড়া ও সরু। পুরুষের গলায় এ সুর মানায় না; কিন্তু তিনি এই সুরে উপদেশ দেন, বক্তৃতা করেন, ব্যাখ্যা করেন, কীর্ত্তনও করেন। সাতগাঁএর লোকের সে সুর বেশ পরিচিত, বাহিরের লোকের তত পরিচিত নয়। তিনি ধরিলেন :—

বহুই নাবী মাঝ সমুদ্দারে, দুপ্পহর বেলা।
দারুণ পিআস, হিঅ মোর বাধই, কণ্ঠ শোষ গেলা॥
নিঅহি পাণী, পিব ন সকই, অহ নিসি তিসি বাধই।
চেব ন সকই, লোণ পইসই, অহণিসি তিসি বাঢ়ই॥